বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া এবং এর পরিণতি সংখ্যা

৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ও ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর'১০-মার্চ ২০১১

প্রকাশকাল
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১১

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৪/১/এ, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৪র্থ তলা, ডানপাশ, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
অজ্ঞাত শিল্পীর অংকন অবলম্বনে

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১৫০.০০ টাকা
১৫০.০০ রুপি
৫ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

বাংলাদেশে বাজারজাতকৃত খাদ্যদ্রব্যের মান যাচাই করবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট)-এর রয়েছে সীমাহীন উদাসীনতা। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের কারণে বিভিন্ন কোম্পানিকে ঘুষের বিনিময়ে দিয়ে থাকে তথাকথিত 'মাননিয়ন্ত্রন সার্টিফিকেট'। প্রতি ছয় মাস পর পর বাজারের পণ্যদ্রব্যের মান পরীক্ষা করার নিয়ম থাকলেও এই প্রতিষ্ঠান তা করে না। অথচ সরকারি সার্টিফিকেটধারী প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যের ভেজালজনিত কারণে জমাকৃত এই সব ক্ষতিকর বিষ মানুষের রক্তে মিশে থাকে এবং তা কমপক্ষে ২০ বছরেও নষ্ট হয় না। সাধারণত মানুষের শরীরের প্রতিগ্রাম রক্তে ০.২ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত জৈব যৌগ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হল, এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের মানুষের প্রতিগ্রাম রক্তে রয়েছে ৯.৭ মাইক্রোগ্রাম জৈব যৌগ! কাজেই পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষের শরীরে মাত্রাতিরিক্ত দূষিত জৈব যৌগ রয়েছে।

আমাদের দেশে সকল প্রকার কৃষিকাজে এবং তৈরি কৃষিজাত পণ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে বিষাক্ত নানা নামের ক্যামিক্যাল। কৃষকেরা কোনো নিয়ম-কানুন না মেনেই এসব কীটনাশক ব্যবহার করে যাচ্ছে। বাজারে যত প্রকার দেশি-বিদেশি ফলমূল পাওয়া যাচ্ছে তার সবগুলোতেও দেয়া হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম ও সোডিয়াম কারবাইড জাতীয় বিষাক্ত-ক্যামিক্যাল।

আমাদের দেশের কারখানায় উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক ক্যামিক্যাল মেশানো হয় সবচেয়ে বেশি। দেশের সর্বপ্রকার বেকারি খাবারে মেশানো হচ্ছে কাপড়ে ব্যবহৃত টেক্সটাইল কালার এবং চামড়ায় ব্যবহারকারী লেদার কালার। এইসব বিষাক্ত পদার্থ শরীরে জমা হওয়ার কারণেই দেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই কোটিরও বেশিতে এবং যার অর্ধেকই হল শিশু; অন্যদিকে দেশে প্রতিবছরই চুরাশি হাজার মানুষ ক্যান্সারের শিকার হচ্ছে।

ঔষধপণ্যে ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল এবং বিষক্রিয়া আমাদের জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্যার ভয়াবহতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বড় অংকের টাকা জরিমানাসহ মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তির বিধান রয়েছে সাধারণ আইনেই। কিন্তু আমাদের দেশে জেল ও জরিমানা ক্ষতির তুলনায় হাস্যকর রকমের অপ্রতুল। বিশেষ আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হলেও ভেজালের ভয়াবহতার তুলনায় তার প্রয়োগ নেই বললেই চলে। ফলে ২০/৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে পুনরায় ব্যপকভাবে ঔষধপণ্যে ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। এসব অপরাধী ছোট-খাট ব্যবসায়ী নয়; এরা দেশের রাঘববোয়াল। তাই প্রচলিত আইন এদের আটকাতে পারছে না কোনোক্রমে। আর

সরকার সবসময় এইসব রাঘববোয়ালদের পক্ষে কাজ করে এবং সরকারই এদের রক্ষক।

আমাদের জীবন যে আজ বিষে-বিষে বিপন্ন– একথা কে কাকে বোঝাবে? সমস্যা যেখানে এতই জটিল সেখানে সহজ কোনো সমাধানের পথ খোঁজ করা হবে বোকামি। প্রকৃত সমস্যার শেকড় প্রোথিত আছে আমাদের দূষিত রাজনীতির ভেতর; কাজেই যে-কোনো মূল্যে রাজনীতিকে সঠিক পথে চলতে দিতে হবে; তবেই বাংলাদেশের অনেক সমস্যার সঙ্গে খাদ্য ও পণ্য হয়ে উঠবে ভেজাল ও বিষমুক্ত।

সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

শরমিন নিশাত
নির্বাহী সম্পাদক
১২.০২.২০১১

সম্পাদকীয়: দুই

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই; বিশ্ব রাজনীতির বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় রাজনৈতিক চরিত্রেরই ফল এটি। পুঁজিবাদ বা বিশ্বমুনাফাবাদ বিশ্ববেহায়াবাদে রূপ নিয়েছে অনেক আগেই; যেটা আসলে মানুষের অস্তিত্ব বনাম বল্গাহীন অতি-মুনাফার মধ্যে প্রকাশ্য ফাঁদ মাত্র; যেখানে মানবীয় সকল দাবিকে দলিত-মথিত করে 'যে-কোনো মূল্যে মুনাফা'র ঘৃণ্য আস্ফালনই বিশ্ববাসীর কাছে পরিলক্ষিত। বাংলাদেশে যে-প্রক্রিয়ায় খাদ্য ও পণ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া চলছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশে সেই বিষক্রিয়াই অব্যাহত গতিতে চলছে ভিন্ন রূপে আরও সূক্ষ্ম ও উন্নত প্রক্রিয়ায়। আসল কথা হল, বিশ্বজুড়ে এই ভেজাল ও বিষক্রিয়া পুঁজিবাদপুষ্ট দুর্নীতিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে ক্রিয়াশীল আছে।

আমরা যদি পুঁজিবাদকে মেনে নেই তাহলে ব্যবসাকেও মেনে নিতে হবে; একই কারণে বল্গাহীন মুনাফাবাদ, ভোগবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনকে মানতে হবে এবং এ-বিষয়গুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিও দিতে হবে। আর এসবের দাসত্ব বরণ করে 'নৈতিকতা'-কে একইসঙ্গে ধারণ করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সকল ধর্মেই ধনীর প্রতি দরিদ্রকে সাহায্য করার নির্দেশ রয়েছে; কিন্তু সেই নির্দেশ পরকালের পুরস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একই বিষয়কে দার্শনিক কার্লমার্কস উৎপাদনের উদ্বৃত্তে শ্রমিকের অংশিদারিত্ব আবশ্যিক করেছেন ইহকালিক আইন দ্বারা। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ধর্মের পরকাল-নির্ভর পুরস্কার এবং কার্লমার্কস-এর ইহকাল-নির্ভর পুরস্কার– এই দুয়েরই মূল চেতনা 'শ্রেণী-সাম্য' প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত। সে কারণে যে-সব পুজিবাদী রাষ্ট্রে 'শ্রেণী-বৈষম্য'-কে কল্যাণমুখী নানা কৌশল দিয়ে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সক্ষম

হচ্ছে, সে-সব রাষ্ট্রে খাদ্যে ভেজাল বা পণ্যে বিষক্রিয়াসহ অন্যান্য অপরাধকে ন্যূনতম একটা ভারসাম্যের জায়গায় এখনও রাখতে সক্ষম হচ্ছে। তবে বলে রাখা ভালো, এটা ব্যারাম আরোগ্যের স্থায়ী পথ নয়; এটা জোড়াতালি দিয়ে সমস্যাকে সাময়িকভাবে ধামাচাপা দেয়ার পথ মাত্র।

রাজনৈতিক পৃথিবীর সামনে যে-মূল সমস্যা; তার থেকে পৃথিবীর মানুষের বের হয়ে আসার সম্ভাবনার পথ খুবই ক্ষীণ; কারণ বিশ্বের অতিবুদ্ধিমান চতুর মানুষ সম্প্রদায় তাদের পশুত্বকে যে-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে; সেটা বিশ্বের আমজনতার সরল চিন্তার সাধারণ জালে একেবারেই আটকা পড়বার নয়; অর্থাৎ বিশ্ব-সাধারণের মধ্যে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের পর্যন্ত যথেষ্ট ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে; যার অন্যতম কারণ বিশ্ব-নেতৃত্ব অতি মুনাফাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদেরই একচেটিয়া অনুগামী; সাধারণের পক্ষে বিশ্ব-নেতৃত্ব আজ প্রায় শূণ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিশ্ব-ব্যবস্থা ভুল পথে এতটাই অগ্রসর হয়ে পড়েছে, সেখান থেকে বিচ্ছিন্নভাবে খাদ্য ও পণ্যের ভেজাল ও বিষক্রিয়া বন্ধের দাবি বা চেষ্টা করা হাস্যকর ব্যাপার।

এতসবের পরও পৃথিবীবাসী বেঁচে আছে; স্বপ্ন মানুষের বাঁচার অবলম্বন! স্বপ্নবাজের নেশায় চুড় হয়ে যেন তারপরও কিছু মানুষ ইতিবাচক হতে চায়; নিজেকেই নিজে স্পর্শ করে বুঝতে চায় যে, তারা বেঁচে আছে! বাংলাদেশ বেঁচে আছে!

দুই

নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার টন ক্যামিক্যাল আমদানি করা হয় এ-দেশে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ভালো করেই জানে, এই ক্যামিক্যাল বড় বড় ব্যবসায়ীরা আমদানি করে থাকে এবং খোলাবাজারে সেগুলো কিনতে পাওয়া যায়; সরকারের লোকজন এ-ও জানে এগুলো কোথায় কারা কীভাবে ব্যবহার করে। এত অধিক পরিমাণ ক্যামিক্যাল আমদানি, বিক্রি ও ব্যবহারের ওপর সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনো বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ নেই, বরং সরকারের মধ্য থেকে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় অসাধু দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ীরা খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া দিয়ে থাকে।

কিন্তু, এর শেষ কোথায়; যতদিন-না রাজনীতি সঠিক পথে পরিচালিত হবে, ততদিন পর্যন্ত এই বিষক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে আসবে না, কারণ এ-দেশের রাজনীতিই বিষাক্ত হয়ে পড়েছে! যে-বিষ আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রের দুর্বৃত্তায়নের মতো খাদ্য ও সকল পণ্যদ্রব্যে সংক্রামিত হয়ে আজ ভয়ংকর দৈত্য হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। আমি স্বীকার করছি, ব্যক্তিগতভাবে নিজেও জানি না এর আশু সমাধান কী! পরিস্থিতি দেখে নিজেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছি!

মুনাফাবাদী দুনিয়ায় 'খাদ্য' একটি নিতান্ত ব্যবসা বলে দ্রুত ও অতি মুনাফা হাতিয়ে নেয়ার জন্য ব্যবসায়ী মহল যা ইচ্ছে তাই করছে। অন্যদিকে ভেজাল ও বিষযুক্ত খাবার খেয়ে ক্যান্সার, কিডনি, চর্মরোগ, বাল্ব, হার্ট ইত্যাদি রোগে প্রতি বছর

রোগীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলছে! কাজেই এই সব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মুনাফাবাদের কাছে মানবীয় দাবির কোনো স্থান আর থাকছে না।

তিন

যে ব্যক্তি মাছে ফরমালিন দেয়; তার উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষের ক্ষতি করা নয়। ফরমালিন না দিলে মাছ পচে গেলে ক্রেতা তা কিনবে না, তাতে ব্যবসার ক্ষতি হবে; এভাবে সকল পণ্যের মধ্যেই ভেজাল বা ক্যামিক্যাল দেয়া হয় লোকসানের হাত থেকে বাঁচা কিংবা অধিক লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে; বিক্রেতা কিন্তু কখনোই ক্রেতা বা ভোক্তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সেটা করে না। তবে ক্রেতা বা ভোক্তার ক্ষতিটা কিন্তু হয়েই যায়; সেই ক্ষতি কতটা ভয়াবহ; নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই কতটা করছে সেই তথ্য কি আমাদের বিক্রেতা মহলের প্রত্যেকে জানেন? কেউ কেউ তা জানলেও তারা কতটা জানেন? একইভাবে আমাদের ক্রেতা ও ভোক্তা মহলই-বা এই ক্ষতির ভয়াবহতা সম্পর্কে ক'জন জানেন; ভোক্তাদের মধ্যেও কেউ কেউ জানলেও তারা কতটা ভালো করে জানেন? সুতরাং বিক্রেতা ও ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অপ্রতুলতা একটি প্রধান সমস্যা; যা এই সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে এর সমাধানের পথ অনেকটা প্রসন্ন হতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সকল প্রিন্ট-মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক-মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১৯৭৯ সালে থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকায়, ১৯৮৬ সালে ভারতে, ১৯৯৫ সালে পাকিস্তানে, ১৯৯৮ সালে নেপালে এবং ১৯৯৯ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ও মালয়েশিয়ায় ভোক্তা-অধিকার বিষয়ক আইন পাশ হয়। বাংলাদেশে ভোক্তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো আইন ছিল না; অনেক বছর অপেক্ষার পর ২০০৮ সালে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন' প্রণীত হয়েছে। বলা যায় এ আইনটি প্রণয়নের মাধ্যমে ভোক্তাদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হয়েছে। এখন এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ হবে কি-না, সেটি একটি ভিন্ন প্রশ্ন। অনেকেই বলে থাকেন, বাংলাদেশে আইনের অভাব নেই; ব্যক্তিগতভাবে ঘাঁটাঘাটি করে দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে যুগোপযোগী আইনের অভাব রয়েছে। অনেক সমালোচনার দিক থাকা সত্ত্বেও 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন' এদেশে ভেজাল ও বিষযুক্ত খাদ্য ও পণ্যদ্রব্য তৈরি ও বিপণনকে কিছুটা হলেও দমন করবে বলে আমার বিশ্বাস। জয় হোক জনতার।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম ও কৃতজ্ঞতা।

শওকত হোসেন
সম্পাদক
০১.০২.২০১১

সূচি

বাংলাদেশে জাতিগত সংকট ও উত্তরণের উপায় সংখ্যার প্রতিক্রিয়া

'জাতিগত সংকট ও উত্তরণ' সংখ্যা: একটি বিকল্প পাঠ-প্রতিক্রিয়া
রইস উদ্দিন আরিফ ০৮

প্রবন্ধ

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া : নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি মন্তব্য
আনিসুজ্জামান ১৪

ভেজাল দ্রব্য – ভেজাল মানুষ
আশরাফ সিকান্দার মোহ ১৯

প্রবন্ধ

খাদ্যে ভেজাল ও শরীরের ওপর এর বিরূপ প্রভাব
এ কে আজাদ খান ২৪

আমাদের খাদ্য: নকল-ভেজাল ও সন্ত্রাস কবলিত
আবম ফারুক ২৬

প্রবন্ধ

খাদ্যে ভেজাল
নাজমা শাহীন ৪৭

সাক্ষাৎকার

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও তার ভয়াবহতা: মোকাবেলার এখনই সময়
শাইখ সিরাজ ৫২

প্রবন্ধ

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া এবং এর নানা দিক
মো. রোকন-উদ-দৌলা ৬১

খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যে নীরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী
এএইচ এম আনোয়ার পাশা ১১৩

প্র ব ন্ধ
খাদ্যদূষণ: একটি বহুমাত্রিক জটিল সমস্যা ও তার সমাধান
মো. মা হ বু ব র র হ মা ন ১২৫
খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া: নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয়
খু র শী দ জা হা ন ১৩১

প্র ব ন্ধ
খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া: আমাদের কত টাকা প্রয়োজন!
মো. আ ব্দু ল আ উ য়া ল ১৪৪
খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়ার পরিণতি: উত্তরণের উপায়
মো. ক দ র আ হ ম দ ১৪৭
বিষক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ খাদ্যশস্যের বীজেই
আ দি ত্য চৌ ধু রী ১৫৫

প্র ব ন্ধ
খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া'র পরিণতি ও প্রতিকার
সো হে ল আ লী আ ফ জা ল ১৫৯
ভেজালে বসবাস
ফে র দৌ সী সু ল তা না ১৬১
খাদ্যে ভেজাল
আ শ রা ফু ল আ ল ম ১৬৫
খাদ্যে ভেজাল ও এর ক্ষতিকর প্রভাব
হো মা য় রা আ হ মে দ ১৬৯

প্র ব ন্ধ
খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ দণ্ডনীয় অপরাধ
শে খ আ খ তা র উ ল ই স লা ম ১৭৩
খাদ্য ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিকিৎসা আইন
শা হ্ মো হা ম্ম দ কে রা ম ত আ লী / কা জী জা হা ঙ্গী র হো সে ন ১৭৬
খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া এবং আইন প্রয়োগে প্রশাসনের ব্যর্থতা
ম ন জি ল মো র সে দ ১৭৮

সা ক্ষা ৎ কা র
আমাদের স্বপ্ন ভেজাল ও বিষমুক্ত খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যের বাংলাদেশ
মো. রো ক ন - উ দ - দৌ লা ১৮১

বাংলাদেশে জাতিগত সংকট ও উত্তরণের উপায় সংখ্যার প্রতিক্রিয়া

‘জাতিগত সংকট ও উত্তরণ’ সংখ্যা: একটি বিকল্প পাঠ-প্রতিক্রিয়া

রইসউদ্দিন আরিফ

বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা ত্রৈমাসিক ‘হালখাতা’-র জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০ সংখ্যাটি বের হয়েছে ‘বাংলাদেশের জাতিগত সংকট ও উত্তরণ’ শিরোনামে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জাতিগত সংকটের প্রশ্ন একটি গুরুতর প্রশ্ন।

যাঁদের লেখায় এ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা সকলেই প্রগতিশীল চিন্তার ধারক এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। জাতিগত সংকটের গুরুত্ব ও সংকট উত্তরণের তাগিদ থেকে লেখা হালখাতা-র এ সংখ্যার অধিকাংশ প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায়, দেশের জাতিগত সংখালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যা-সংকট ও তার উত্তরণের উপায় সম্পর্কে প্রগতিশীল রাজনীতিক বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গি অতীতের চেয়ে, এমনকি দশ বছর আগের চেয়েও অনেকখানি পরিষ্কার হয়েছে। বাংলাদেশে জাতিগত সংকটকে একক বিষয় হিসেবে নিয়ে কোনো পত্রিকায় এক সংখ্যায় গুরুত্বসহকারে এরকম বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যাপক আলোচনা এর আগে হয়েছে বলে মনে হয় না। এ কারণে সম্পাদক শওকত হোসেনের এই উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

এক.

হালখাতার এই বিশেষ সংখ্যাটির সূত্র ধরে এবং সম্পাদক ও প্রাজ্ঞ লেখকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে এর পাঠ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে খানিকটা ভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের জাতীয় রাজনীতি ও জাতিগত সংকটের কিছু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রশ্ন আকারে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমেই বলব, দেশের জাতিগত সংখ্যালঘু সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়ে এর আগে বিশেষভাবে সমতলের বাংলা-ভাষাভাষী রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা বিস্তর লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু সেসব লেখালেখি সমস্যা সমাধানে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বরং গত চল্লিশ বছরে জাতিগত সংকট নিয়ে রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখির স্তূপ যত বড় হয়েছে, জাতিগত সংকটের

স্তূপ তার চেয়ে আরো বেশি বড় হয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশের জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর 'উদ্ধারকল্পে' বাংলাভাষাভাষী একশ্রেণীর 'প্রগতিশীল' রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যের মধ্যে পীড়াদায়কভাবে বৃহৎ বাঙালি জাত্যভিমানের মতো প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গিরও বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। এগুলো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। আরো অভিজ্ঞতা হল, বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠী, যারা শুধু সংখ্যায়ই বড় নয়, কাজে-কর্মে না হলেও কথায় অনেক বড়, তারা গত চল্লিশ বছরে যেমন জাতিসত্তাগুলোর সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি, তেমনি বাঙালি জাতির সমস্যাও তারা সমাধান করতে পারেনি।

বাঙালি জনগোষ্ঠীর এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সমস্যা সমাধানে এই যে আমাদের বৃহৎ বাঙালিদের ঐতিহাসিক ব্যর্থতা, তার কার্যকারণ কিন্তু ইতিহাসের মধ্যেই লেপ্টে আছে। সেই ইতিহাসের কিছু খণ্ডচিত্র হালখাতার এই বিশেষ সংখ্যাটিতেও দেখা যায়। এ সংখ্যার অন্যতম লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান তাঁর 'বাংলাদেশে জাতিগত সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, "সন্তু লারমার বড় ভাই মানবেন্দ্র লারমা তৎকালীন সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের আবেদন জানিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'তোরা সবাই বাঙালি হয়ে যা'।" অতঃপর আবেদ খান বলছেন, "অনেকে এই কথাটিকে কোট করে বঙ্গবন্ধুকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। আসলে সেই সময়ে পাকিস্তানবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের মূল স্পিরিট হিসেবে বাঙালিত্ব বোধ-ই ছিল প্রধান চেতনা। ...'তোরা বাঙালি হয়ে যা'– এমন একটি কথা বঙ্গবন্ধু হয়তো সেই সময়ের মূল স্পিরিটের সঙ্গে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে আহ্বান জানানোর জন্যই বলেছিলেন।"

জনাব আবেদ খানের এই বয়ানকে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি রক্ষার প্রয়াস বলে গণ্য করেই আমরা হয়তো নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম। কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের কথিত 'মূল স্পিরিটে'র প্রসঙ্গ তুলে তিনি ইতিহাসের কলঙ্ক ঢাকার যে আনাড়ি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন– তার মধ্যে শুধু সংকীর্ণ দলীয় চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। এটি দেশের জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য এখনো এক বিপজ্জনক বার্তা বলেই মনে হয়!

দুই.

বাংলাদেশ যে শুধু এক জাতির (বাঙালি জাতির) রাষ্ট্র নয়, বহু জাতির রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেক জাতিসত্তার (সংখ্যায় যত নগণ্যই হোক), জাতিরাষ্ট্রে তাদের মর্যাদা ও অধিকার সমান, আর সেই সমঅধিকার ও সমমর্যাদা না দিলে– অতীতে যেমন ভারত বিভক্ত হয়েছে (হয়তো আরো হবে), পাকিস্তান বিভক্ত হয়েছে (তা-ও হয়তো আরো হবে) এবং বাংলাদেশেরও তদ্রূপ অবস্থা হতে পারে– এই হুঁশজ্ঞান যে এখনো আমাদের পুরোপুরি হয়নি, এখনো যে বাঙালিয়ানার ('মূল স্পিরিটের') তেজ কমেনি তা তো একটু আগেই টের পাওয়া গেল। সুতরাং যে জাতিগত সংকট উত্তরণের জন্য

আমরা যারপরনাই পেরেশান, সেই উত্তরণের পথ খোঁজার জন্য সংকটের গোড়ায় হাত দিতে হবে, এবং জাতি ও জাতিরাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা অতীতে কতটা অস্পষ্ট ছিল, আর বর্তমানেই-বা কতটা স্পষ্ট হয়েছে তারও মূল্যায়ন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বিগত শতকের পঞ্চাশ ও ষাট দশকেও আমাদের মধ্যে জাতি ও জাতিরাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তাচেতনার দৈন্য এতটাই প্রকট ছিল যে– কি ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনে, কি স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলনে নিজ ভূখণ্ডের শুধু বাঙালি জাতি ছাড়া আর কোনো জাতি বা জাতিসত্তার মুক্তির ভাবনা আমাদের চিত্তে স্থান পায়নি। এমনকি মাতৃভাষা সংরক্ষণের আন্দোলনে বৈশ্বিক মাপের ইতিহাস সৃষ্টি করেও আমাদের নিজ ভূখণ্ডের অপরাপর জাতি ও জাতিসত্তাগুলোর প্রায় ডজনখানেক ভাষার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও তাদের যথাযথ মর্যাদা আমরা দিতে পারিনি। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ কী? আমরা প্রগতিশীল দাবিদাররাও কি এ কাজে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেইনি?

আর রাজনৈতিকভাবে যে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে– ষাটের দশকে ভূখণ্ডের বাম রাজনীতিতে জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে মত ও পথের ভিন্নতা, বিভ্রান্তি, অনৈক্য, বিভেদের কারণে জাতিমুক্তি ও জাতিরাষ্ট্র গঠনের রাজনীতির স্বাভাবিক গতিধারা বিপর্যস্ত হয়। তারই পরিণতিতে ষাটের দশকের শেষের দিকে সামন্ত-পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী শ্লোগান তুঙ্গে ওঠে। সেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনা কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রগতিশীল শক্তির মধ্যেও সংক্রমিত হয়।

অতঃপর সেই উগ্র সাম্প্রদায়িক বাঙালিয়ানার (কথিত মূল স্পিরিটের) ডামাডোলের মধ্য দিয়েই যখন ভূখণ্ড স্বাধীন হল, তখন অধিকাংশ প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক শক্তিগুলোও গড্ডালিকার মতো সেই সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের স্রোতেই গা ভাসাল। বাংলাদেশ শুধু বাঙালির রাষ্ট্র– এই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি জন্ম নিল এভাবেই। পাহাড়িদের 'বাঙালি বানানোর' হিটলারি রাজনীতিরও জন্ম হল এভাবেই।

তিন.

অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এক্ষণে জাতিগত সংকট ও উত্তরণের মূল প্রশ্নটি খুব সহজভাবে উপলব্ধির জন্য ভূখণ্ডের ষাটের দশকের রাজনীতির একটি বিপরীত স্রোতের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাই, যা জাতিগত সংকট ও উত্তরণের সংগ্রামে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা হতে পারে বৈকি।

আজকের নতুন প্রজন্ম হয়তো জানেই না– ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানের জাতিগত নিপীড়নের (মতান্তরে উপনিবেশিক শোষণ-নিপীড়নের) বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে পূর্ববাংলার সামন্ত-পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী শ্লোগান যখন তুঙ্গে, তখন ১৯৬৭ সালেই ভূখণ্ডের বাঙালি ও ক্ষুদ্র

জাতিসত্তা উভয় জনগোষ্ঠীর মুক্তির কথা গুরুত্বসহকারে উপলব্ধি করেছিলেন একজন বাঙালি– তিনি হলেন সিরাজ সিকদার। সিরাজ সিকদার জাতিমুক্তির অর্থ বুঝেছিলেন ভূখণ্ডের ছোট-বড় সকল জাতি ও জাতিসত্তার মুক্তি।

তাই তো দেখা যায়, ৬৭-৬৮-তেই সমতলের এই তরুণ বাঙালি বিপ্লবী উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আধা-সামন্তবাদের শৃঙ্খলমুক্তির লড়াইয়ের প্রথম ভ্রূণ তৈরি করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিতে, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হয়ে। ৬৭-৬৮-তেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাগুলো তাদের মুক্তির লড়াইয়ে সহযোদ্ধা হিসেবে পেয়েছিলেন সিরাজ সিকদার নামের এই তরুণ বাঙালি বিপ্লবীকে। যিনি পাহাড়িদের সাথে একাত্ম হয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বাঁশের কোঁড় খেয়ে, পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে পাথর সিথান দিয়ে শুয়ে শুয়ে ঝর্ণার কলতান আর বনপোকার গান শুনতে শুনতে সমতলের নিপীড়িত বাঙালিদের গল্প শুনিয়েছিলেন পাহাড়ি জনগণকে। গল্প শুনিয়েছিলেন নিপীড়িত পাহাড়ি জনগণের মুক্তির লড়াইয়ের। পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে বসে কবিতা লিখেছিলেন–

‘পাহাড়ের ঢাল বেয়ে
নেমে আসে মুরং মেয়ে
অঙ্গে তার ছোট্ট আবরণী
কী নিটোল স্বাস্থ্যবতী
কবে তার কাঁধে
শোভা পাবে রাইফেল একখানি।’

সিরাজ সিকদার বলেছিলেন– পাহাড়ের জাতিগত সংখ্যালঘুরা যেমন শোষিত-নিপীড়িত, তেমনি সমতলের বাঙালি জনগণও শোষিত-নিপীড়িত। তারা উভয়েই শোষিত-নিপীড়িত একই শোষক ও নিপীড়কের হাতে। তিনি বলেছিলেন– এসো, আমরা পাহাড়ি-বাঙালি মিলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করি অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে।

আজকের নতুন প্রজন্ম হয়তো একথাও জানে না যে, ৬৮-তেই সিরাজ সিকদার ভূখণ্ডের সমস্ত জনগণের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক মুক্তির লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে প্রথম সশস্ত্র ট্রেনিং ক্যাম্প গড়ে তুলেছিলেন পাবর্ত্য চট্টগ্রামের মাটিতে। ‘৬৮ থেকে ’৭৫ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বে প্রথম সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী এবং এদেশের ইতিহাসে বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম একটি নিয়মিত বাহিনীও গড়ে উঠেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে– পাহাড়ি ও বাঙালি যোদ্ধাদের সমন্বয়ে। বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালেখি ও বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য ‘কুম্ভীরাশ্রু’ বিসর্জনের পরিবর্তে সিরাজ সিকদার বাঙালি ও পাহাড়িদের একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হয়ে ওঠার বাস্তব অনুশীলন শুরু করেছিলেন ষাটের দশকেই। পরবর্তীতে উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রশক্তির হাতে সিরাজ সিকদার খুন ও একটি অখণ্ড ধারার বিপ্লবী তৎপরতার বিপর্যয়ের পর উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-

নিপীড়নের কারণে এবং সমতলের প্রগতিশীল শক্তির ভুল ও ব্যর্থতার কারণে অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে পাহাড়ি-বাঙালির সেই ঐক্যবদ্ধ লড়াই কীভাবে তথাকথিত 'শান্তিবাহিনী'র নেতৃত্বে বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাহাড়িদের লড়াইয়ে পরিণত হল সে ইতিহাস তো মোটামুটি সকলেরই জানা।

চার.

একাত্তরে বাঙালি-পাহাড়িসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নির্বিশেষে ভূখণ্ডের সমস্ত জনগণের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী শক্তি একচ্ছত্রভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার ফলে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। রাষ্ট্রের সংবিধানে জাতিসত্তাগুলোর কোনো স্বীকৃতি না থাকায় জাতিসংকট নতুন করে তীব্র রূপ ধারণ করল। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘুরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রশক্তি পাহাড়িদের ওপর নিষ্ঠুর জাতিগত নিপীড়নের পথ বেছে নিল। পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার 'হিটলারি' নির্দেশ ছাড়াও পাহাড়িদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, নির্বিচারে আটক-হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে জাতিগত সংকটকে ভয়াবহ করে তোলা হল।

অতঃপর '৭৫-এর 'পটপরিবর্তনে'র পর পাহাড়িদের ওপর দমন-পীড়নের নতুন মাত্রা যোগ হল। নতুন রাষ্ট্রশক্তি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ঘোষণা করলেও 'বাংলাদেশী'-র নামে মূলত অঘোষিত আরেক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনা– 'মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদ' মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এর আগে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যেখানে সকল পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেখানে কথিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়ে সমতলের লাখ লাখ বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করে ঠাণ্ডামাথায় পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ে পাহাড়িদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল।

পার্বত্যবাসীরা এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুললে তাদের ওপর রাষ্ট্রশক্তির দমন-পীড়নের নতুন মাত্রা যোগ হল– সরাসরি ব্যাপক সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপন করা হল বহু সামরিক ক্যাম্প। পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান কাজ হয়ে উঠল পুনর্বাসিত বাঙালিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পাহাড়িদের ওপর নির্মম দমন-পীড়ন। তথাকথিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রশক্তি পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসিত বাঙালিদের ঠেলে দিল উগ্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের দিকে। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী রাজনীতি রূপ নিল পাহাড়ি-বাঙালি সংঘাতে। এর ফলে হাজার হাজার পাহাড়ি জনগণ নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কীভাবে সীমান্তের ওপারে গিয়ে শরণার্থী হয়ে প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হল সে ইতিহাস সকলেরই জানা।

এইরূপ পরিস্থিতির জন্য পাহাড়িদের কোনোভাবেই দায়ী করা যায় না। আবার এর জন্য সাম্রাজ্যবাদের দালাল প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লেখালেখি ও বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে গালমন্দ করে তৃপ্ত থাকারও কোনো অবকাশ নেই। আমরা মনে করি, এর দায়দায়িত্ব বেশি করে বর্তায় সমতলের বাংলাভাষাভাষী প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ওপর। কারণ রাষ্ট্রশক্তি যখন পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে হিটলারি আচরণ করে, সুপরিকল্পিতভাবে কয়েক লক্ষ বাঙালিদের যখন পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসিত করতে থাকে, তখন তার বিরুদ্ধে সমতলের প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলো পাহাড়িদের সাথে একাত্ম হয়ে দেশব্যাপী কোনো বৃহৎ আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলা তো দূরের কথা, এমনকি দীর্ঘ কয়েক দশকে তাদেরকে রাজপথে বড় কোনো প্রতিবাদ মিছিল করতেও দেখা যায়নি। লেখালেখি ও বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে 'কুম্ভীরাশ্রু' বিসর্জনকারী প্রগতিশীল বাঙালিদের প্রচ্ছন্ন ধারণায়– পাহাড়িদের মুক্তির সংগ্রাম বুঝি শুধু পাহাড়িরাই করবে। আদিবাসীদের মুক্তির লড়াই বুঝি শুধু আদিবাসীদেরই লড়াই। এবং এই মানসিকতায় তাড়িত হয়ে বাঙালিদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণেই পার্বত্য অঞ্চলসহ সমগ্র দেশের জাতিগত সংকট আজকের ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পেরেছে।

যার পরিণতিতে দেখা যায়– এক সময়ের জুম্ম জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো আজ ফ্যাসিবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক বাঙালি অথবা সাম্প্রদায়িক মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের পথ ছেড়ে, রাষ্ট্রের পূর্ণ ও সমান নাগরিক হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির লড়াই পরিত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী হানাহানির পাশাপাশি জাতিসংঘের সুরক্ষা সনদের আশ্রয়ে 'আদিবাসী' হওয়ার তদবিরে ব্যস্ত।

রইসউদ্দিন আরিফ
সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিক, গবেষক, প্রাবন্ধিক
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

প্র ব ন্ধ

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া: নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি মন্তব্য

আ নি সু জ্জা মা ন

মানুষ[১] একটি সমাজবদ্ধ প্রাণী। সমাজ-বহির্ভূত জীবন স্বাভাবিক মানবজীবন নয়।[২] পৃথিবীতে মানুষের আগমনের যে জৈবিক প্রক্রিয়া সেখানেও সাধারণভাবে প্রথমত ও প্রধানত দু'জন মানুষ– একজন মানব আর একজন মানবী– যুক্ত। এ দু'জন মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য জীবনোপকরণের প্রয়োজন সে সবের উৎপাদন ও যোগানদানের সাথে অসংখ্য মানুষ জড়িত যাদের সবাইকে এদের পক্ষে জানাও প্রায় অসম্ভব। মানুষের মধ্যে রয়েছে ইচ্ছাশক্তি ও সে ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কর্মশক্তি। নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষকে তার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে অগ্রসর হতে হয়। প্রতিটি মানুষই একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বৈক্তিক কাঠামোর অধিকারী। বস্তুত, নিষ্প্রাণ জড়বস্তু ও মানবেতর প্রাণী থেকে তার মৌলিক স্বাতন্ত্র্য এখানেই। বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অনেক প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা মোটামুটিভাবে অভিন্ন প্রকৃতির; আর কতগুলো প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত। এ শেষোক্ত ধরনের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার কারণে মানুষের মধ্যে কামনার দ্বন্দ্ব[৩] দেখা দেয়। মৌলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ব্যক্তিমানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য, এমনকি যেখানে একাধিক মানুষ আছে সেখানেও, কতগুলো নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ও সামষ্টিক জীবনে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার দ্বন্দ্বমূলক প্রেক্ষাপটেই নৈতিকতা ও আইনের উদ্ভব, পরিবর্তন ও বিকাশ। আপাতদৃষ্টিতে এ অতিসাধারণ, কিন্তু অপরিহার্য কথাগুলো মনে রেখে এখন আমি সব ধরনের দার্শনিক পরিভাষা ও বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া সম্পর্কে মোটা দাগে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব।

প্রথম কথা হল, একজন জীবন্ত মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করবেই, আর সাধারণভাবে বললে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই ব্যবহারই কাজ।[৪] অন্য কথায়,

জীবিত মানুষ কখনও কোনো না কোনো কাজ না করে থাকতে পারে না। এজন্য বলা হয় কাজই জীবন। নিষ্ক্রিয়তাই মৃত্যু।[৫]

দ্বিতীয় কথা হল, মানুষ এই যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে, মানুষের এসব কাজ সমপর্যায়ভুক্ত বা একই ধরনের নয়। মানুষের কাজের মধ্যে কেবল ভিন্নতা নয়, শ্রেণীভেদ আছে। মানুষের কিছু কাজ ভালো, কিছু কাজ মন্দ; কিছু কাজ খুবই ভালো, কিছু কাজ খুবই খারাপ। অন্যভাবে বললে, আমরা মানুষেরা কেবল কাজই করছি না, কাজের মূল্যায়নও করছি। একজন জীবিত মানুষ কাজ ছাড়া যেমন থাকতে পারে না, ঠিক একইভাবে মানুষ কাজের বাছ-বিচার তথা মূল্যায়ন বা ভালো-মন্দ-নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। আর ভালো কাজের সাথে প্রশংসা ও পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য নিন্দা বা/ও শাস্তি যুক্ত।[৬]

তৃতীয় কথা হল, মানুষের বিভিন্ন ধরনের কাজ অধ্যয়ন, বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জ্ঞানশাখার সৃষ্টি হয়েছে। কিছু উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু মানুষ মানুষের প্রয়োজন ও প্রকৃতিকে অতিক্রম করে বিভিন্ন প্রাণী, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষরাজি, তৃণ-গুল্ম, এমনকি, নিষ্প্রাণ জড়বস্তু ও প্রকৃতি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছে এবং এ গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করেছে। আবার, কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতাদর্শী মানুষের হাতে জ্ঞানের অপপ্রয়োগও হয়েছে। এ বিবিধ ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। বস্তুত, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ, স্বাধীন ও পারস্পরিক সমঝোতায় ভরা জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা থেকে এভাবে বিভিন্ন জ্ঞানশাখা বিস্তার লাভ করেছে। আর এভাবেই মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও মানবপ্রকৃতির ক্রমবর্ধনশীল চাহিদা মেটানোর স্বাভাবিক প্রয়াসের মধ্য দিয়েই আমরা মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছি। উপরিউক্ত ভূমিকার আলোকে গভীরভাবে দেখলে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক, বর্ণনা ও ব্যাখ্যামূলক; দুই, বিচারমূলক বা মূল্যায়নধর্মী। নৈতিকতার প্রসঙ্গটি দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞানশাখার অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের জীবনধারণের জন্য বাতাস ও পানির পরই নির্ভেজাল খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে, অনেক মানুষই খাদ্য সরবরাহের সময় নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ না করে ভেজাল খাদ্য সরবরাহ করছে। এ কাজটি যে ভালো নয় তা যেকোনো সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। সাধারণভাবে যা ভালো নয়, তা-ই অনৈতিক। অনৈতিক কাজের মধ্যে যেসব কাজ একটা সীমা বা মাত্রা অতিক্রম করে সেগুলো কেবল নিন্দার্হই নয় বরং বেআইনি তথা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই খাদ্যে ভেজাল দেওয়া কেবল একটি অনৈতিক কাজ নয় বরং এটি একটি শাস্তিযোগ্য– কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোনো অপরাধের নৈতিক ভিত্তি থাকে না; অপরদিকে, ভালো কাজ এ জন্য ভালো যে তার একটি নৈতিক ভিত্তি আছে। খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। এজন্য এটি একটি মন্দ কাজ। কেন এর নৈতিক ভিত্তি নেই সে বিষয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আমি সে দীর্ঘ দার্শনিক আলোচনায়

না গিয়ে এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব যে কথাগুলোকে এ বিষয়ের সর্ব প্রধান ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনার সারাৎসার বলা যেতে পারে।

প্রথমত, উৎসের দিক দিয়ে, নৈতিকতা প্রধানত দুই প্রকারের; এক, ধর্মীয় নৈতিকতা;[৭] দুই, ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতা।[৮] যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান এবং এ প্রবন্ধের পরিসর সীমিত, সেজন্য ধর্মীয় নৈতিকতা বলতে আমি প্রধানত এ জনপদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাস তথা ইসলামকেই ভিত্তি-ধর্ম হিসেবে ধরে নেব আর অন্য ধর্মের প্রতি প্রসঙ্গক্রমে কেবল ইঙ্গিত দেব।

ইসলামের দৃষ্টিতে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া একটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ– কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলামের নবী স্পষ্ট করে বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয় সে কার্যত তাঁর অনুসারী নয়"। ইসলামে অধিকার প্রধানত দুই প্রকার : একটি স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত, অপরটি সৃষ্টির সাথে যুক্ত। খাদ্যে ভেজাল দেওয়া দ্বিতীয় ধরনের অধিকারভঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গই এ অপরাধ ক্ষমা করার অধিকারী, অন্যথায়, তার/তাদের পক্ষে এ অপরাধের শাস্তি স্রষ্টা দেবেন। সনাতন হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মেও খাদ্যে ভেজাল দেওয়াকে অত্যন্ত গর্হিত একটি কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে।

বর্তমান প্রসঙ্গ বিচারে ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতা প্রধানত তিন প্রকার। এক, বৌদ্ধ নৈতিকতা; দুই, মার্ক্সীয় নৈতিকতা ও তিন, উপযোগবাদী নৈতিকতা।[৯] বৌদ্ধ মতাদর্শে স্রষ্টা ও স্থায়ী আত্মার প্রসঙ্গ স্পষ্ট না হলেও এটি একটি কঠোর নৈতিক নিয়ম ও অনুশাসন ভিত্তিক জীবনাদর্শ। এ জন্য খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া বৌদ্ধ জীবনাচারে কঠোরভাবে নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য।

মার্ক্সীয় জীবনবোধে নৈতিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১০] বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিরোধী যা তা সবই অনৈতিক। প্রত্যেক জনপদের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী খেটে খাওয়া মানুষ। খাদ্যে ভেজাল দেওয়ায় এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবেচেয়ে বেশি। তাই মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া একটি ভয়ানক অনৈতিক কাজ।

উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যা অধিকাংশ লোকের সর্বাধিক গুণ তথা কল্যাণ বয়ে আনে না– তাই অনৈতিক। খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার মাধ্যমে এ অপকর্মে লিপ্ত গুটিকয়েক লোকের সাময়িক কিছু আর্থিক সুবিধা আসতে পারে, কিন্তু পরিণতিতে অধিকাংশ জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্য উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও খাদ্যে ভেজাল দেওয়া একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় তথা অনৈতিক কাজ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া আস্তিক-নাস্তিক তথা কেউ স্রষ্টায় বিশ্বাস করুক অথবা স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হোক সবার কাছেই এটি একটি ভয়ানক অনৈতিক কাজ। একজন সাধারণ মানুষ থেকে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, মার্ক্সবাদী, বৌদ্ধ, উপযোগবাদী সবাই এ ব্যাপারে একমত যে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার পক্ষে কোনো সুযুক্তি নেই, নেই কোনো নৈতিক ভিত্তি। বস্তুত, অবিকৃত মানবপ্রকৃতির মধ্যেই নৈতিকতার মূল বীজ নিহিত। এর পরও যে সব লোক

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয় তাদের মন-মানসিকতা সুস্থ নয়। তাদের চিকিৎসা প্রয়োজন; এ চিকিৎসা হল তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ প্রশিক্ষণ কেবল পুঁথিগত নয় বরং তাদের আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষের জীবন্ত সাহচর্যে নিয়ে যেতে হবে। সৎকথার প্রয়োজন আছে, এবং এ ক্ষেত্রে সৎ লোকের বিকল্প নেই।[১১]

উন্নত বিশ্বে নাগরিক ও ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তথা বিভিন্ন কাজ ও পেশাভিত্তিক সংগঠন নিজ নিজ ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন নৈতিক বিধি প্রণয়ন করেছে[১২] এবং তা কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন আইনি প্রতিষ্ঠানও আছে। আমাদের দেশেও সে ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠান আছে।[১৩] এ লক্ষ্যে কিছু আইনও আছে, আছে নাগরিক ও ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান; কিন্তু বিভিন্ন পেশাগত নৈতিক বিধানের বেশ অভাব। সর্বোপরি নানা কারণে আইনের প্রয়োগ শিথিল। প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা সন্তোষজনক নয়। ফলে ভেজাল জিনিসে বাজার ভরে গেছে। নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য পাওয়া খুবই দুষ্কর। আমরা যদি অবিলম্বে এ সম্বন্ধে সচেতন না হই ও জনগণকে সচেতন করে না তুলি তাহলে জনস্বাস্থ্যের বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটবে। এ অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য নৈতিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটাতে হবে। সেজন্য উপযুক্ত নৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। কার্যকর নৈতিক বোধের ওপর ভিত্তি করে বাস্তবসম্মত আইন প্রণয়ন করতে হবে। এ সব আইন প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরনের গতিশীল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। আমরা যদি এ কাজগুলো সফলতার সাথে করতে পারি তাহলে খাদ্যে ভেজাল দেওয়াসহ সব ধরনের অনৈতিক ও বেআইনি কাজ থেকে সমাজকে মুক্ত করে একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব।

পাদটীকা

১। পাশ্চাত্য দর্শনে 'মানুষ' বলতে 'বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী' (rational animal) বুঝানো হয়েছে। এ ব্যবহারে

যার আবরণে বুদ্ধিমত্তার ন্যূনতম প্রকাশ নেই সে যথার্থ অর্থে মানুষ নয়। এ কারণে সদ্য-প্রসূত বা

কাছাকাছি সময়ের শিশুকে ঠিক ব্যক্তি বলা হয় না। বলা হয় 'সম্ভাবনাময় ব্যক্তি' (potential per-son)|

২। এরিস্টটল মানুষকে সামাজিক সত্তা হিসেবে দেখেছেন। সমাজেরই বিকশিত ও সংহত রূপ রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ অর্থে তাঁর কাছে মানুষ একটি রাজনৈতিক সত্তা (Political being)|

৩। Confliet of desire.

৪। এটি কাজের একটি অতি সরল সংজ্ঞা। দর্শনে 'কাজ' (action) হতে হলে তা অবশ্যই ইচ্ছাকৃত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হতে হবে। দেখুন, Jerome A.shaffe, Philosophy of Mind, New Jersey, Englewood cliffs,1964, ch. V

৫। এটি আল্লামা ইকবালের কাব্যে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত উক্তি।

৬। অনৈতিক কাজ যদি একটি সীমানা বা মাত্রা অতিক্রম করে তাহলে তা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ

গ্রহণ করা হয়। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে। এসব মতের মধ্যে চারটি মত প্রধান। অপরাধ ও শাস্তির সম্পর্কে বিভিন্ন নৈতিক মত বিষয়ে জানার জন্য দেখুন। Nigel Warburton, Philosophy Basics, London Routledge, 2000, pp-82-91.

৭। 'ধর্মীয় নৈতিকতা' বলতে আমি বুঝিয়েছি সে সব নৈতিক মতকে যাদের উৎস ধর্মীয় গ্রন্থ।

৮। 'ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিকতা' বলতে আমি বুঝিয়েছি এমন একটা অবস্থাকে যেখানে নৈতিকতার উৎস কোনো মানব-ঊর্ধ্ব সত্তা বা শক্তি নয় বরং মানুষ ও তার পরিবেশ।

৯। উপযোগবাদী নৈতিকতার শক্তিমান প্রবক্তা John Stuart Mill তাঁর Utilitarianism নামক গ্রন্থে তিনি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নৈতিকতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন মত সম্বন্ধে জানার জন্য দেখুন। John Hosper, An Introduction to Philosophical Analyses, New Dehli, Allied Publishers, pp. 580-616.

১০। অনেকে মনে করেন মার্ক্সবাদ যেহেতু দার্শনিক বিবেচনায় নিরীশ্বরবাদী তাই সেখানে নৈতিকতার কোনো প্রশ্ন নেই। এটি ভয়ানক অজ্ঞতাপ্রসূত একটি ধারণা; বরং মার্ক্সবাদে নৈতিকতার প্রসঙ্গ খুবই প্রবল। এটি অবশ্য স্বীকার্য যে এ নৈতিকতার উৎস ও প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচলিত নৈতিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

১১। আজ যে বাস্তবে নৈতিকতার অভাব তথা মূল্যবোধের অবক্ষয়, এর মূল কারণ এই যে, একে তো নৈতিকতা সম্বন্ধে আলোচনার বড় অভাব; দ্বিতীয়ত এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হল নৈতিকতা সম্বন্ধে যদিও কদাচিৎ বলা হয়, কিন্তু বক্তার জীবনে নৈতিকতা নেই। অন্য কথায় আমাদের সামনে নৈতিক জীবন যাপনকারী মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

১২। পাশ্চাত্যে পেশাগত ও ব্যবসায়ে নৈতিকতা সম্পর্কে অসংখ্য বই বেরিয়েছে। কয়েকটি উপকারী বই :

James E. Post, et al, Business and Society, New York; Mc graw-Hill, Inc.,

1996; Keith Davis, and Robert Blomstrom, Business and Society, New

York; Mc graw-Hill, 1975; John Hospers, Human Conduct, New York,

Hart Court Brace and World, Inc., 1961|

বিভিন্ন ধরনের নৈতিক বিধির জন্য দেখুন। Louis Alvin Day, Ethics in Media com-munications, Belmont : Thomas wodworth, 2003, pp. 445-452|

১৩। যেমন সরকারি পর্যায়ে, ইঝঞও; ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঈঅই ইত্যাদি।

[লেখক: অধ্যাপক, ড. আনিসুজ্জামান, দর্শন বিভাগ এবং পরিচালক, নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

ভেজাল দ্রব্য - ভেজাল মানুষ

আশরাফ সিকান্দার মোহ

দ্রব্যের স্বকীয়তা আছে, এই স্বকীয়তা না থাকলে কোনো দ্রব্য, দ্রব্য হয়ে উঠত না, বস্তুও হত না কোনো বস্তু; দ্রব্যের বা বস্তুর এই স্বকীয়তা নিয়ে কোনো দ্বিমত হওয়ার অবকাশ নেই। দ্রব্য বা বস্তু তার স্বকীয়তা হারায় দু-ভাবেই; এক. মানুষ কর্তৃক, দুই. প্রকৃতিগতভাবে। দ্রব্যের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে প্রকৃতির বিধিবদ্ধ নিয়মকে ধারণ করেই। এখানে মানুষের হাত নেই, এর জন্য কেউ দোষী নয়, কাউকে দোষী বলে দায়ী করা চলে না।

দ্রব্যের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ফল যদি নষ্ট বস্তু বা দ্রব্যে পরিণত করে তবে সমস্যার সূত্রপাত হয় এখানেই। সেই নষ্ট দ্রব্য বা বস্তুকে নির্ভেজাল বলে চালানোর

প্রবণতা দেখা দেয়, এর জন্য মানুষের দু-ধরনের মানসিকতা কাজ করে; এক. ক্ষতি, দুই. মুনাফা; এই দুই মনোবৃত্তি দেখা দেয়।

দ্রব্যের স্বকীয়তা হারানোর পূর্বে দ্রব্যের পরিচিতি যা ছিল, দ্রব্যের পরিবর্তনে সেই পরিচিতি থাকতে পারে, আবার না-ও পারে, কিন্তু পরিচিতির পরিবর্তন ঘটেই। প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে বস্তুর পরিচিতি যাই হোক না কেন, তাকে ভেজাল অথবা নকল যা-ই আখ্যা দেয়া হোক না কেন, বিষয়টি ধর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু মানুষ কর্তৃক দ্রব্যটি আংশিক বা পরিপূর্ণ যেভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন মানবসমাজে তখন বস্তুটি ভেজাল বা নকল নামে অভিহিত হয়। মানুষ কর্তৃক বস্তুটি স্বকীয়তা হারায়, বস্তুটি সমাজে অবজ্ঞা, ঘৃণা, অগ্রহণযোগ্য এসব আখ্যায় অভিহিত হলেও দ্রব্যটির মান-সম্মানের হানি হয়েছে বলে দ্রব্যটি বিবেচিত হয় না, বস্তুটির প্রতি মানুষের ক্ষোভ, আফসোস কিংবা অগ্নিমূর্তির মতো বিকার প্রাপ্তি হয় না। তার হয়ে মানুষই এসব প্রকাশ করে তার পরিবর্তনকারীকে ঘৃণা করে। দ্রব্য বস্তু হয়ে প্রতিবাদী হতে পারে না, তার প্রতিবাদের মতো অবস্থা প্রাপ্তি ঘটলে মানুষকে ভেজাল কারবারি, নকলকারক আখ্যা পেতে হত না, যদি সেটাই হত তাহলে মানুষের খুব বেশি লাভ হত। অবশ্য এর অন্য একটি দিক আছে, বস্তুটি মানুষের পক্ষে ব্যবহৃত হত কি না সন্দেহ আছে : এবং সেটি দুশ্চিন্তার বিবেচ্য বিষয় হয়ে দেখা দিত।

ভেজাল ও নকল দ্রব্যটির নির্বাহক মানুষ, যে বস্তু বা দ্রব্যটির স্বকীয়তা বিনষ্ট করে শুধুমাত্র সেটুকুই নয়, তার মানব-স্বকীয়তা এখানে সে হারায় নিজের হাতেই, সেই মানুষটি সমাজ কর্তৃক আখ্যা পায় দুর্নীতিপ্রবণ দুশ্চরিত্র মানুষ রূপে, যাকে ভেজাল মানুষও বলা যায়। দ্রব্যের নিজের ক্ষমতা নেই ভেজাল বা নকলে পরিবর্তিত হওয়ার; তাকে মানুষ কর্তৃক ভেজাল বা নকল দ্রব্যে পরিণত হতে হয়, যা ভেজাল মানুষের ভেজাল মানসিকতার ফসল। ফলে এক কথায় ভেজাল হল ভেজাল মানুষের কৃতকর্ম।

অতি মুনাফার লোভে মানুষ যখন রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে চায়, তখন তাকে যে অনৈতিকতা, অসততার শরণাপন্ন হতে হয় তাকে ভেজাল নামে আখ্যায়িত করা যায়। এই ভেজাল দিনের পর দিন শাখা-প্রশাখা বিস্তার বা ডালপালা মেলে। দৃঢ় মূল-শিকড় প্রোথিত করে সমাজকে অশান্তি, সংঘর্ষপ্রিয়, অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়ে মানব-সমাজ মানব-জীবনকে অস্থির করে তোলে। অধিকন্তু এই ভেজাল সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে হরণ করে দুর্বিষহ জীবনের ঘেরাটোপে ফেলে দেয়। ভেজাল মানুষ রাতারাতি বড়লোক হয়, অট্টালিকা তৈরি করে, গাড়ি হাঁকায়, তার প্রতিবেশীরা এসব দেখে নিজেরাও একসময় ভেজালের শরণাপন্ন হয়, বেড়ে চলে সমাজজীবনের অস্থিরতা। একসময় ভেজাল কারবারের তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, ভেজাল কারবারিরা নিজেদের ভেজাল কারবারকে রক্ষা করতে সন্ত্রাসী তৈরি করে, ভেজাল টাকা প্রশাসনকে কিনে নেয়, দুর্নীতিগ্রস্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে, নেতাদেরকে মোটা অঙ্কের বকশিস দিয়ে তাদের ভাবমূর্তিতে এঁটে দেয় অনৈতিক অসাধুতার লেবেল। ভেজাল নেতৃত্বের ভেজালে ভেজালে সয়লাব হয়ে যায়

গোটা সমাজ। এভাবেই নৈতিকতা-সততা-নিষ্ঠা-শুভচেতনা নির্বাসনে চলে যায়।

অতি মুনাফার লোভ, আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া, ভূতের টাকায় ধনী হওয়া, গুপ্তধন প্রাপ্তি এ সবের মধ্যে যে ভেজাল নিহিত আছে তা পর্দার অন্তরালে থেকে যায়, সর্বসাধারণের মধ্যে খুব একটা প্রকাশ পায় না। অতি মুনাফার লোভ, আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া, পরস্পর সম্পর্কিত কথা আমাদের সমাজে বিশেষ করে বঙ্গ সমাজে খুব বেশি প্রচলিত, যার প্রচলিত সাধারণ ভাবপ্রকাশ হল তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া বা ধনী হওয়া। আর এই বড়লোক বা ধনী হওয়ার বিষয়টি মোটা দাগে একটি নির্দিষ্ট পেশার মানুষের ওপর গিয়ে বর্তায়, আর সে পেশার নাম হল ব্যবসা।

ব্যবসার ইতিহাস ঘেঁটে পণ্ডিতেরা এর অন্তর্নিহিত সব কিছুই বর্ণনা করেছেন; আদি-মানুষেরা দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটানোর জন্য যে পণ্য বিনিময় প্রথা প্রচলন করেছিলেন এই প্রচলিত পণ্য বিনিময় প্রথাই হল ব্যবসার আদি উৎস। পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থা কালক্রমে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে আজকের আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে রূপান্তর লাভ করে। এই মুদ্রা-বিনিময় আধুনিক সভ্যতা নির্মাণের চাকাকে চালিত করেছে এবং সচল রেখেছে। এখন পণ্য আর মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল মুদ্রা, টাকা, মানুষ কিভাবে কত বেশি টাকা উপার্জন করতে পারে, তারই চিন্তায় সদা দস্যুতায় ব্যাপৃত। ছিন্নমূল ভিখারি মা থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনকুবের বিল গেটস্ সবারই এই-ই ত্রুটি। লক্ষ্য– টাকা। অনেকে বলে জন্ম-মৃত্যুতেও টাকা প্রয়োজন। কিন্তু দার্শনিক বস্তুনিষ্ঠতায় বলতে গেলে, বলতে হবে– জন্ম-মৃত্যুতে টাকার প্রয়োজন নেই, হয় না- কেননা মানুষ জীবমাত্র– সকল জীবের জন্য, জীবনের জন্য, অর্থ প্রয়োজনহীন।

মূলত অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয় মানুষের ক্ষেত্রে– জন্ম ও মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টুকুতে। এই অর্থপ্রাপ্তি মানুষ দুইভাবেই করে থাকে– এক. নীতিনিষ্ঠ সততার মধ্য দিয়ে পক্ষান্তরে দুই. অনৈতিক, অসততার মধ্য দিয়ে। অতি মুনাফার লোভ, পুঁজির সঞ্চয়-আকাঙ্ক্ষা মানবমন যখন পারিপার্শ্বিকতা থেকে শিক্ষা নেয় তখন সে-ও সেই আকাঙ্ক্ষার ফলে অসততার ফাঁদে পা বাড়ায়। এসব কৃত অসততাকে সে রাখঢাক না-করে রাখার চেষ্টা করে, লোকচক্ষু, সমাজের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তাতে অনেক সময় সাময়িক সফলতা লাভ করে। কোনোটি আমৃত্যু চেপে রাখতে পারে। সমাজ ও মানুষ যখন তার কৃতকর্ম জেনে যায় তখন সে হয়ে পড়ে ভেজাল মানুষ। যদি সে তা থেকে কখনো রেহাই পায় কিন্তু নিজের কাছে সে নিজেই পরিচয় লাভ করে ভেজাল মানুষ রূপে-তার অন্তরের এই পচন সে ভোগ করে প্রতিনিয়ত, আত্মদহন তাকে পীড়া দেয় ভেজালমুক্ত হতে, প্রায়শ্চিত্ত করতে– প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য দীর্ঘদিনের অসাধু মানুষটি ধর্মপ্রাণ হয়ে নিস্তার পেতে চায়– মুক্তির কথা শুনে তৃপ্তি পায় কিন্তু শেষ পরিণতি কী, তার হদিশ হয়তো বের করতে পারে না, নিজের ফলাফলকে দেখতে পায়– শিউরে ওঠে, প্রকাশের ক্ষমতা তার তখন হয়ে ওঠে না। এমন আত্মদহনের কষ্ট ও যাতনা নিজের কাছে নিজেই ভোগ করে–

আত্মপ্রবঞ্চনার শাস্তি ও কষ্টের মতো কষ্ট মানুষের আর হয় না। অনৈতিকতার চেতনা যা মানুষের এসব করতে বাধা দেয়, তা থেকে ভেজাল মানুষ মুক্ত হতে পারে না– লোভ তাকে বাধা দেয়– মনের শক্তিকে পরাজিত করে স্বপ্ন দেখায় উপরতলার মানুষটির জৌলুষ ও ভোগের জীবনকে আয়ত্ত করার। মুদ্রা অর্জনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল ব্যবসা। অতিমুনাফা, পুঁজি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়ীরা পণ্যে ভেজাল চালায়, আসলের পরিবর্তে নকল, আসলের মধ্যে নকলের মিশ্রণ। লোকসাধারণ যাকে দু-নম্বরী বলে চিহ্নিত করে। ভেজালে ভেজালে গ্রাস হয়ে যায় গোটা সমাজ। ভিখারি কানির মা থেকে ধনকুবের বিল গেটস কেউই রেহাই পায় না এই ভেজালের খপ্পর থেকে। ভেজালকারী ব্যক্তি নিজেও এই ভেজালের শিকার হয়ে পড়ে। একদিন না একদিন সে-ও গ্রহণ করে ভেজালের পশরা। এই ভেজালের শিকার ছাত্র, ডাক্তার, নেতা, ব্যবসায়ী, কৃষক, নারী, বৃদ্ধ সর্বসাধারণ সবাই।

একসময় হয়তো ভেজাল ছিল গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর মধ্যে, আজ ভেজাল ঢুকে পড়েছে সমাজের সর্বত্র। সমাজে এখন ভেজাল মানুষটি বহাল তবিয়তে আছে। সৎ মানুষটির হয়েছে যত জ্বালা। কেননা তার চারদিকে শুধু ভেজালের বসতি। চিন্তা-চেতনা সর্বত্রই এই ভেজাল ঢুকে পড়েছে। আজকাল ভেজাল মানুষেরাই ভেজাল অর্থ দিয়ে নামমাত্র লোকদেখানো সমাজকর্ম করে প্রশংসা কুড়াচ্ছে। এসব ভেজাল মানুষের গুণকীর্তনে মুখর সবাই। সৎ মানুষটির দশ চক্রে ভগবান ভূত-এর মতো অবস্থা, সে একা।

সমাজের এই অশুভ অবস্থাকে ধর্মবাদীরা কোন চোখে দেখে থাকে? তারাও এভাবেই এসব বিষয়কে দেখে; এসব অনিষ্টের মূলে প্রকৃত শিক্ষার প্রসারহীনতা, নৈতিক বিজ্ঞানের অনগ্রযাত্রা দায়ী। কিন্তু নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসনের ফাঁকগুলো, গলদগুলো খুঁজে দেখে না তারা, আগে অপ-ধর্মের এত তোড়-জোড় প্রচার ছিল না– পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম-অনুসারীরা এক সময় সততা, নিষ্ঠা-নীতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। ইসলাম, খ্রিস্ট, ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষেরা তাদের সততা, নীতি-নিষ্ঠার দ্বারা অন্যান্য ধর্মের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছে, স্ব-ধর্মে দীক্ষা দিয়েছে। আজকে সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠান-পুস্তক-প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে; বেড়েছে পুরোহিত-পাদ্রি-মোল্লার সংখ্যা, কিন্তু নীতি-নিষ্ঠা-সততা দিন দিন ক্ষয় পেয়ে ক্ষীণ কলেবরে হারিয়ে তারাও হয়ে পড়েছে ভেজাল।

বাংলা-ভারতবর্ষের আদি ধর্মপ্রচারক– বৌদ্ধ ধর্মীয় ভিক্ষুগণ শুচিশুভ্র আচার-আচরণের জন্য অনুশাসন পালন করে সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন– কিন্তু আজ ভারতবর্ষ- বাংলায় দুর্নীতি ভেজাল দ্রব্যের কারবার বেড়ে গেছে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি।

সমাজের এই ভেজাল কারবার, দুর্নীতিপ্রবণতা, অশুভ অবস্থাকে ধর্মবাদীরা যে চোখে দেখে শিক্ষার প্রসার বিকাশের অগ্রযাত্রাকে অন্য যে-কারণেই দায়ী করুক না

কেন তারা তাদের গলদগুলোর জন্য অবশ্যই নিজেরাই দায়ী। তারা নিজেরাই অপরাধী অর্থশালীদের আনুকূল্যে চোখ বুঁজে এসব দেখেও না দেখার ভান করে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপায়, যত দোষ এসে পড়ে খণ্ডিতরূপে শিক্ষার-প্রসার ও বিকাশের অন-অগ্রযাত্রার ওপর। ধর্মানুসারীরা আজ অসততার বিরুদ্ধে কথা না বলে– ধর্মীয় পৌরাণিক মিথগুলোর গল্প শোনায়, ধর্মীয় ক্রিয়া-ক্রমের কথা বলে ক্ষান্ত হয়। তাদের এহেন অবস্থা দেখে আধুনিক যুগের সাম্যবাদী দার্শনিক কার্ল মার্কস বলেছেন, "ধর্ম 'আফিম' স্বরূপ যা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।"

ধর্মের সত্যনিষ্ঠা হারিয়ে ধর্ম যখন মানুষের আস্থা হারাচ্ছে ঠিক তেমনি বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষার অপপ্রয়োগ শান্তি-সত্যপ্রিয় মানুষের বীতশ্রদ্ধা কুড়াচ্ছে। ধর্ম পারছে না মানুষকে নিষ্ঠাবান করতে কারণ পুঁজি ধর্মের সুষমাকে গ্রাস করে খেয়ে নিচ্ছে। বেদ-বাইবেল-কোরান-ত্রিপিটকসহ বিশ্বের সকল ধর্মগ্রন্থের শাশ্বত সত্যগুলো আজ চাপা পড়ে আছে, ধর্মগুরু পুরোহিতদের কিছু অশান্তিময় বিভেদবাণী সমাজকে গ্রাস করে নিষ্ঠাবিরোধী নৈতিকতার প্রসারকে চোখ বুঁজে সাহায্য করে যাচ্ছে।

ভেজালের উৎস কোথায় ? উত্তর কী হবে– আধুনিক জটিল জীবনধারায়।

জীবনধারা যত জটিলই হোক না কেন সেই জীবন নিজের অস্তিত্বের স্বার্থেই ভেজাল-এর সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। জটিল জীবনধারা কোনো মানুষকে ভেজাল মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে না। জটিল জীবনধারা একটি নিছক ভ্রান্ত সান্ত্বনা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে অনৈতিকতার সমর্থন আদায়ের জন্য।

ভেজাল বাজারে ভেজাল সর্বত্র। মুনাফালোভী মানুষ রাতারাতি অর্থ-সম্পদশালী হওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভেজালের কারবার করে যাচ্ছে, প্রতারিত হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক মানুষ। এখানে সাধারণ-অসাধারণে কোনো কথা নেই, পার্থক্য নেই। এককথায় ভেজাল ও বিষক্রিয়ার শিকার সবাই।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল শিশুস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। শিশুরা সুস্থ-সুন্দর ভাবে গড়ে উঠুক তা সবাই প্রার্থনা করে। কিন্তু খাদ্যের ভেজাল কারবারিরা শিশুস্বাস্থ্যকে তাদের ভেজালের ব্যবসার বলি করে তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে শিশুর ভবিষতকেও অন্ধকার করে দিচ্ছে। এমনকি শিশুদের এই স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর দিকটি দেশ-জাতির ভবিষ্যতকে সমানভাবে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে ।

**[লেখক: কৃষক ও লেখক। হালখাতা ও গোলাঘর-এর বিক্রয় প্রতিনিধি।
পাকের হাট, দিনাজপুর।]**

খাদ্যে ভেজাল ও শরীরের ওপর এর বিরূপ প্রভাব

এ কে আ জা দ খা ন

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও যেমন দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি দিন দিন বেড়েই চলছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধ। বর্তমানে অন্যান্য সামাজিক অপরাধের মধ্যে খাদ্যে ভেজাল মেশানো একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমানে খুব কম খাবারই আছে যেগুলো ভেজালমুক্ত। দুগ্ধজাত খাবার থেকে শুরু করে শস্য ও শাক-সবজিসহ সকল খাবারেই ভেজাল মেশানো হয়ে থাকে। কিছু কিছু খাদ্যে ভেজাল মেশানো হয়ে থাকে যেমন পাথরের টুকরা, পাতা, মাটি, বালি ইত্যাদি দিয়ে, আবার কিছু খাদ্যে উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে ধাপে কাপড়ের রঙ, নানা রকম ক্যামিক্যাল ইত্যাদি মেশানো হয়ে থাকে। ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত ভেজাল এমনকি প্রাকৃতিক কারণে খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে। তাই খাদ্যের ভেজাল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন– তবে ভোক্তাদের পক্ষে খাদ্যে ভেজালের এই উপস্থিতি নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়।

ইচ্ছাকৃত ভেজাল

ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্যে কিছু উপাদান যোগ করা বা খাদ্য থেকে কিছু অংশ সরিয়ে ফেলা; যেমন তরল দুধে পানি মিশানো, গুঁড়া দুধে আটা মিশানো, গুঁড়া মশলায় মাটি, ইটের গুঁড়া এবং ক্যামিক্যাল মিশানো, গুঁড়া দুধে মেলামাইন যোগ করা ইত্যাদি; মাছে ফরমালিন দেয়া, রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা ফলমূল সংরক্ষণ ও পরিপক্ক করা ইত্যাদি।

আবার মোটা চালকে সরু করে মোম মিশানো এবং চালের উচ্ছিষ্ট অংশ গুড়ি হিসেবে বিক্রি করা কিংবা দুধের ছানার পানি সরিয়ে রেখে তাতে ক্যামিক্যাল মিশিয়ে দুধ বানানো ইত্যাদি।

অনিচ্ছাকৃত ভেজাল

খাদ্যের মান রক্ষায় সঠিক জ্ঞানের অভাব বা সুযোগ-সুবিধাদির অনুপস্থিতির কারণেও খাদ্যে ভেজাল হতে পারে। কীটনাশকের ব্যবহার, কীটপতঙ্গের বিষ্ঠা বা খাদ্যে জীবাণুর সংক্রমণ। যেমন ছত্রাকের আক্রমণ থেকেও খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া হতে পারে। অনিচ্ছাকৃত ভেজালের মূল কারণ হল অজ্ঞতা; এ-জন্য শুধু ক্ষতিটাই আমাদের চোখে পড়ে; ক্ষতির কারণও আমরা অনেক সময় ভালোভাবে জানি না; পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানতে সক্ষম হই যে এটি খাদ্যের ভেজাল ও বিষক্রিয়ার কারণে ঘটেছে।

প্রাকৃতিক কারণে বিষক্রিয়া

স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যের মধ্যে কিছু জৈবিক ও জৈব রাসায়নিক উপাদান থাকতে পারে; যেমন বিষাক্ত ডাল, মাশরুম, কিছু শাক-সবজি, মাছ (পটকা) ও সামুদ্রিক খাদ্য। প্রায় ৫০০০ প্রজাতির বিষাক্ত সামুদ্রিক মাছ রয়েছে এবং যাদের মধ্যে বেশিরভাগই খাদ্য-উপযোগী। এছাড়া বিশ্ব-জলবায়ু যেভাবে পরিবর্তিত ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে– সে-কারণেও নানা রকম খাদ্য-প্রাণীসমূহ বিষাক্ত হয়ে পড়ছে।

স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া

উল্লিখিত খাদ্যগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এইগুলো মারাত্মক কিছু রোগ যেমন: ক্যান্সার, স্নায়ুরোগ, নিদ্রাহীনতা, পক্ষাঘাত, পেটের পীড়া ও মাথাব্যথা সৃষ্টি করে। খাদ্যের ভেজাল যেমন খাদ্যগুণ নষ্ট করে এবং ভোক্তার স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে স্বাস্থ্যখাতে খরচ বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

খাদ্যে ভেজাল ও এর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সর্বমহলের জানা থাকলেও এর প্রতিকারে তেমনভাবে কেউই এগিয়ে আসছে না। এ বিষয়ে কঠোর আইন থাকলেও এর বাস্তবায়ন নেই। প্রশ্ন হতে পারে, কেন এর যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না? এর কারণ হতে পারে, দ্রুত হারে পরিকল্পনাহীন শিল্পায়ন এবং অধিক মুনাফা লাভের বল্গাহীন প্রলোভন।

এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের খাদ্যে ভেজাল দেয়ার বিপরীতে তাদের প্রশ্ন ও উত্তর যা-ই হোক না কেন, খাদ্যে ভেজাল দেয়া একটি সামাজিক অপরাধ যা সকলের জানা থাকা প্রয়োজন এবং ভেজালকারী অপরাধীর শাস্তির জন্য সোচ্চার থাকা প্রয়োজন।

অবশ্যই সবাই জানেন, সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার– এই কথা মনে রেখেই সবাইকে খাদ্যে ভেজাল রোধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। জাতীয়ভাবে নৈতিক একটি

অবস্থান আমাদের সকলের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে অন্যদিকে আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের এই অপরাধকে মোকাবেলা করতে হবে আর এই দেশ ও সমাজ এভাবেই একদিন ভেজালমুক্ত খাদ্যের দেশে পরিণত হবে ।

[লেখক: ডা. এ কে অজাদ খান: অধ্যাপক, লিভার ও পরিপাকতন্ত্র এবং সভাপতি, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি । লেখাটি তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন ডা. বিশ্বজিত ভৌমিক, ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ।]

আমাদের খাদ্য: নকল-ভেজাল ও সন্ত্রাস কবলিত

আ ব ম ফা রু ক

আজকের বাংলাদেশে অন্যতম আলোচিত বিষয় দ্রব্যমূল্য । মিডিয়া বলছে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর মুনাফার উদগ্র লোভকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে দ্রব্যমূল্য এভাবে বাড়ত না । কিন্তু এই এক শ্রেণীটা আসলে কারা এবং নিয়ন্ত্রণটা কিভাবে হবে তা কোথাও স্পষ্ট বলা হচ্ছে না । এদিকে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষ দিশেহারা । মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যের অযৌক্তিক ও অকল্পনীয় মূল্যবৃদ্ধিতে । এছাড়া বেশি দাম দিয়ে তারা যে খাদ্যদ্রব্যটি কিনছে তা-ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নকল-ভেজালমুক্ত নয় । আমাদের অসাধু ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'লুম্পেন' বা 'যেনতেন প্রকারে অতি দ্রুত বড়লোক হতে হবে' চরিত্রের ব্যবসায়ী । তারা আমাদেরকে যে অর্থনীতি উপহার দিয়েছে তা মূলত একটি লুম্পেন চরিত্রের 'লুণ্ঠনবাদী অর্থনীতি', যেখানে যে যেমন করে পারে লুটে নিচ্ছে । এই লুম্পেনরা দুর্নীতিকে নিন্দার বা ঘৃণার বিষয় বলে গণ্য করেনি, বরং তারা 'দুর্নীতির সংস্কৃতিকে' দেশব্যাপী প্রতিটি সেক্টরে ছড়িয়ে দিয়েছে । বিগত সময়ের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বলে যে যুগে যুগে এক শ্রেণীর আমলা ও রাজনীতিবিদ দুর্নীতির এই সংস্কৃতিকে বিস্তৃত করে 'হিরোইজমের' পর্যায়ে নিয়ে গেছেন । অসাধু ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে আমাদের সরকারগুলোর ব্যর্থতার

কারণটি এই লুণ্ঠনবাদী অর্থনীতি ও দুর্নীতির সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত। এই অসাধু ব্যবসায়ীরা একবারও ভাবেনি যে কিছু মুনাফা লাভের বিনিময়ে তারা জাতিকে কী ভয়াবহ দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

নাকি এটাই ছিল লক্ষ্য? সরকার যেহেতু দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর কিছু করতে চায় তাই 'দুর্নীতির সংস্কৃতিকে' টিকিয়ে রাখতে যারা ইচ্ছুক তারা চাইবে সরকার এই কাজে ব্যর্থ হোক। তারা কি দুর্নীতির বিপক্ষের লোকদের একটা শিক্ষা দিতে চায়? তারা সম্ভবত আশা করে আছে যে দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত চাপে মানুষ ত্যক্তবিরক্ত হয়ে একসময় বলবে দুর্নীতিবিরোধী সরকার চাই না, দুর্নীতিবাজ সরকারই ভালো, অন্তত জিনিসপত্রের দাম তো কম থাকে। কিন্তু মানুষ তা বলবে কি? অসহনীয় মূল্য দিয়ে জিনিসপত্র কেনার পরও মানুষ চায় দুর্নীতিবাজদের সত্যি সত্যিই এমন বিচার হোক যেন ভবিষ্যতে আর কেউ দুর্নীতি না করে। মানুষ চায় লোক-দেখানো তদন্ত কমিটি নয়, দুর্নীতি তদন্তের জন্য গঠিত কমিটিগুলোর প্রণীত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশিত হোক, রিপোর্টে যদি কেউ চিহ্নিত হয়ে থাকে তাহলে তাকে আইনের আওতায় নেয়া হোক, দোষী প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী সাজা দেয়া হোক। কিন্তু মানুষ আজ প্রত্যাশার এ-সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তার বদলে শুধু অযথা সময়ক্ষেপণ দেখছে। খাদ্য সেক্টর ও স্বাস্থ্য সেক্টরের সব তেমনি আগের মতোই আছে, কোথাও দুর্নীতির বিচার হচ্ছে না। সব তেমনি থাকবে অথচ দুর্নীতিবাজরা আর দুর্নীতি করবে না এরকম ইউটোপিয়ান ভাবনার লক্ষণ দেখে দেখে মানুষ আজ ক্লান্ত। তবুও মানুষ অপেক্ষায় আছে। বিগত জোট সরকারের সময় কালো অনুগ্রহপ্রাপ্ত অসাধু ব্যবসায়ীরা চাইতেই পারে পুরনো অবস্থায় ফিরে যেতে, বিশেষ করে সরকার যেখানে এদের বা অন্য দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে এখনো দ্বিধাগ্রস্ত বলে প্রতীয়মান।

আমাদের দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পেছনে আন্তর্জাতিক বাজারে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যই একটি প্রধান কারণ। কিন্তু মিডিয়া এটাও বলছে যে আন্তর্জাতিক বাজারের চাইতেও এখানে কোনো কোনো জিনিসের দাম বেশি নেয়া হচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি এখানে স্পষ্ট। তাছাড়া বিশ্ববাজারে যেখানে ডলারের প্রায়ই দরপতন ঘটছে সেখানে আমরা অন্য কোনো মুদ্রার বদলে ডলারকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে রাখাতে আমাদের আমদানি করা জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। প্রায় সব খাদ্যপণ্যই অনেকগুলো হাত বদল হয়ে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে বলে দাম আরো বেড়ে যাচ্ছে। সরবরাহ ব্যবস্থা আধুনিক নয় বলে দাম বাড়ছে। সরকারের মনিটরিং নেই বলে দাম বাড়ছে। কোথাও কোথাও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল পরামর্শ বা সিদ্ধান্তের কারণে দাম বাড়ছে। পথেঘাটে বিগত সরকারের আমলের মতো চাঁদাবাজি এখন না থাকলেও অন্যান্যভাবে যতটুকু আছে তার কারণ বড় করে দেখিয়ে পণ্যের দাম বাড়ছে। উপরন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা এখন নিজেরাই সন্ত্রাসে নিয়োজিত হয়ে গেছে।

কিছুদিন আগে বিদেশি চিনির মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত হাইড্রোজ পাওয়া গিয়েছিল। চিনির রং সাদা করার জন্য উৎপাদক পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিমাণে হাইড্রোজ ব্যবহারের ফলে ক্রেতার স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছিল। জনগণকে সচেতন করতে কথাটা আমরা মিডিয়াতে বলেছিলাম। আরো বলেছিলাম যে দেশি চিনিতে হাইড্রোজ নেই। তখন আবার দেশি চিনির দাম বেড়ে গিয়েছিল। তখনকার ২৮ টাকার দেশি চিনি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে ৪২ টাকা কেজি হয়েছিল। আর এখন তো এই চিনি তারা বিক্রি করছে কমপক্ষে ৫০ টাকায়। অথচ এই চিনি বিদেশ থেকে আনতে হয় না, কম সাদা ও বড় দানা বলে দেশেও দীর্ঘদিন অবিক্রিত পড়ে থাকে এবং দেশে এর কোনো ঘাটতি নেই। তবুও দাম বেড়েছে। কারণ খাদ্য-সন্ত্রাস।

কয়েকদিন আগে মেয়ের জন্য টমেটো সস কিনতে গিয়ে সারা পলাশি বাজার খুঁজেও ফার্মাসিস্ট-মালিকানার একটি কোম্পানির টমেটো সস পেলাম না। এদেরটা কিনতে চাওয়ার কারণ তাদের টমেটো সসে শুধু টেক্সটাইল কালার কেন কোনো কৃত্রিম রং-ই নেই। তাছাড়া দেশি জিনিস, টাকাটা দেশেই থাকবে। কিন্তু পাওয়া গেল না। নীলক্ষেতেও খুঁজলাম। নেই। শেষে নিউমার্কেটের এক দোকানে পাওয়া গেল। দোকানদার বলল কমিশন কম বলে অনেকেই এটা বিক্রি করে না। অথচ মিষ্টি কুমড়া আর টেক্সটাইল কালার দিয়ে বানানো 'আসল টমেটোর সস' বিক্রি করতে তাদের ভারি আগ্রহ। কারণ বেশি লাভ। এটাও খাদ্য-সন্ত্রাস।

যৌক্তিক কারণ ছাড়া শুধুমাত্র মুনাফার লোভে এবং পরিকল্পনামাফিক বাজারে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য খাদ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধির যে প্রবণতা বাংলাদেশে আজ বহমান তা খাদ্য-সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যত দ্রুত সফল হবেন ততই ক্রেতা-ভোক্তাদের লাভ। একজন সন্ত্রাসী খুন করে একজন বা কয়েকজনকে। কিন্তু এই খাদ্য-সন্ত্রাসীরা অন্যায়ভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে মুনাফা করে আর খাবারে ভেজাল মিশিয়ে বা খাবারকে নকল করে লক্ষ-কোটি ক্রেতা-ভোক্তার আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতি করে চলেছে ক্রমাগতভাবে বছরের পর বছর।

সন্ত্রাসীদের কোনো বিবেক, নৈতিকতা বা সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে না। বাংলাদেশের এই সব খাদ্য-সন্ত্রাসীদেরও যে এসব বালাই নেই তা তারা বারবার প্রমাণ করছে। সন্ত্রাসীরা হয়ে থাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কোনো নির্দিষ্ট মত বা লাভকে লক্ষ্য রেখে তারা সন্ত্রাস করে। আমাদের অসাধু খাদ্য-ব্যবসায়ীরা নিষ্ঠুর তো বটেই, নইলে শিশুদের খাবারেও তারা ভেজাল মেশায়? এ-সব বিষাক্ত খাবার খেয়ে যেখানে দেশের মানুষের লিভার-কিডনিসহ অন্যান্য অঙ্গ ক্রমবর্ধমান হারে ধ্বংস হচ্ছে, দেশে উদ্বেগজনক হারে বেড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রকম ক্যান্সার ও হৃদরোগ, সেখানে খাদ্য-সন্ত্রাসীরা তাদের বিবেক আর নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছে উদগ্র মুনাফার লোভের কাছে। বিবেক জাগ্রত করার এত আবেদন-নিবেদনেও কোনো কাজ হল না, মোবাইল কোর্টের এত নকল-ভেজাল বিরোধী অভিযানের পরেও না। একই খাদ্য-ব্যবসায়ীকে মোবাইল কোর্ট বারবার জরিমানা করলেও সেই ব্যক্তি লজ্জা পাচ্ছে না, নিজেকে শুধরে

নিচ্ছে না, কারণ তার কোনো মানবিক মূল্যবোধই নেই– সে এখন পুরোপুরি সন্ত্রাসীতে রূপান্তরিত। অন্যায় ও মানবতাবিরোধী হেন কাজ নেই যা সে মুনাফার পাহাড় গড়ার জন্য করছে না। এজন্য সে বিভিন্ন সরকারি অফিসকে নিয়মিতভাবে খুশি করে, প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলকে মোটা চাঁদা দেয়, কোনো কোনো ক্ষমতাবান আমলার সাথে যোগসাজশে সরকারের প্রণীত ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার আইন নানা বাহানায় যুগের পর যুগ ঠেকিয়ে রাখে, এমনকি নকল- ভেজাল পণ্য বিক্রির জন্য অসত্য বিজ্ঞাপনও প্রচার করে।

তবে আশার কথা এই যে, সব আমলা ও রাজনীতিবিদ অসৎ নন এবং সব ব্যবসায়ীও লুণ্ঠনকারী নন। এদের কেউ কেউ তাদের শিক্ষা ও চেতনার কারণে আন্তরিকভাবেই চান যে এদেশের খাদ্যে নকল-ভেজাল বন্ধ হোক। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৎ ব্যবসায়ীদের আমরা স্বাগত জানাই। ক্রেতা-ভোক্তারা আজ দেয়ালে ঠেকে যাওয়া পিঠ সোজা করে সামনে এসে বলতে শুরু করেছে যে এভাবে আর চলতে পারে না এবং তারা সৎ ব্যবসায়ী, সৎ আমলা ও সৎ রাজনীতিবিদদেরকে এর নিরসনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।

ক্রেতারা চায় নকল-ভেজাল রোধে সরকার অপরাধীকে যেমন দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দেবেন, তেমনি আমলাদের যে কিয়দংশ অসাধু ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজশ বজায় রাখেন তাদেরও চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে। নিয়মিত মোবাইল কোর্টের অভিযানের মাধ্যমে যেমন নকল-ভেজালকারী অসাধু ব্যবসায়ীদের জরিমানা করা হবে, তেমনি সৎ ও অভিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটরা যেন মোবাইল কোর্টে নিয়োগ পান সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে যেমন সরকারি মনিটরিং নিবিড় করতে হবে, তেমনি নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোকে সমন্বিত করতে হবে, সেখান থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে কেউ যেন নিরাপত্তা সনদ না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের ক্রেতা-ভোক্তারা ব্যবসায়ী সমাজের বিরূদ্ধে নয়। ব্যবসায়ীরা আমাদের সমাজের ও অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। কিন্তু ক্রেতা-ভোক্তাদের বিবেচনায় সব ব্যবসায়ীই এক নয়। ব্যবসায়ীদেরকে আজ সৎ ও অসৎ এ দু'ভাগে ভাগ করার সময় এসেছে। ক্রেতা-ভোক্তারা প্রত্যাশা করে আজকের খাদ্য-সন্ত্রাস রোধ করতে সৎ ব্যবসায়ীরাও খাদ্য-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। অসৎ ট্রেড ইউনিয়নসুলভ মানসিকতায় অসাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষে সৎ ও অসৎ সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজের এক হয়ে কথা বলা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই সৎ ব্যবসায়ীদেরকে ক্রেতা-ভোক্তা কর্তৃক পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন দিতে হবে। সৎ ব্যবসায়ী ও সৎ দোকানদারদের পণ্য কিনতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের পণ্য ও অসৎ দোকানদারদের বর্জন করতে হবে। সৎ ব্যবসায়ীর পণ্য ও সৎ দোকানদারদের নাম মুখে মুখে প্রচার করতে হবে। যুগোপযোগী আইন ও এগুলোর সঠিক প্রয়োগের জন্য ভোক্তাদেরকে সর্বত্র কার্যকর সামাজিক আন্দোলন তৈরি করতে হবে। এই সামাজিক

সচেতনতা ও আন্দোলনকে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে ভোক্তাদের সামাজিক প্রতিরোধে রূপান্তরিত করতে হবে। খাদ্য-সন্ত্রাসীর বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভোক্তাদেরকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হবে।

জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এদেশে অনেক বড় বড় সমস্যার ও নির্যাতনের অবসান ঘটিয়েছে। এবারও আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের শরীর-স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য খাদ্য-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ অবশ্যই সফল হবে। আমাদের ক্রেতা-ভোক্তাদের নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং খাদ্য-সন্ত্রাসীদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে আমাদের ও আমাদের আগামী প্রজন্মের স্বার্থে।

তবে মনে রাখতে হবে খাদ্যের সমস্যা শুধু নকল করা বা ভেজাল মেশানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের খাদ্য-উৎপাদন-প্রক্রিয়াতেও সমস্যা রয়েছে। ধান-গম-ফলমূল-সবজি ইত্যাদি চাষে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার আজ আমাদের কৃষিসংস্কৃতিরই একটি অবশ্যম্ভাবী অংশে পরিণত হয়েছে। অথচ আজ থেকে ৫০ বছর আগের বাংলাদেশে এগুলোর ব্যবহার প্রায় ছিল না। কৃষক তখন জমিতে জৈব সার ব্যবহার করত (যেমন গোবর, কচুরিপানা, সবুজ সার ইত্যাদি)। পোকামাকড় মারার জন্য ব্যবহার করত তুলনামূলকভাবে নিরাপদ পদ্ধতি (যেমন সিম গাছের পোকা মারার জন্য ছাই ছিটানো ইত্যাদি)। আমাদের দেশে রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় ষাটের দশকে। তখন 'সবুজ বিপ্লব' নামে একটি দর্শন বাংলাদেশের কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হয়। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়ানো এর আপাত-চমৎকার লক্ষ্য হলেও আমরা এর কিছু সমালোচনাও করতে চাই। পঞ্চাশের দশকে উন্নত দেশগুলোতে রাসায়নিক সারের কারখানা তৈরি হওয়ার পর সেগুলো বিক্রির বাজার সৃষ্টির জন্যই বাংলাদেশের মতো আরো কিছু কৃষিনির্ভর ও জনবহুল দেশে বিদেশিদের অর্থসাহায্যে সবুজ বিপ্লবের শ্লোগান দেয়া হয়। এই কাজে ব্যবহৃত হয় সরকারি প্রশাসনিক মাধ্যমসহ রেডিও ও টেলিভিশনের নানা কৃষিমুখী অনুষ্ঠান। কৃষকরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করে অধিক ফসল পেতে শুরু করলে এর প্রসার ঘটতে থাকে। তখন কোনো কোনো বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক গোবর সবুজ কম্পোস্ট ইত্যাদি সারের বদলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিরোধিতা করলেও সরকারি প্রচারযন্ত্রের তোড়ে তা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠ। ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়তেই থাকে। রাসায়নিক সারের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে এর দাম। কিন্তু এর দীর্ঘদিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আমাদের জমিগুলো হারাতে থাকে উর্বরতা।

প্রায় একই কথা প্রযোজ্য রাসায়নিক কীটনাশকের বেলাতেও। সত্তরের দশকে উন্নত ও সচেতন দেশগুলোতে বিজ্ঞানীরা ক্ষতিকর বলে কিছু কীটনাশক নিষিদ্ধ করার পর সেগুলো 'সবুজ বিপ্লবের' ও 'বোকার ফসল পোকায় খায়' ধরনের আকর্ষণীয় শ্লোগানের ছত্রছায়ায় আমাদের মতো গরিব দেশগুলোতে বেশি বেশি করে ব্যবহারের পক্ষে প্রচারণা শুরু হয়। এগুলো বাজারজাতকরণের বিদেশি কোম্পানিগুলো আমাদের

দেশের কৃষকদের একবারও বলেনি যে তাদের কীটনাশক পণ্যগুলোর অনেকগুলোই ইতোমধ্যে উন্নত দেশে নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানীরা ১২টি রাসায়নিককে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ করেছেন এবং এর মধ্যে ৯টিই হল কীটনাশক। এই ১২টি রাসায়নিক এতই ক্ষতিকর যে বিজ্ঞানীরা এগুলোকে 'ডার্টি ডজনস্' নামে অভিহিত করতেন। কারণ এগুলো অত্যন্ত বিষাক্ত এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এগুলো প্রকৃতিতে গিয়েও নষ্ট হয় না অর্থাৎ এগুলো সহজে 'বায়োডিগ্রেডেবল্' নয় বলে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। এগুলো মানুষ ও প্রাণীদেহের চর্বিতে গিয়ে জমা হয় বলে শরীর থেকে সহজে বের না হয়ে দীর্ঘকাল ধরে শরীরের ক্ষতি করতেই থাকে এবং বায়োডিগ্রেডেবল নয় বলে ব্যবহারের জায়গা থেকে অনেক দূরেও এগুলোকে পাওয়া যায়। ডার্টি ডজনের এই ৯টি কীটনাশক হল এলড্রিন, ক্লোরডেন, ডিডিটি, ডাইএলড্রিন, এড্রিন, হেপ্টাক্লোর, হেক্সাক্লোরোবেনজিন, মিরেক্স ও টক্সাফেন। সত্তরের দশকে কোনো কোনো বিদেশি কোম্পানি এগুলো আমাদের দেশে তুমুলভাবে বাজারজাত করে, কৃষকরাও তখন থেকে তাদের ফসলে এগুলো ব্যবহার করে।

এগুলোর স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত ক্ষতি এবং পরিবেশে এগুলো দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকার কারণে বিজ্ঞানীরা ডার্টি ডজনের আরেকটি বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন 'পারসিস্টেন্ট অরগ্যানিক পল্যুটেন্টস্' বা পিওপি। এসব পিওপির স্বাস্থ্যগত ক্ষতিগুলো হল ক্যান্সার, স্নায়ু ধ্বংস, শিশুর জন্মগত ত্রুটি, বন্ধ্যাত্ব, যকৃত নষ্ট হওয়া এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া। বেশি পরিমাণে পিওপি মৃত্যুও ঘটাতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়াও আরো যেসব প্রাণী এগুলোর দ্বারা মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয় সেগুলো হল মাছ, হাঁস-মুরগি ও পাখি। উন্নত বিশ্বে এগুলো নিষিদ্ধ থাকলেও পরবর্তী কয়েক দশক ধরে কোনো কোনো দেশ এগুলো নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ব্যবহার করে, আবার কেউ কেউ কৃষি-উৎপাদনের স্বার্থে এগুলো আগের মতোই ব্যবহার করতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) এগুলোর ব্যবহার বন্ধ করার জন্য বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে অন্যান্য কীটনাশক বাজারে আসতে থাকে।

বাংলাদেশে কাগজেপত্রে পিওপি ব্যবহার বন্ধ করলেও বাস্তবে এখনো এগুলোর কোনো কোনোটি ব্যবহৃত হচ্ছে। চোরাচালান হয়ে আসা কীটনাশকগুলোর অধিকাংশই পিওপি। এর বাইরে যেসব কীটনাশক বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোও পুরোপুরি নিরাপদ বলে বিজ্ঞান আমাদের নিশ্চিন্ত করছে না। ফলে এখনকার কীটনাশকেও স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এসব কীটনাশকের কিছু অংশ ফলমূল শাকসবজির মাধ্যমে আমাদের খাবারেও প্রবেশ করছে। এগুলো খেয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষকও। কারণ জমিতে ব্যবহারকালে এগুলো তাদের নাক-মুখ ও ত্বক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। কৃষক কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা মারার জন্য বাধ্য হয়ে। যতদিন তাদের কাছে নিরাপদ

বিকল্প পৌঁছানো না যাবে ততদিন তারা ফসল বাঁচানোর জন্য এগুলো ব্যবহার করতেই থাকবে। বিকল্প বিষয়ে তথ্য দেয়া তার জন্য তাই অত্যন্ত জরুরি। রাসায়নিক সার বিষয়েও একই কথা। নিরাপদ ও উপকারী সার সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে বাধ্য, ক্ষতি বা দাম যতই বেশি হোক না কেন। গ্রোথ প্রমোটার এবং আর্টিফিসিয়াল রাইপেনার কৃষককে আপাত সাহায্য করে, খাদ্যপণ্যের স্বাদ ও ভোক্তার স্বাস্থ্য নষ্ট করে হলেও। কৃষককে এগুলোর বিকল্প বার্তা পৌঁছানোর জন্য আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি না কেন? যতদিন কৃষককে এসব রাসায়নিকের নিরাপদ বিকল্প না দেয়া যাবে ততদিন ভোক্তার স্বাস্থ্যহানি ঘটতেই থাকবে। আমাদের স্বার্থেই তাই আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু এগিয়ে আসবে না সার-কীটনাশক বা অন্যান্য কৃষি রাসায়নিক বাজারজাতকারী বিদেশি কোম্পানিগুলো। বিনামূল্যে চা খাওয়ানোর মতো করে এসব কোম্পানি আমাদের কৃষকদের এক সময় অল্প মূল্যে, কখনো কখনো বিনামূল্যে, সার কীটনাশক দিয়েছে। অভ্যস্ত করানোর পর দাম বাড়াতে শুরু করেছে। তখন যে কীটনাশকের বার্ষিক বিক্রি ছিল মাত্র কয়েক কোটি টাকা, আজ বাংলাদেশে সেই কীটনাশকগুলো বিক্রি হয় বছরে প্রায় সাড়ে ১২ শত কোটি টাকার। কী বিপুল ব্যবসা! বিদেশি কোম্পানিগুলো এই বিশাল ব্যবসা ছেড়ে আপনার আমার স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বাঁচাতে কৃষকদের নিরাপদ বিকল্প শেখাবে তা আপনার বিশ্বাস হয়?

এখানেও উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকেই। কিছু বিকল্পের সন্ধান আছে আমাদের দেশের এতকালের ঐতিহ্যবাহী কৃষির ট্রাডিশনাল নলেজ বা লোকায়ত জ্ঞানে। পচা কচুরিপানায় থাকে প্রাকৃতিক গ্রোথ প্রমোটার, এটা কৃষক জানে না। কিন্তু সে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানত লাউগাছের গোড়ায় এটা দিলে লাউ অনেক বড় হয়, কোনো রাসায়নিক লাগে না। পাটক্ষেতে ডাঁটা বুনলে ডাঁটা বড় ও মোটা হয় তাড়াতাড়ি। এই পুরনো জ্ঞানগুলো সরকারকে সামনে আনতে হবে। এতে কৃষকের পয়সা বাঁচবে, আমরা ভোক্তারাও স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারব। আর কিছু বিকল্প বিজ্ঞানীরা বের করেছেন সম্প্রতি। পোকা মারার জন্য কীটনাশক না দিয়ে জমিতে ছেড়ে দিতে হবে তার চেয়ে বড় পোকা। বড় পোকাগুলো ফসল খাবে না কিন্তু বাঁচার তাগিদে ছোট পোকাগুলো খুঁজে খুঁজে খাবে। দার্জিলিংয়ের অনেক চা বাগানে এর ব্যবহার ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে নিজে দেখেছি। আমরা কেন পারি না? বিদেশি কোম্পানিগুলো নাখোশ হবার ভয়ে? বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু জীবাণু বাছাই করেছেন যেগুলো ফসলের ক্ষেতে পোকার গায়ে সংক্রমণ ঘটিয়ে পোকা মারবে, কিন্তু ফসলের বা মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা ভোক্তারা সরকারের কাছে দাবি করি এগুলো নিয়ে প্রায়োগিক গবেষণা অবিলম্বে শুরু করতে হবে। ক্লাসিক্যাল একাডেমিক রিসার্চ অনেক হয়েছে। এগুলো এতকাল বাংলাদেশকে কিছু দিতে পারেনি, বড় জোর কিছু বিদেশি কোম্পানির অর্থ সাহায্যের কয়েকটি বৃত্তি দিয়েছে। এ-সব বৃত্তি নিয়ে আমাদের দেশের কিছু বিজ্ঞানী পিএইচডি করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্তই। এর বেশি কোনো অবদান আমরা

এগুলো থেকে পাইনি। তাই এখন প্রায়োগিক গবেষণা ধরণের নতুন গবেষণার সময় এসেছে জাতীয় প্রয়োজনেই।

জমিতে রাসায়নিকের বদলে জৈব সার নিজে তৈরি করে ব্যবহারের হরেক রকম পদ্ধতি বিদেশে এবং আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। এগুলো কেন কৃষকের পর্যায়ে নিবিড়ভাবে পৌঁছানো হচ্ছে না? বিদেশি মুরব্বিদের পকেট ভারি হবে বলে আমরা ভোক্তারা আর কতকাল স্বাস্থ্যহানি ঘটাব? আমাদের দেশের কিছু কৃষিবিজ্ঞানী কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পোকা মারার জন্য রাসায়নিক কীটনাশকের বদলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত সমন্বিত পোকা দমন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। আমরা বাংলাদেশের ভোক্তারা দেখতে প্রত্যাশা করি সরকার অতি দ্রুত এই প্রযুক্তিগুলো কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।

এই কাজগুলো করলে আমরা ভোক্তারা বিষাক্ত ফল-সবজি খেয়ে প্রতিনিয়ত অসুস্থ হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাই। বেঁচে যায় আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ। অসুস্থতার চিকিৎসা করাতে আমাদের যে বিপুল টাকা খরচ হয়, পাবলিক বা প্রাইভেট উভয় খাতেই, তা বেঁচে যাবে। এই টাকা আমরা অন্যত্র জীবনমান বৃদ্ধিতে খরচ করতে পারব।

কিন্তু শুধু ভোক্তারাই উপকৃত হব তা নয়, সরকারও উপকৃত হবেন। কারণ বর্তমানে আমাদের দেশের সবজি বিদেশে রপ্তানি হয় বছরে প্রায় চারশো কোটি টাকার। এই পরিমাণটি মোট সম্ভাবনার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। বিদেশি কোম্পানিগুলো যতই তাদের কীটনাশক আমাদের দেশে বিক্রি করুক না কেন, সেই বিদেশিরাই আবার আমাদের সবজি তাদের দেশে নিতে নারাজ। কারণ স্বাস্থ্য-ঝুঁকি। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ২০০৮ সালের পর রাসায়নিক সার-কীটনাশক ব্যবহার করে উৎপাদিত কোনো ফল-সবজি বাংলাদেশ বা বিশ্বের কোনো দেশ থেকেই আমদানি করার বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। তারা স্বাস্থ্যঝুঁকিমুক্ত জৈব প্রযুক্তি-ব্যবহৃত কৃষিপণ্যই শুধু তাদের দেশে আমদানিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই সুযোগে আমাদের দেশের কৃষকরা রাসায়নিক সার-কীটনাশক-গ্রোথ প্রমোটার-রাইপেনার-রং ব্যবহারের বদলে জৈব কৃষিপদ্ধতি ব্যবহার করলে আমাদের দেশ বছরে কমপক্ষে তিন হাজার কোটি টাকার ফল-সবজি রপ্তানি করতে পারবে। উপরন্তু শুধু ফুলই রপ্তানি করতে পারব বছরে কমপক্ষে দুই হাজার কোটি টাকার। আমাদের জমি উর্বর, আমাদের কৃষকরা কর্মঠ। তাহলে আমরা কেন এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করব? অতীতে কোনো সরকার ভাবেনি বলে এখনো ভাবা যাবে না তার তো কোনো মানে নেই।

আরো একটি কথা। বিদেশে খাদ্যের মান রক্ষা ও নকল-ভেজাল নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান থাকে। আমাদের দেশে শুধু ওষুধের মান রক্ষার জন্য একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠান আছে। ওষুধ প্রশাসন এর নাম। কিন্তু এর হাল-হকিকত পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমরা যা শুনতে পাই তাতে ভোক্তারা নিরাশ। ওষুধ, খাদ্য, প্রসাধন, কৃষি ও গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক ইত্যাদি অর্থাৎ ভোক্তারা যেসব

রাসায়নিকের সংস্পর্শে প্রতিদিন আসেন সেগুলো কেন্দ্রীয় ও সমন্বিতভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য আমেরিকার এফডিএ-এর মতো একটি সংস্থা গঠন করা গেলে এবং এটি দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হলে দেশের ভোক্তারা যেমন দেশীয় পণ্যের মান বিষয়ে আশ্বস্ত হতেন তেমনি বিদেশেও আমাদের খাদ্যপণ্যের রপ্তানি বাড়ত। কারণ বিদেশিরা তাদের দেশে কোনো খাদ্যপণ্য আমদানির আগে নির্ভরযোগ্য কোনো বিশেষজ্ঞ সংস্থা থেকে পণ্যটির মান নিশ্চিতকরণ সার্টিফিকেট চায়। আমাদের ট্রাফিক সিগন্যালগুলোতে ২০টি লেবুর একেকটি ব্যাগ বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকায়। জাপানে এগুলোর দাম প্রায় সাড়ে ৩ হাজার টাকা। কিন্তু জাপানে আমরা এগুলো পাঠাতে পারব না, কারণ তাহলে প্রতিটি লেবুর গায়ে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের মতো কোনো নিরপেক্ষ সংস্থার নিরাপত্তা সিল থাকতে হবে। অন্যান্য কৃষিপণ্যের রপ্তানির ব্যাপারেও একই কথা। রাসায়নিক ব্যবহার করে কৃষিজ খাদ্যপণ্য উৎপাদনের পর তা রপ্তানির চিন্তা করা আজকের দিনে বাতুলতা। বিদেশি কোম্পানিগুলো না চাইলেও দেশে দেশে ক্রেতা অধিকার আন্দোলন আজ অনেক শক্তিশালী। বিদেশের কোনো সরকার চাইলেও তাই স্বাস্থ্য-ঝুঁকিপূর্ণ কোনো খাদ্য তাদের দেশে আমদানি করতে পারবে না। বিদেশিদের কাছে আমাদের খাদ্যপণ্যের নিরাপত্তা-আস্থার জায়গাটিতে তাই কোনো ফাঁক রাখা ঠিক হবে না। সরকার কর্তৃক এরকম একটি সংস্থা গঠন কি একই সাথে বাংলাদেশের ক্রেতা-ভোক্তা ও একটি পজিটিভ বাংলাদেশের জন্য সহায়ক নয়?

কিন্তু এফডিএ ধরনের একটি সংস্থা গঠনের জন্য অতীতের সরকারগুলোর কাছে বারবার দাবি করেও কোনো ফল হয়নি। কারণ আমাদের দেশে খাদ্যের মান ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা নিয়ে অতীতের সরকারগুলোর পক্ষ থেকে তেমন মাথাব্যথা লক্ষ করা যায়নি। মাঝে মধ্যে খাদ্য ও ওষুধে ভেজাল মেশানোর অপরাধে কিছু শাস্তি দেয়া হয়েছে বটে, তবে তা ছিল বাস্তব অবস্থার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। বিগত জোট সরকারের আমলে খাদ্যে ভেজালের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে ক্রেতা অধিকার সংগঠনগুলো ও গণমাধ্যমের তীব্র সমালোচনার মুখে সরকার কিছু মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শুরু করে। মোবাইল কোর্টগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটরা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে ভেজালের জন্য দায়ী কারখানা ও মালিকদেরকে শাস্তি প্রদান শুরু করে, যা জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করে। এ সমর্থন ছিল দলমত নির্বিশেষে। বলা যায় বিগত জোট সরকারের আমলে একমাত্র মোবাইল কোর্টের বিষয়ে আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ সব দল ও মতের মানুষের একটি জাতীয় ঐকমত্য গড়ে ওঠেছিল, যা এখনো অব্যাহত আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু বিগত জোট সরকার প্রায়ই মোবাইল কোর্টের তৎপরতা কমিয়ে দিতেন। মাঝে তো একবার বন্ধই করে দিয়েছিলেন। তখন মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে দলীয় অসৎ ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত চাপেই সরকার মোবাইল কোর্ট বন্ধ করেছিলেন। এমনও শোনা যায় যে মাছের ফর্মালিন এবং ভেজাল সয়াবিন তেল এক পর্যায়ে খোদ প্রধানমন্ত্রীর ঘরে হানা

দেয়ার পর সরকার বিরক্ত হয়ে মোবাইল কোর্ট পুনরায় শুরু করেছিলেন, তবে অত্যন্ত সীমিত আকারে।

বাংলাদেশের জনগণের মতো আমরাও চাই মোবাইল কোর্ট এখনো অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা করুক। সরকারকে এবং মোবাইল কোর্টসমূহের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদেরকে আমরা এ-জন্য অভিনন্দন জানাই। এসব মোবাইল কোর্টের সাথে পৌর কর্পোরেশন, বিএসটিআই, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ আরো বিভিন্ন সরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। এছাড়া পুলিশ বিডিআর সেনাবাহিনী তো থাকেই। আমরা বুঝতে পারি এসব অভিযান অত্যন্ত জটিল ও কষ্টকর হওয়ার কথা। তাদের সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ ছাড়া এসব অভিযান সফল হত না এবং হচ্ছে না। তাদের সবাইকেও আমাদের অভিনন্দন। কিন্তু যতই কষ্টকর হোক, দেশ ও জাতির স্বার্থেই এ অভিযানগুলো আরো ব্যাপকভাবে পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরি। নইলে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তো বটেই, আমাদের আগামী প্রজন্মগুলোও স্বাস্থ্য ও আয়ুগতভাবে সীমাহীন দুর্দশায় পতিত হবে।

মোবাইল কোর্ট খাবারে ক্ষতিকর রং বা অন্যান্য রাসায়নিক আছে কিনা, খাদ্রসামগ্রী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে উৎপাদিত ও বিক্রি হয় কিনা, ফল রাসায়নিক দিয়ে পাকানো কিনা, ফলে ও মাছে ফর্মালিন দেয়া আছে কিনা ইত্যাদি সবই পরীক্ষা করে দেখছেন। এসব কাজের ফলে অন্তত ঢাকা মহানগরীতে খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর রং ব্যবহারের মাত্রা কিছুটা কমেছে বলে মনে হচ্ছে। ফল এখনো রাসায়নিক দিয়ে পাকানো হচ্ছে। আপেল আঙুর নাশপাতি প্রায় সবই এখনো ফর্মালিনে চুবিয়ে বিক্রি করা হয় বলে এক সপ্তাহেও পচে না। বলা যায় ফলের বাজারে মোবাইল কোর্টের ইতিবাচক প্রভাব এখনো তেমন পড়েনি। খাদ্য তৈরির কারখানা ও হোটেল রেস্টুরেন্টগুলোর অবস্থা কিছুটা উন্নত হয়েছে। মাছের বাজারে ফর্মালিনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযান চালানোর পর কিছুটা অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। অর্থাৎ সার্বিকভাবে মোবাইল কোর্টের সাফল্য নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি। তাছাড়া মনস্তাত্ত্বিক সাফল্য তো রয়েছেই। অর্থাৎ মোবাইল কোর্ট চলতে থাকলে অসৎ ব্যবসায়ীরা কিছুটা হলেও মানসিকভাবে চাপ অনুভব করে, ভেজাল মেশাতে বা নকল করতে ভয় পায়। আশা করা যায় এভাবে মোবাইল কোর্টগুলোর অভিযানগুলো চলতে থাকলে কিছুদিন পর আমাদের খাদ্যের স্বাস্থ্যগত অনিরাপত্তার বিষয়টি বেশ সহনীয় মাত্রায় চলে আসবে।

মোবাইল কোর্টগুলোর অভিযানগুলোকে নিয়মিতভাবে পরিচালনা করার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি। বিগত জোট সরকারের আমলের অনিয়মিত অভিযানগুলোকে লোকদেখানো বলে অনেকেই অভিহিত করেছিলেন। কারণ একবার কোনো অসৎ ব্যবসায়ীকে জেল-জরিমানা করে আসার কিছুদিন পর পুনরায় একই লোককে একই অপরাধে লিপ্ত হয়ে সাজা পেতে আমরা দেখেছি। সরকারের আইনি দুর্বলতা অসীম, কারণ বিগত কোনো সরকারই এবিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করেনি। অনেক দাবির পর বিগত সরকার ১৯৫৮ সালের বিশুদ্ধ খাদ্য আইনটিকে

সংশোধন করে ২০০৫ সালের বিশুদ্ধ খাদ্য আইনে রূপান্তর করেছে ঠিকই, কিন্তু সংশোধনীগুলো নিতান্তই হাস্যকর। বুঝা যাচ্ছে যে আইনটি সংশোধনের সময় সরকার ক্রেতা-ভোক্তার স্বার্থ নয় বরং উৎপাদকদের স্বার্থই দেখেছিলেন, তা-ও আবার অসৎ উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের। তবে এই আইনের একটি বিষয়ে বিগত জোট সরকারকে আমরা নিশ্চয়ই প্রশংসা করব। তা হল জেলায় জেলায় আলাদা খাদ্য-আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রাখা। অর্থাৎ খাদ্য-অপরাধের জন্য এখন আর মামলা-জটে পড়তে হবে না, ফলে দ্রুত বিচার করা সম্ভব হবে, বিশেষায়িত আদালত হওয়ার ফলে সঠিক বিচারও নিশ্চিত করা যাবে। মোবাইল কোর্ট নিয়মিতভাবে পরিচালনা করলে এবং এসব খাদ্য-আদালত সক্রিয় হলে অবস্থা উন্নত হতে বাধ্য।

কিন্তু প্রশ্ন হল ঢাকার বাইরে মোবাইল কোর্টের তৎপরতা তেমন দেখা যাচ্ছে না। বেশ কিছুদিন আগে দুয়েকটি বিভাগীয় শহরে একটি-দুটি মোবাইল কোর্টের কথা শোনা গেলেও বর্তমানে তা অনুপস্থিত। মফস্বল শহরগুলোতেও তাই। গ্রাম-গঞ্জের কথা না হয় না-ই বললাম। কিন্তু ঢাকার সাথে বিভাগীয় শহরগুলোর জনসংখ্যাকে যোগ দিলেও তা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০% হবে। তার মানে মোবাইল কোর্ট নিয়মিতভাবেও যদি এসব শহরে পরিচালিত হয় তাহলেও দেশের ৯০% মানুষ মোবাইল কোর্টলব্ধ সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে। যা অগণতান্ত্রিক ও অবশ্যই নৈতিকতা-বিরোধী। ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্য যদি শহরের লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করে তবে তা অবশ্যই গ্রামের মানুষকেও করে। তাই শুধু শহরের ভদ্রলোক ও শাসকশ্রেণীর জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হবে তা কোনো বিবেকসম্পন্ন ও সভ্য দেশে কখনো কাম্য হতে পারে না। আমাদের গণমাধ্যমগুলো থেকে আমরা জানি অসৎ ব্যবসায়ীদের কারণে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যে গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে সারা দেশ সয়লাব হয়ে গেছে। সেখানে শুধু শহরের লোকজন মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে, গ্রামের লোকগুলো থেকে যাবে একেবারেই অরক্ষিত অবস্থায়, তা হতে পারে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, গ্রামগুলোর অবস্থা শহরাঞ্চলের চাইতে শোচনীয়। তাই মোবাইল কোর্টগুলোর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়ানো দরকার যাতে গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে বাংলাদেশের সব মানুষই মোবাইল কোর্টের সুফল পেতে পারেন।

মোবাইল কোর্টগুলো অভিযান পরিচালনার সময় খাদ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল করে থাকেন। তার প্রমাণ আমরা খবরের কাগজে এবং টেলিভিশনে প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের কাজ অত্যন্ত সন্তোষজনক। তবু তাদের সুবিধার জন্য এবং তাদের প্রশংসনীয় কাজগুলোকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকটি পরামর্শ বিনীতভাবে উপস্থাপন করতে চাই।

আমাদের দেশে খাদ্য ও পানীয়তে রং ব্যবহারের হার বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবের খাবারে রং মেশানোর প্রবণতা প্রায় সাধারণ একটি ঘটনা। নিজেদের খাওয়া এবং অন্যদেরকে খাওয়ানোর জন্য রঙিন

খাবারের আয়োজন করা যেন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। খাদ্য ও পানীয়তে রং ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য খাবারকে আকর্ষণীয় করা। স্বাস্থ্যগত বিবেচনায় খাবারে রং ব্যবহার না করাই ভালো। তবে যদি একান্তই ব্যবহার করতে হয় তাহলে নিশ্চিত হতে হবে বিভিন্ন খাবার ও পানীয়কে আকর্ষণীয় করতে হলুদ, কমলা, লাল, সবুজ, নীল ইত্যাদি রংয়ের এই যে ব্যবহার তা নিরাপদ কিনা। বিজ্ঞানীরা কিছু রংকে খাদ্য ও পানীয়তে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। এগুলোকে বলে 'পারমিটেড ফুড কালার'। খাদ্য ও পানীয়ে ব্যবহৃত কৃত্রিম রংগুলো বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। পারমিটেড কালারগুলোও এ দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। কেবল ব্যতিক্রম অধিকাংশ প্রাকৃতিক রং, যেগুলো স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না। কিন্তু প্রাকৃতিক রং সাধারণভাবে দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। এগুলো থাকে বিভিন্ন ফল ও শাকসবজিতে। তাই খাদ্য ও পানীয়ে রং ব্যবহার করতে গেলে আমাদেরকে কৃত্রিম রং কিনতে হয়। যেহেতু কৃত্রিম রংগুলো স্বাস্থ্যের নানাবিধ ক্ষতি করলেও খাদ্য ও পানীয়ে এগুলো ব্যবহারে মানুষের আগ্রহ প্রবল, তাই তুলনামূলকভাবে নিরাপদ রংগুলোকে পারমিটেড কালার হিসেবে বিজ্ঞানীরা তালিকাভুক্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের খাদ্য ও পানীয়তে যে রংগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো পারমিটেড কালার নয়। কারণ আমরা এ দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার লুটেরা অপ-বাণিজ্যের বৃত্তে বন্দি। এখানে অন্য সব বিবেচনার চাইতে যেনতেন প্রকারে আহরিত মুনাফা বা ধনই মুখ্য। পারমিটেড কালারগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি বলে অসৎ ব্যবসায়ীরা পারমিটেড কালারগুলোর বদলে একই রকম দেখতে কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিকর 'টেক্সটাইল কালার' খাবারে মিশিয়ে দেয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা গামছা-লুঙ্গি-শাড়ি-সার্ট রাঙানোর জন্য যেসব রং আবিষ্কার করেছিলেন, বাংলাদেশের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের অজ্ঞতা বা অসৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুটপাটের অপ-মানসিকতার কারণে সেগুলো এখন খাবারে ব্যবহার করা হচ্ছে।

টেক্সটাইল কালার শরীরের বিভিন্ন অংশের অত্যন্ত ক্ষতি করে। এসব রং ত্বকে চুলকানি ও প্রদাহ তৈরি করে, বিভিন্ন চর্মরোগ সৃষ্টি করে, শরীরে নানা রকম এলার্জি তৈরি করে, শ্বাসকষ্ট কাশি ও হাঁপানি তৈরি করে, হজমের অসুবিধাসহ পাকস্থলির নানা রকম গোলযোগ ঘটায়, পেপটিক আলসার দেখা দেয়, অস্থিমজ্জার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সারের মতো রক্তের জটিল সব অসুখ তৈরি করে, লিভারকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে পচন বা সিরোসিস ও ক্যান্সার তৈরি করে, কিডনির কার্যকারিতা কমিয়ে দিয়ে বিবিধ জটিলতা বাধায়। এগুলোকে তাই রং না বলে বিষ বলাই ভালো।

তারা আরো খারাপ কিছু রং ব্যবহার করে, সেগুলো হল 'লেদার কালার' বা চামড়া রাঙানোর রং। জুতা-স্যান্ডেল-ব্যাগ-বেল্টের রং স্বাস্থ্যের জন্য টেক্সটাইল কালারের চাইতেও মারাত্মক ক্ষতিকর কারণ লেদার কালারের কাজই হল প্রোটিন বা আমিষের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা। ফলে খাওয়ার পর এসব লেদার কালার

আমাদের পাকস্থলি ও অন্ত্রনালীর দেয়ালে দৃঢ়ভাবে দীর্ঘদিন ধরে লেগে থেকে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ক্রমাগত দিয়ে যেতে থাকে।

আমাদের বাজারে এসব টেক্সটাইল কালার ও লেদার কালার বিক্রি করে ভারতীয় অজস্র কোম্পানির পাশাপাশি আই সি আই, বায়ার, মার্ক, ডোলডার ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের কোম্পানি। তারা এগুলো বিক্রি করে কাপড় ও চামড়া কারখানার মালিকদের কাছে। কিন্তু লুম্পেন অর্থনীতির কালো বাণিজ্যের হাত ধরে এসব রং খোলা বাজারে দেদার বিক্রি হয় কারণ রং বিক্রির ওপরে এদেশে কোনো বিধিনিষেধ নেই। মোবাইল কোর্ট রং বিক্রেতার কাছে রং-এর লেবেল দেখতে চাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৌটার লেবেল ব্যবসায়ীরা রাখে না। তবে যদি থাকে তাহলে সেই লেবেলে রংয়ের নাম থাকবে, ফুড কালার কিনা তা স্পষ্ট করে লেখা থাকবে, দাম লেখা থাকবে, উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ তো থাকবেই। লেবেলে রং-এর নাম লেখা থাকার ফলে মোবাইল কোর্ট সহজেই বুঝতে পারবে এটি পারমিটেড কালার নাকি টেক্সটাইল বা লেদার কালার।

আমাদের জানা মতে এদেশের খোলা বাজারে খাদ্যে ব্যবহারের জন্য যেসব টেক্সটাইল কালার অবাধে বিক্রি হচ্ছে সেগুলো হল অরামিন, অরেঞ্জ টু, মেটানিল ইয়েলো, রোডামিন বি, ব্লু ভিআরএস ইত্যাদি। এগুলো চানাচুর, লজেন্স, টফি, মিস্টি, দই, পেস্ট্রি, কেক, বিস্কুট, জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, আইসক্রিম ইত্যাদিকে আকর্ষণীয় করতে ব্যবহার করা হচ্ছে। রোডামিন বি এবং অরামিন ব্যবহার করা হয় লাল রঙের জন্য, আর মেটানিল ইয়েলো হলুদ করার জন্য। অরেঞ্জ টু এবং ব্লু ভিআরএস যথাক্রমে কমলা ও নীল রঙের জন্য ব্যবহার করা হয়। কালো রঙের জন্য ব্যবহার করা হয় ব্ল্যাক এসবি; হলুদ রঙের জন্য সান ইয়েলো আরসিএইচ, স্কাই ইয়েলো এফবি, ইয়েলো ৩ জিএক্স; কমলা রঙের জন্য অরেঞ্জ এসই, অরেঞ্জ জিআর পিওপি; লাল রঙের জন্য ফাস্ট রেড ৫ বি, স্কারলেট ৪ বিএস; সবুজ রঙের জন্য গ্রিন পিএলএস; নীল রঙের জন্য বরদু বিডব্লিউ, টুর্ক ব্লু জিএল; বাদামি রঙের জন্য ব্রাউন সিএন ইত্যাদি। লেদার কালারগুলোর বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য এখনো আমরা পাইনি।

পারমিটেড ফুড কালারগুলোর মধ্যেও আবার কিছু রং-এর ব্যাপক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন রংগুলো হল এফডিএন্ডসি অরেঞ্জ নং ১, এফডিএন্ডসি রেড নং ৪, এফডিএন্ডসি রেড নং ৩২, এফডিএন্ডসি ইয়েলো নং ১, এফডিএন্ডসি ইয়েলো নং ২, এফডিএন্ডসি ইয়েলো নং ৩, এফডিএন্ডসি ইয়েলো নং ৪ এবং এফডিএন্ডসি ভায়োলেট নং ১। সেই ১৯৭৮ সালে নিষিদ্ধ সুডান রেড, ১৯৭৫ সালে নিষিদ্ধ এমারান্থ ও টারট্রাজিনসহ বহু রং ও রং মেশানো খাদ্য-পানীয় বাংলাদেশের বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। তাই খাদ্য ও পানীয় উৎপাদকরা যাতে এসব টেক্সটাইল রং ও নিষিদ্ধ পারমিটেড রং ব্যবহার না করে সে বিষয়ে মোবাইল কোর্ট সতর্ক থাকলে ভোক্তারা উপকৃত হবে।

মোবাইল কোর্টকে খাদ্যে ব্যবহৃত কৃত্রিম মিষ্টিকারকগুলো নিয়েও সতর্ক থাকা উচিত। চিনির দাম বেশি বলে খাদ্য ও পানীয় উৎপাদকরা কৃত্রিম মিষ্টিকারকগুলো ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু সোডিয়াম সাইক্লামেট, সাইক্লামিক এসিড বা ক্যালসিয়াম সাইক্লামেটের মতো নিষিদ্ধ উপাদানগুলো যাতে এ কাজে ব্যবহৃত না হয় তা আমরা আশা করি। আমাদের দেশে সোডিয়াম সাইক্লামেটই বেশি পাওয়া যায়। চিনির দাম বেশি বলে খাদ্য ও পানীয় উৎপাদকরা এগুলোকে চিনির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীরাও চিনির বিকল্প হিসেবে এগুলো ব্যবহার করছেন। শুধু দেশে উৎপাদিত সামগ্রীই নয়, এমনকি বিদেশি যেসব খাদ্য ও পানীয় আমাদের দেশে আমদানি হয়ে আসে সেগুলোতেও এসব নিষিদ্ধ ও স্বাস্থ্যহানিকর রং ও কৃত্রিম মিষ্টিকারক থাকে কিনা তা দেখা জরুরি।

নকল ও ভেজালবিরোধী অভিযানে গিয়ে মোবাইল কোর্ট আমাদের দেশের বিভিন্ন খাদ্য, পানীয় ও আইসক্রিম কারখানা থেকে বিপুল পরিমাণ সোডিয়াম সাইক্লামেট আটক করছেন। এসব কারখানার লোকজনও স্বীকার করেছেন যে তারা এগুলো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন। কোনো কোনো ওষুধের বা মনোহারি-মুদি দোকানেও এই সোডিয়াম সাইক্লামেট বিক্রি হচ্ছে। আমাদের দেশে দই, মিষ্টি, আইসক্রিম, বিভিন্ন পানীয়, এমনকি চকলেট-টফি তৈরির কোম্পানিগুলোর অনেকেই সোডিয়াম সাইক্লামেট ব্যবহার করছে।

কিন্তু বিজ্ঞান বলছে যে নিয়মিত ব্যবহারে সাইক্লামেট অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি লিভার, ফুসফুস, লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম ও মূত্রথলিতে টিউমার তৈরি করে। ফলে ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সব ধরনের খাদ্য, পানীয় ও ওষুধে এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এটি মায়োকার্ডিয়াল ক্যালসিফিকেশন ঘটায়। এর ফলে হৃদপিণ্ডের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায় বলে সহজে রক্ত পাম্প করতে পারে না। ওষুধেও এ সমস্যা সারানো যায় না। তাছাড়া এটি করোনারি ভেসেলস্-এর স্ক্লেরোসিস্ অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের ধমনী-শিরাগুলো চর্বি জমে শক্ত হয়ে যাওয়া ঘটায়। এই ক্যালসিফিকেশন কিডনিতেও ঘটে এবং এর ফলে রিনাল হাইপারপ্লেসিয়া অর্থাৎ কিডনি বড় হয়ে যাওয়া দেখা দেয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে এটি কিডনিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আরো আছে। সোডিয়াম সাইক্লামেট খেয়ে রোদে বেরুলে গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়। যারা গায়ের ফর্সা রংকে খুব মূল্য দেন তাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত দুঃসংবাদই বটে। উপরন্তু এটি কোনো কোনো এন্টিবায়োটিকের বিশোষণে বাধা দেয় বলে কোনো কোনো জীবাণুজনিত অসুখ জটিল আকার ধারণ করে। এর ব্যবহারে ক্রোমোজমের ক্ষতি হয় অর্থাৎ বাবা-মা এটি খেলে বিকলাঙ্গ বা অস্বাভাবিক বাচ্চা জন্ম নিতে পারে। তাছাড়া গর্ভবতী মায়েরা এটি খেলে বাচ্চা ডাউনস্ সিন্ড্রোম নামের জটিল অসুখে আক্রান্ত হতে পারে যার ফলে বাচ্চার চেহারা স্বাভাবিক না হয়ে নাক বোঁচা, চোখ উপরের দিকে টেনে থাকা, জিহ্বা বের করে হা করে তাকিয়ে থাকা, বোকা বোকা চেহারা, ফোলা ফোলা শরীর ইত্যাদি হতে পারে।

এদেশে ২০০৩ সালে প্রথম এবং ২০০৭ সালে দ্বিতীয়বার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে সাইক্লামেটকে খাদ্য ও পানীয়ে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে এটি খোলা বাজারে এখনও পাওয়া যাচ্ছে। খাদ্য ও পানীয় উৎপাদকরা তাদের কারখানায় যে এটি ব্যবহার করছেন তা মোবাইল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁরা কোনো কারখানায় সাইক্লামেট পাওয়া গেলে তা জব্দ ও জরিমানা করছেন। কিন্তু তার পরেও খোলা বাজারে সাইক্লামেটের বিক্রি থেমে থাকেনি, এখনো তা বহাল তবিয়তে চলছে। সাইক্লামেটের বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে নিছক মুনাফার লোভে মানুষের কাছে বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে এটিকে নিরাপদ বলে চালানোর অপচেষ্টা করছে। চিরাচরিত এই অপচেষ্টার যত দ্রুত অবসান হয় ততই জনস্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, টিউমার সৃষ্টিকারী একটি উপাদানকে নিষিদ্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের পরেও বাজারে এটি কীভাবে পাওয়া যায়? কারা এটি আমদানি ও বিক্রি করে? তারা কি এতই শক্তিশালী যে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকির কোনো তোয়াক্কাই করে না? এ জিনিস চোরাচালান হয়ে আসে না। সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সরকারেরই অনুমতি নিয়ে রীতিমতো এলসি খুলে এগুলো কীভাবে কারা আমদানি করে?

আজ বাংলাদেশের জনগণ দেখতে চায় যে সরকারি দপ্তরগুলোর মধ্যে কাজের সমন্বয় থাকুক, বিশেষ করে তা যখন জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কোনো বিষয় সম্পর্কিত হয়। জনগণ প্রত্যাশা করে যে অবিলম্বে কেমিক্যালসের পাইকারি বাজার থেকে শুরু করে সব ওষুধের দোকান, খুচরা, মনোহারি ও মুদি দোকান থেকে সাইক্লামেটস্ সরিয়ে নেয়ার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। একদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা কোনো কারখানায় সোডিয়াম সাইক্লামেট পেলে তা জব্দ করে জরিমানা করবেন, আবার সরকারের আরেকটি দপ্তর এটি আমদানির অনুমতি দেবে– এ দ্বৈত নীতির যত দ্রুত অবসান হয় ততই দেশের জন্য মঙ্গল। আমরা ক্রেতারাও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারি। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই সোডিয়াম সাইক্লামেট বা অন্যান্য সাইক্লামেটগুলো কেনা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি।

বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত একটি দেশে বিদেশি খাদ্যপণ্য ভালো বাজার পাবে তা বলাই বাহুল্য। যে সব বিদেশি খাদ্যপণ্য আমাদের দেশে অবাধে বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান হল বিভিন্ন রকম কৃত্রিম ফলের রস ও পানীয়, পানীয় কনসেন্‌ট্রেট, জ্যাম- জেলি-সস্, চকোলেট-টফি, বিস্কুট-ওয়েফার, চিপস্ ইত্যাদি। মিডিয়াগুলোর সংবাদে জেনেছি যে মোবাইল কোর্ট এগুলোর কোনো কোনোটিতে মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ পায়নি, অনেক সময় মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ঘষামাজা করা হয়েছে, কখনো-বা অত্যধিক দামে এগুলো বিক্রি হয়েছে, এগুলোর অবাধ নকল হয়েছে এবং নামকরা দোকানেও এসব নকল সামগ্রী বিক্রির ঘটনা রয়েছে। এগুলো সবই মারাত্মক অপরাধ এবং মোবাইল কোর্ট এগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে শাস্তি দিচ্ছেন। তারা ঠিক

কাজটিই করছেন। কিন্তু আরো কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে মোবাইল কোর্টের আমলে নেয়া উচিত।

প্রথমত, উন্নত দেশগুলোতে প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রীর লেবেলের প্রতিটিতে ব্যবহৃত রং, প্রিজারভেটিভ, ফ্লেভার, সুইটেনার ইত্যাদির নাম লেখা থাকা বাধ্যতামূলক। তবে কখনো কখনো তারা তাদের নিজ দেশের বাইরে খাদ্যসামগ্রী বিক্রির সময় কিছু তথ্য গোপন করে। এই গোপন করার প্রবণতার একটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য তো রয়েছেই, উপরন্তু তারা আমাদের মতো দেশগুলোর স্বাস্থ্য অসচেতনতা ও দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত বলেই এসব তথ্য দেয়ার বিষয়ে যত্নবান হয় না। এমনকি কখনো কখনো গরিব দেশের জন্য খাদ্যপণ্যসামগ্রী তৈরির সময় তারা ভিন্ন ফর্মুলা পর্যন্ত ব্যবহার করে। মোবাইল কোর্টগুলো বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখতে পারেন দু'ভাবে; (এক) যে সব বিষাক্ত রং বা অন্যান্য উপাদান আমাদের দেশে খাদ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ– সেগুলোর কোনো কোনোটি ভুল করে হোক বা ইচ্ছা করেই হোক, আমাদের দেশে পাঠানো খাদ্যপণ্যে ব্যবহার করতে পারে, (দুই) বিষাক্ত রং বা উপাদান আমাদের দেশের উৎপাদকরা ব্যবহার করলে জেল-জরিমানার শাস্তি পাবে আর বিদেশি পণ্যসামগ্রীর বেলায় সেগুলো দেখা হবে না, তা হতে পারে না। আইন সবার বেলায় যাতে সমানভাবে প্রয়োগ হয় আমাদের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সজাগ রয়েছেন। আমাদের দেশে নিষিদ্ধ বা ক্ষতিকর রং, প্রিজারভেটিভ, সুইটেনার ইত্যাদি আমদানিকৃত কোনো খাদ্য ও পানীয়ে থাকতে পারবে না। যদি কোনো খাদ্যসামগ্রীতে এগুলোর উপস্থিতি দেখা যায় তাহলে সেসব পণ্য বাজেয়াপ্ত ও দোকানদারের জরিমানা উভয়ই করা উচিত। আমদানিকারকরা নিজ দায়িত্বেই যাতে লক্ষ রাখে তাদের আমদানি করা কোনো ফর্মুলেশনে যেন নিষিদ্ধ বা ক্ষতিকর উপাদান না থাকে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমদানিকারকও সেই বিশেষ উপাদানটি বাদ দিয়ে ফর্মুলেশন করার জন্য মূল উৎপাদককে পরামর্শ দিতে সক্ষম হবে। এভাবে বিদেশি পণ্য কিনে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়া থেকে ক্রেতা বেঁচে যাবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের খাদ্য-পানীয়গুলোর মতো বিদেশি অনেক সামগ্রীতেও ফলের ছবি দেখানোর বাণিজ্য থাকতে পারে, বিশেষ করে মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ার কিছু পণ্য যেমন ড্রিংকস কনসেন্ট্রেট ও গ্রানিউলস্ ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এগুলোর লেবেলে যেসব ফলের ছবি দেখানো হয় সেগুলোর আসল রস এ-সব সামগ্রীর অধিকাংশই থাকে না। আমাদের দেশের মতোই সেগুলোতে থাকে শুধু সেসব ফলের কৃত্রিম রং ও কৃত্রিম গন্ধ। ক্রেতা যেন বুঝতে পারে ওগুলো তাজা ফলের রস নয় সেজন্য লেবেলে 'কৃত্রিম' কথাটি স্পষ্টভাবে লেখা থাকার নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। এভাবে ক্রেতা বিদেশি পণ্য সরল বিশ্বাসে কিনে প্রতারিত হবে না।

'কৃত্রিম' কথাটি লিখে না রাখার ফলে আমাদের দেশের সরলপ্রাণ মানুষ এগুলো আসল ফলের রস মনে করে কিনে খাচ্ছে ও প্রতারিত হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের বদৌলতে

আমাদের দেশের হাসপাতালগুলোতে রোগীরা স্বাস্থ্য সহায়ক মনে করে সরল বিশ্বাসে এসব কৃত্রিম আম ও কমলার রস খাচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একবারও বলছে না যে এগুলো আসল আমের বা কমলার রস নয় বরং স্বাস্থ্যহানিকর। এগুলোর কোনো কোনো প্রস্তুতকারক বিজ্ঞাপনে বলে যে তারা নিজেদের বাগানের আম দিয়ে এগুলো তৈরি করে। কথাটি মানুষ বিশ্বাস করে না এজন্য যে তাদের বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ হিসাব করলে যে বিপুল পরিমাণ আমের প্রয়োজন ততবড় আমের বাগান কোম্পানির নেই। যারা বিদেশ থেকে আমের পাল্প আমদানি করে তারাও এত বিপুল পরিমাণ পাল্প আমদানি করে বলে কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমের বাগানের কথা না হয় বাদই দিলাম, কোম্পানির কমলার বাগানটা বাংলাদেশের ঠিক কোন্ স্থানে অবস্থিত?

নিজস্ব বাগান বা আমদানি করা পাল্প যদি এসব কোম্পানির ফলের রসের বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তাহলে তারা যে কথিত ফলের রসে আসলেই ফলের রস দিতে পারছে না তা স্বতঃসিদ্ধ। লেবেলের ফলের ছবির সাথে মিলিয়ে কৃত্রিম রং, কৃত্রিম গন্ধ, কৃত্রিম মিষ্টিকারক এবং কিছু গাঢ়ত্ববর্ধক ও প্রিজারভেটিভ মিশিয়ে যে পানীয়টি তৈরি হল তাকে 'কৃত্রিম' ফলের রস বলতে দ্বিধা কেন? আমাদের দেশের খাদ্য ও পানীয়তে কৃত্রিমকে কৃত্রিম ও আসলকে আসল বলার মতো আইন না থাকলেও উৎপাদককে সৎ হতে বাধা কোথায়? এসব কৃত্রিম ফলের রস খেয়ে মানুষ শুধু আর্থিকভাবে প্রতারিত হচ্ছে তাই নয়, স্বাস্থ্যগতভাবেও ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে। এসবের কৃত্রিম রং, বিশেষ করে টেক্সটাইল কালারগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি ও দৃশ্যমান ক্ষতিগুলো হয় আমাদের লিভার, কিডনি, হৃদপিণ্ড ও অস্থি-মজ্জার। এগুলোর কার্যকারিতা কমে যায়, কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চা ও বৃদ্ধদের বেলায় নষ্ট হয় তাড়াতাড়ি, তরুণ-তরুণীদের কিছুটা দেরিতে। আজকাল আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, কিডনি ফেলিউর, হৃদযন্ত্রের অসুখ, হাঁপানি এগুলো অত্যন্ত বেড়ে গেছে। সব বয়সী লোকজনই এতে আক্রান্ত হচ্ছে, তবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে বাচ্চারা। কারণ তথাকথিত ফলের রসগুলো থেকে আমরা বাচ্চাদের ফেরাতে পারছি না।

আমাদের দেশে আগের চাইতে এখন অনেক উন্নত মানের বিস্কুট তৈরি হচ্ছে। তবুও গণচীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে আমদানিকৃত বিস্কুটের একটি ভালো বাজার বাংলাদেশে রয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কোনো কোনো বিস্কুটে টেস্টিং সল্ট অত্যন্ত বেশি থাকে। টেস্টিং সল্ট মানে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট বা এম এস জি; শুধু সোডিয়াম গ্লুটামেট নামেও একে ডাকা হয়। এটি থাকলে বিস্কুট খেতে খুব সুস্বাদু হয়। তবে এর অসুবিধা হল এই টেস্টিং সল্ট মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করলে বা নিয়মিত খেলে অন্যান্য খাবারের কোনো স্বাদ পাওয়া যায় না, ক্ষুধা লাগে না, ঘুম কম হয়, মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে যায়, লেখাপড়ায় আগ্রহ কমে যায়, গভীর মনোযোগের কাজ বা লেখাপড়ায় অক্ষমতা দেখা দেয়, হাতের তালুতে জ্বলুনি হয়, ঘাড় গরম হয়ে যায়, মাথাব্যথা হয়, বুকে চাপ ধরে থাকে, শরীরের কোনো কোনো অংশের

মাংসপেশী লাফাতে থাকে ইত্যাদি। আরো যা মারাত্মক তা হল এই টেস্টিং সল্ট নিয়মিত ব্যবহারে পারকিন্‌সন্স ডিজিজ, আলজেইমারস্‌ ডিজিজ ইত্যাদি জটিল ও নিরাময়-অযোগ্য অসুখ তৈরি হয়। এদেশি ক্রেতাদের স্বার্থেই বিদেশি বিস্কুটে ব্যবহৃত টেস্টিং সল্টের উল্লেখ লেবেলে থাকা বাধ্যতামূলক করা হোক এবং এর পরিমাণটি কত তা উল্লেখের ওপর জোর দেয়া হোক।

আমদানিকৃত কোনো খাদ্যে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো উপাদান আছে কিনা তা নির্ণয়ের জন্য রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। বিদেশের নিয়ম হল আমদানিকৃত সামগ্রী বন্দর থেকেই কোয়ারেন্‌টাইন করা হয় এবং এগুলো থেকে স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। পরীক্ষাগারের ছাড়পত্র পেলেই কেবল আমদানিকৃত সামগ্রী খোলা বাজারে বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়। আমাদের দেশেও এমন নিয়ম করা দরকার। সেজন্য এগুলোর স্যাম্পল বিএসটিআই, জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, সাইন্স ল্যাবরেটরি ইত্যাদির পরীক্ষাগারে পাঠানো প্রয়োজন। এর আগে কিছুতেই এগুলোকে ছাড়পত্র দেয়া উচিত হবে না। এভাবে ক্রেতাদের জন্য বিদেশি পণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটিকে অবশ্যই স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। ইতোপূর্বে আমাদের কাস্টমস্‌ কর্তৃপক্ষ কখনো কখনো খাদ্যের স্যাম্পল পরীক্ষার জন্য সরকারি কোনো পরীক্ষাগারে পাঠালেও রিপোর্ট পাওয়ার আগেই রহস্যজনক কারণে তা ছেড়ে দেয়ার নজির আছে। সে রকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে বিষয়ে মোবাইল কোর্টসহ সংশ্লিষ্ট সবার সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমানে বাংলাদেশের খাদ্যপণ্য উৎপাদকদের অধিকাংশই নকল-ভেজালে লিপ্ত হওয়াতে এবং মোবাইল কোর্টগুলো কর্তৃক পরিদর্শনের সময় রোমহর্ষক সব তথ্য প্রকাশ পাওয়াতে কেউ বিদেশি খাদ্যপণ্যকে নিরাপদ মনে করে থাকলে ভুল করবেন। বিদেশি খাদ্যপণ্য মানেই একেবারে ভেজালমুক্ত বা মানসম্পন্ন তা মনে করার কোনো কারণ নেই। আমাদের সবারই দায়িত্ব হবে ক্রেতা হিসেবে দেশি-বিদেশি সব খাদ্য-পণ্যের মানের বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হয়ে তা ব্যবহার করা। দোকানদারদের উচিত হবে বিদেশি খাদ্যপণ্যের মান বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই তা দোকানে রাখা। মোবাইল কোর্ট ও সরকারের উচিত হবে বিদেশি সব খাদ্যপণ্যের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে এগুলো নিয়মিত মনিটরিং করা। কেবলমাত্র এভাবেই আমরা কোনো স্বাস্থ্যহানির ঝুঁকি না নিয়ে বিদেশি খাদ্যপণ্য ব্যবহার করতে পারব।

শিল-নোড়া দিয়ে মসলা পিষে ব্যবহার করার মতো সময় ও সুযোগ আজ আমাদের অধিকাংশেরই নেই। তাই গুঁড়া মসলা এখন আমাদের দৈনন্দিন অনুষঙ্গ। এ সুযোগে গুঁড়া মসলার ব্যবসাতে সৎ ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি অসৎ ব্যবসায়ীরাও ঢুকে পড়েছে। আমাদের জানা মতে রাজধানীর আশেপাশে ভেজাল মসলার কারখানার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। এরা এক কেজি কাপড়ের রং দিয়ে প্রায় তিনশ' কেজি মসলা বানায়। এছাড়া হলুদে মেশায় রেড ক্রোমেট, যা একটি বিষ। এটি রক্ত, কিডনি,

ফুসফুস, স্নায়ুতন্ত্র ও ঝিল্লির জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। তাছাড়া দীর্ঘদিন ব্যবহারে এটি নির্ঘাত ও প্রমাণিত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। ঠাণ্ডা পানিতে এটি তেমন রং না দিলেও গরম পানিতে উজ্জ্বল হলুদ, একেবারে আসল হলুদের মতো রং দেয়। এটি মেয়েদের জননেন্দ্রিয়ের ক্ষতি করে এবং গর্ভস্থ শিশুর বিকলাঙ্গতা ঘটাতে পারে। গুঁড়া হলুদে তারা যে কাপড়ের রং মেশায় তা প্রধানত মেটানিল ইয়েলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে বছরে প্রায় ৯২ কোটি টাকার পেপরিকা ও মেটানিল ইয়েলো আমদানি হয়। পেপরিকা গুঁড়া মরিচে ব্যবহৃত হয় আর মেটানিল ইয়েলো গুঁড়া হলুদে।

জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ ইনফরমেশন সেন্টারের মতে লেড ক্রোমেটকে গর্ভবতী মা, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের থেকে দূরে রাখতে হবে। কারণ উপরোক্ত ক্ষতিসমূহ ছাড়াও এটি অস্থিমজ্জার মারাত্মক ক্ষতি করে, ফলে রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া এন্‌সেফালোপ্যাথি হওয়ার কারণে এদের খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। পেটে ব্যথা ও কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাড়াও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও এটি বাধা দেয়।

লেড ক্রোমেটের লেড বা সিসাই হল প্রধান সমস্যা। প্রখ্যাত শিশু চিকিৎসা বিষয়ক জার্নাল 'পেডিয়াট্রিক্স' বলছে মসলাতে সিসা থাকলে তা মারাত্মক 'চাইল্ডহুড লেড পয়জনিং' তৈরি করতে পারে। এই সিসার কারণে অনেক শিশু, এমনকি প্রাপ্তবয়স্কের, মৃত্যুর ঘটনা বিজ্ঞানীরা লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে সিসার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের বেলায় ক্ষতির মাত্রা বেশি হওয়ার কারণ শিশুদের ওজন কম হওয়াতে প্রতি কেজি শরীরে সিসার ঘনত্ব বেশি হওয়া। 'চাইল্ডহুড লেড পয়জনিং' ঘটলে কারো কারো ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের সামনের লোবগুলোসহ অন্যান্য অংশের ক্ষতি হয় বলে শিশুটির কিছু দৃশ্যমান ও ব্যবহারগত বৈসাদৃশ্য দেখা দেয়, যা শিশুটি বড় না হওয়া পর্যন্ত হয়তো অভিভাবকরা বুঝতে পারবেন না। এগুলো স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগের কারণে হয় এবং এসব লক্ষণ অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হলেও এসব বৈসাদৃশ্য থেকেই যাবে।

শিশুদের শরীরে সিসার বিষক্রিয়া বিষয়ে ব্রিটিশ মেডিক্যাল বুলেটিন বলছে 'তাদের শরীরে সিসা প্রবেশের পর অন্ত্রনালী থেকে প্রায় সবটুকুই বিশোষিত হয়ে ব্লাড-ব্রেইন বেরিয়ার দ্রুত পার হয়ে যায় বলে ক্ষতিটাও প্রাপ্তবয়স্কদের চাইতে বেশি হয়। শিশুদের শরীরে সিসা প্রবেশের পর তা দ্রুত বের করার ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ অতি সামান্য পরিমাণ সিসাও তাদের স্নায়ুতন্ত্রের যা ক্ষতি করে তা আগের ধারণার চাইতেও বেশি।' ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের এই সাবধানবাণী শোনার পর আমাদের শিশুদের ভাগ্য নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি! হায়, মসলার ভেজাল বন্ধ করা যাচ্ছে না, জেনেশুনে আমাদের শিশুদের মুখে আমরা প্রতিদিন বিষ তুলে দিচ্ছি!

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে মানসিক সক্রিয়তার অভাব, মস্তিষ্কের ক্ষতি, পক্ষাঘাত, গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত ইত্যাদি লেড ক্রোমেটের অন্যতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

গুঁড়া হলুদে মেশানো মেটানিল ইয়েলো নামক রংটি খেলে ত্বক চাকা চাকা হয়ে ফুলে যাওয়া, বিভিন্ন রকম এলার্জি, নাক দিয়ে অবিরত পানি পড়া, বমি ভাব, বমি এবং কারো কারো ক্ষেত্রে হাঁপানি দেখা দিতে পারে। এছাড়া এতে গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ হওয়া, অপরিসীম ক্লান্তি, ঝিমুনি, রক্তে হিমোগ্লোবিনের অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি ঘটতে পারে। এছাড়া দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি তো রয়েছেই।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মেটানিল ইয়েলো এছাড়াও লিভার ক্যান্সারের একটা বড় কারণ হতে পারে কারণ পরীক্ষাগারে ইঁদুরের শরীরে তারা এই প্রবণতা দেখেছেন। মেটানিল-ইয়েলো মানুষের লিভারে এন-নাইট্রো-সোডাই-ইথাইল-এমাইন তৈরি করে যা হেপাটোকার্সিনোজেনেসিসের মাধ্যমে টিউমার সৃষ্টি করে। গুঁড়া হলুদে ব্যবহৃত এই রংটি লিভারে টিউমার সৃষ্টির সময় অস্বাভাবিক হারে কোষের বৃদ্ধি ঘটায়।

গুঁড়া মরিচে ভেজাল দেয়ার জন্য যে উজ্জ্বল লাল রংটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তার নাম সুদান রেড। এই রংটি সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেই ১৯৬৪ সালে বলেছে যে, এটি মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় কোনো খাবারে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। সংস্থা একই কারণে এই রংটিকে বিষাক্ততা মূল্যায়নে 'ক্যাটাগরি-ই' অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপ রংয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে। পরবর্তীতে ক্যান্সার ঝুঁকির কারণে সুদান রেড রংটির সব যৌগ (অর্থাৎ সুদান ১, সুদান ২, সুদান ৩, সুদান ৪) পৃথিবীর উন্নত সব দেশেই খাদ্যে ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার সুদান রেডকে সুনির্দিষ্টভাবে কার্সিনোজেন বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত করে রেখেছে। এটি শুধুমাত্র জুতা, পেট্রল, মোম, জ্বালানি তেল, চুল, মেঝে ইত্যাদি রঙ করার কাজেই ব্যবহার করা হয়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সব দেশ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অন্যান্য দেশের উৎপাদিত কোনো খাদ্যেই সুদান রেড ব্যবহৃত হয় না। এমনকি সেসব দেশে রপ্তানি করা সব খাদ্যই তারা দেশে প্রবেশের আগে পরীক্ষা করে দেখে সেগুলোতে সুদান রেড আছে কিনা। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নিয়ম করে দিয়েছে যে এর যে কোনো দেশে কোনো গুঁড়ামরিচ বা কোনো কারি পাউডার বাইরে থেকে প্রবেশের সময় প্রতিটি চালানের জন্য আলাদা সনদ দেখাতে হবে যে এতে কোনো সুদান রেড নেই। এই সনদ না থাকলে তা প্রবেশমুখেই আটক করা হয়। তদুপরি বন্দর ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজেরাও নমুনা সংগ্রহ করে এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখে। যদি কোনো চালানে কোনো সুদান ১-৪ পাওয়া যায় তবে তা ধ্বংস করা হয়।

এমনকি গরিব দেশগুলোও সুদান রেডের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আফ্রিকার গরিব দেশ জাম্বিয়ার স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়মিতভাবে গুঁড়া মসলা পরীক্ষা করে এবং সুদান রেড বা অন্য কোনো ক্ষতিকর উপাদান পেলে তা তাৎক্ষণিকভাবে বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে কোম্পানিকে বাধ্য করে।

ভেজালকারীরা যদি আমাদের গুঁড়া মসলাগুলোতে ভেজাল না মেশাত তাহলে আমরা ব্যবহারকারীরা উপরে আলোচিত মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিসমূহ থেকে নিরাপদ থাকতে পারতাম। এতে আমরা শারীরিকভাবে যেমন সুস্থ থাকতাম তেমনি ভেজাল গুঁড়া মসলা ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট অসুখের চিকিৎসার জন্যও অনেক টাকা খরচ করতে হত না। ভেজালহীন মসলা যদি আমরা পেতাম তাহলে তা আমাদের খাবার পরিপাকের কাজে সাহায্য করা ছাড়াও এগুলো থেকে কিছু ওষুধি গুণ পাওয়া যেত। আমাদের হাজার পাঁচেক বছরের ঐতিহ্যগত চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে সামগ্রীগুলো আমরা মসলা হিসেবে ব্যবহার করি তার প্রতিটিরই অনেক ওষুধি গুণ বিভিন্ন প্রাচীন বইতে বর্ণনা করা আছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে এখনো প্রতিটি মসলাই কখনো সক্রিয় ওষুধ কখনো অনুপান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতিকালে উন্নত দেশের বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত কিছু নিবন্ধেও আমাদের মসলার ওষুধি গুণ বিষয়ে সমর্থন পাওয়া গেছে।

আমরা মসলাগুলো থেকে এসব ওষুধি গুণাগুণ পেতে পারতাম যদি এগুলো ভেজাল না হত। যদি বাজারের গুঁড়া মসলাগুলো কোনোভাবেই ভেজালমুক্ত করা না যায় তাহলে আমাদেরকে আবার সেই শিল-নোড়ায় মসলা বেটে খাওয়ার প্রক্রিয়াতেই ফিরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এর ফলে ভেজালের মারাত্মক ক্ষতিগুলো থেকে যেমন আমরা ও আমাদের সন্তানেরা বাঁচবে তেমনি এগুলোর ওষুধি গুণগুলোও আমরা পেতে থাকব।

কয়েক বছর আগে আমাদের দেশের প্রথম সারির দু'টি খাদ্য উৎপাদক কোম্পানি ইংল্যান্ড ও নরওয়েতে প্রবাসী বাঙালিদের জন্য মরিচের আচার রপ্তানি করতে গিয়ে বাধা পেয়েছে। সেসব দেশ তো আর আমাদের দেশের মতো নয়, তাদের দেশের সরকার জনস্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক বলে যে কোনো খাদ্য-পানীয় আমদানির আগে এগুলোতে বিষাক্ত উপাদান আছে কিনা তা আগে পরীক্ষা করে তারপর অনুমতি দেয়। আমাদের দেশে এমনটি নেই বলেই ক্রেতা-ভোক্তাদের বিপদ। আটকা পড়া এসব কোম্পানির খাদ্য-পানীয় আমাদের দেশে দেদার বিক্রি হয়, তারা বিজ্ঞাপন দিয়ে মিডিয়া আর টেলিভিশন দখল করে রাখে, আর উন্নত দেশে গেলে স্বাস্থ্যহানিকর বলে আটকা পড়ে।

দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর লোক খুবই কম। অন্তত অতীতের সরকারগুলোকে তো তা করতে খুব একটা দেখা যায়নি। অথচ মাথা ঘামানো খুবই জরুরি ছিল। আমাদের খাদ্যে এসব সন্ত্রাস প্রতিরোধে কিছু করতে

বর্তমান সরকার এগিয়ে আসবেন তা জনগণ ভীষণভাবে প্রত্যাশা করে, বিশেষ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গত নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়টির উল্লেখ থাকাতে। কারণ জীবনের নিরাপত্তার মতো খাদ্যের মানগত নিরাপত্তাও একটি অত্যন্ত জরুরি জনস্বার্থগত বিষয়।

[লেখক: অধ্যাপক, সাবেক চেয়ারম্যান, ফার্মেসি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক চেয়ারম্যান, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

প্র ব ন্ধ

খাদ্যে ভেজাল

না জ মা শা হী ন

ক্ষুদ্র ভৌগোলিক আয়তনের বাংলাদেশে বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য 'খাদ্যনিরাপত্তা' একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ, প্রায় ১৬ কোটি মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন একটি দুরূহ কাজ। তবু আমাদের বৈজ্ঞানিকদের অধিক ফলনশীল জাতের ধান উদ্ভাবনের ফলে অন্ততপক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণের চাল উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রথম ধাপে উত্তরণ ঘটিয়েছে। যা এ দেশের পঞ্চাশ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। কিন্তু অন্যদিকে 'খাদ্যে ভেজাল' আমাদের জাতীয় জীবনে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি প্রকট সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। ক্রেতাকে প্রতারণা করার জন্য দুধে পানি মেশানো বা চালের ওজন বাড়ানোর জন্য ইট বা পাথরের কণা মেশানো অনেক পুরনো ধারা। কিন্তু অতি সম্প্রতি যে সকল ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে খাবার আকর্ষণী, ফল পাকানো কিংবা মাছ সংরক্ষণ করা হচ্ছে তা আমাদের জনস্বাস্থ্যকে ভীষণভাবে ঝুঁকির সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছে।

অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের জনসাধারণ এ বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত নয়। জনসাধারণ জানেন না যে তারা প্রতিনিয়ত খাদ্যে কী ধরনের ভেজাল বা বিষক্রিয়ার সম্মুখীন হচ্ছেন। কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ীগোষ্ঠী অধিক মুনাফার লোভে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে যাচ্ছে। অধিক মুনাফার লোভে তারা এইসব ব্যবহারের অনুপযোগী খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত করে সরলবিশ্বাসী ক্রেতাসাধারণকে প্রতারিত করছে। এর ফলে স্বাস্থ্যহানিকর প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের ক্রনিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে জনসাধারণ। পরিণতিতে যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠী তেমনি ধনী শ্রেণীও 'খাদ্যের ভেজাল' দ্বারা ক্যানসার, কিডনিজনিত ব্যধি, ডায়াবেটিকস এবং বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। আর পুষ্টিহীনতার পাশাপাশি এই সমস্ত ভেজাল সেবনের মাধ্যমে সৃষ্ট রোগব্যাধি জাতীয় জনস্বাস্থ্যের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেই চলেছে।

খাদ্যবিজ্ঞানে (Food Science) শাক-সবজি-ফল-মূল এসব পচনশীল খাদ্য সংরক্ষণের জন্য কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু তার একটি নিরাপদ সহনশীল মাত্রা রয়েছে। এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও সহনশীল মাত্রা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলেও বিশুদ্ধ খাবার থেকে ক্রেতারা বঞ্চিত হচ্ছেন। আর এই মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য সেবন ধীরে ধীরে মানবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যার ফলে জনসাধারণের শারীরিক দুর্ভোগ বাড়ে আর কমে আসে তার গড় আয়ু।

বাংলাদেশের খাদ্য-শিল্প (Food Industry)-সমূহে কী কী ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহার করা হয় তার ওপর এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কোনো সমীক্ষা করা হয়নি। ফলে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের হাতে পূর্ণাঙ্গ কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। এ যাবৎকাল করা বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত গবেষণা, সমীক্ষা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের খাদ্যে দূষণ এবং ভেজালের ধরন সম্পর্কে যা জানা গেছে তার আংশিক নিচে বর্ণনা করা হল:

খাবারের রঙ (Food Color)

খাবারকে আকর্ষণীয় করার জন্য খাবারের উপাদান হিসেবে নিরাপদ খাদ্যরঞ্জক (Food Color) হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রঙের ব্যবহার সব দেশেই কমবেশি প্রচলিত। কিন্তু নিরাপদ খাদ্যরঞ্জকের দাম বেশি হওয়ায় এর পরিবর্তে আমাদের দেশে খাবারে বিষাক্ত (Toxic) কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন কনফেকশনারি, বেকারি ও মিষ্টির দোকানে যে সব রঙিন খাবার, মিষ্টি ও রঙিন পানীয় বিক্রি হয় সেইসব সহ আরো অনেক তৈরি খাবারে বিষাক্ত (Toxic) কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন– Blue - 2, Orange – 3 , Red - 3, Yellow - 5, Yellow – 6 ।

কেক, পেস্ট্রি, হলদে জিলাপি, জাফরানি, বেগুনি, পেঁয়াজু, আলুচপ, লজেন্স, চিপস, মিষ্টি, দই, আইসক্রিম সহ অনেক খাবারে এই রঙের ব্যবহার দেখা যায়। অনেক জরিপে টেক্সটাইলের রঙ ব্যবহারের প্রামাণ্য তথ্যও পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে দেখা যায় তরমুজ, বেদানা বা টমাটোকে লাল ও আরো আর্কষণীয় করার জন্য ক্ষতিকর কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করা হয়। নিচে কিছু উদাহরণসহ স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো সংক্ষেপে দেয়া হল: ইনডিগো থেকে উদ্ভূত সবুজ রঙ– যা কোমলপানীয়, কেক, চকলেট ও মিষ্টিতে ব্যবহার করা হয়। সুদান এক হলুদ (Sudan 1 yellow) এবং সুদান লাল (Sudan Red) রঙ শুকনা মরিচের গুঁড়া বা হলুদ গুঁড়াতে ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ড় রঙ লিভার, মূত্রথলিতে টিউমার হওয়ার জন্য দায়ী। যা প্রায়শই ক্যানসারে পরিণত হয়। মুড়িকে সাদা ও বড় করার জন্য ব্যবহার করা হয় ইউরিয়া। যা ত্বকের সমস্যা ও প্রদাহ, ওজন বৃদ্ধি, কিডনি ও লিভার অকেজো করে। **অপরিপক্ক ফল পাকানোর জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য (Ripening agent)** প্রাকৃতিকভাবে ফল পরিপক্ক হবার পর উদ্ভিজ হরমোন 'ইথাইলিন'-এর প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে ফলের রং এবং স্বাদের পরিবর্তন হয়। সাধারণত ফল পাকার সময় ইথাইলিনের মাত্রা বেড়ে যায়। কোনো কোনো ফলের ক্ষেত্রে ফল পাকার আগ মুহূর্তে এই হরমোন সবচেয়ে বেশি থাকে। পরিপক্ক ফল-এ এনজাইমেটিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জৈবরাসায়নিক পরিবর্তন হয়, এতে শক্ত চামড়া ধীরে ধীরে নরম হয় এবং কমপেক্স স্টার্চ সাধারণ শর্করায় (Free Sugar) পরিবর্তিত হয়। ক্লোরফিল কেরোটিনয়েড-এ পরিণত হয় যে কারণে ফলের বাহ্যিক রঙের পরিবর্তন ঘটে এবং হলুদ বা লাল রং ধারণ করে। কাঁচা অবস্থায় ফলের মধ্যে এসিড থাকে, আর তাই কাঁচা ফলের স্বাদ টক। ফলমূল পাকার প্রক্রিয়ায় এই সকল এসিড ভেঙে নিউট্রাল যৌগে পরিণত হয়। তখন ফলের টক স্বাদ নিউট্রাল হয়ে যায়। কিন্তু অতি দ্রুত অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ফল পরিপক্ক হবার আগেই তা ইথাইল অক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, এসিটাইলিন ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ফলের বাহ্যিক রঙের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাজারজাত করা হয়। সাধারণত ইথিফেন (Ethephen) বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এই রাসায়নিক দ্রব্য ফলে ঢুকে তা ভেঙে ইথাইলিন হয়। ক্যালসিয়াম কার্বাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে এসিটাইলিনে পরিণত হয়, যা ইথাইলিনের এনালগ।

অপরিপক্ক ফলকে কৃত্রিমভাবে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে পাকানো হলে তার স্বাভাবিক স্বাদের বিকৃতি ঘটে এবং বিষাক্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে কার্বাইডের আর্সেনিক এবং ফসফরাসের উপস্থিতি ফলকে বিষাক্ত করে। অপরিপক্ক ফলকে কৃত্রিমভাবে পাকানো হলে ফলের চামড়া সুষমভাবে একই রঙ ধারণ করে। কোথাও কাঁচা কোথাও পাকা ভাব থাকে না। যেমন– টমেটো, আম, পেঁপে, কলা, তরমুজ ও আনারস। কিন্তু কলার ক্ষেত্রে তার সবুজ রঙের বোঁটা থেকে কৃত্রিমভাবে পাকানো হয়েছে তা বোঝা যায়। কারণ এ ক্ষেত্রে বোঁটাটি সবুজ থাকে আর কলাটি হলুদ হয়ে যায়। এছাড়া, কপার সালফেট কাঁচা পেঁপের বোঁটায় ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁচা পেঁপেকে পাকানো হয় যাতে তাড়াতাড়ি হলুদ হয় কিন্তু স্বাদ পরিবর্তন হয় না। বরং অনেক সময় অতিরিক্ত তুঁত বা কপার সালফেটের কারণে তেতো স্বাদ অনুভূত হয়। অনেক আন্ত

র্জাতিক গবেষণার ফলাফলে বর্ণিত আছে ইথাইলিন শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করা ক্ষতিকর এবং ইথাইলিন অক্সাইডের সহনশীল-মাত্রা ১ পিপিএম আট ঘণ্টা পর্যন্ত। কিন্তু ৫ পিপিএম পনের মিনিট পর্যন্ত। যদি বাতাসে ২০০ পিপিএম মাত্রায় থাকে তাহলে নাক ও গলার মেমব্রেনে প্রদাহ সহ ট্রেকিয়া এবং ফুসফুসের ব্রোনকিউলের মারাত্মক ক্ষতি করে। কখনো কখনো ফুসফুসে পানি জমে, হৃদযন্ত্র ও তার কার্যপ্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে। সুতরাং যারা এই সকল রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে অপরিপক্ক ফল পাকানোর কাজ প্রতিনিয়ত করে, তাদের স্বাস্থ্য অধিকতর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

খাদ্য সংরক্ষণ (Food Preservative)

পচনশীল খাদ্যকে দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণের জন্য অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। যেমন– প্যারা হাইড্রক্সি বেনজয়িক এসিড (p-hydroxy Benzoic acid), সোডিয়াম বেনজয়েট (Sodium Benzoiate), সোডিয়াম বা পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট ইত্যাদি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও এফ.এ.ও. কর্তৃক এইসব খাদ্যসংরক্ষক রাসায়নিক দ্রব্যের অনুমোদিত সহনশীল মাত্রা রয়েছে। কিন্তু এই মাত্রা বাংলাদেশে খাদ্যপ্রস্তুত ও সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা অনুসরণ করে না। মাছ অতি দ্রুত পচনশীল, তাই মাছ ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে দীর্ঘক্ষণ মাছ সতেজ রাখার জন্য তাতে ফরমালিন ব্যবহার করে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে দুধ, ফলমূলসহ অন্যান্য খাদ্যসমূহেও ব্যবহার শুরু করে। যা মহামারী আকার ধারণ করেছিল বাংলাদেশে। দুধ, মাছ, মাংস সহ ফল/সবজি দীর্ঘদিন সজীব ও তাজা রাখার জন্য ব্যবহার হয় ফরমালিন। যেসব উপাদান পেটে গেলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে ফরমালিন হল সেই ধরনের বিষ। অতিরিক্ত ফরমালিন মানবদেহে প্রচণ্ড কাশি, মাথাব্যথা, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস এবং আরো অনেক জটিল রোগ তৈরি করে। পাকস্থলিতে ফরমালিনের গেলে গ্যাসট্রিক হতে পারে। বৃহদান্ত্রের ডিওডেনাম এবং জেজুনামে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। যখন মানুষ ৩ পিপিএম মাত্রার ফরমালিন সংস্পর্শে আসে তখন চোখে ও নাকে মাঝারি ধরনের জ্বালা অনুভূত হয়। ১০ পিপিএম মাত্রার ফরমালিনের সংস্পর্শে যদি আসে তখন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে যায়। নাকের ভিতর ও গলায় মারাত্মক জ্বালা-পোড়া ও কাশি হয়। ৫০ পিপিএম-এর ওপরে ফুসফুসে পানি এবং নিউমোনিয়া ঘটায় এবং ১০০ পিপিএম-এ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

সাধারণত খাদ্যে যে ধরনের ভেজাল বাংলাদেশের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে চলেছে তার কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

১. শুকনা মরিচের গুঁড়ায় রয়েছে ইট বা কাঠের গুঁড়ার সাথে কৃত্রিম লাল রঙ।
২. হলুদের গুঁড়ায় রয়েছে ক্ষতিকর গুঁড়া রঙ বা আটা।
৩. লবণ-এ রয়েছে শাদা বালি ও অপর্যাপ্ত আয়োডিন।
৪. চাল-এ রয়েছে ইউরিয়া সার বা কৃত্রিম রঙ বা ইটের কাঁকর।
৫. ডাল-এ রয়েছে কৃত্রিম রঙ।

৬. মধুতে রয়েছে রঙ-দেয়া চিনির সিরা।
৭. চা-পাতায় রয়েছে কাঠের গুঁড়া বা ব্যবহৃত শুকনা চা-পাতা।
৮. সরিষার তেল-এ রয়েছে সয়াবিন তেলের সাথে সরিষার ঝাঁঝালো কৃত্রিম গন্ধ।
৯. ঘি-এ রয়েছে পামওয়েল বা উদ্ভিজ তেল-এর সাথে মিশ্রিত কৃত্রিম গন্ধ।
১০. মিষ্টি তৈরিতে ব্যহার করা হয় নিচু মানের ছানার সাথে সেকারিন, স্নেহহীন।
১১. পাউডার দুধের সাথে টেক্সটাইলের রঙ।
১২. মাছ সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয় অতিরিক্ত ফরমালিন।
১৩. ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড, হরমোন, ইথোফেন।
১৪. আইসক্রিম তৈরি করা হয় কৃত্রিম রঙ, অপরিশুদ্ধ পাউডার দুধ, পামওয়েল (Palm oil), সোডিয়াম সাইক্লামেট (Sodium Cyclamate) ।
১৫. কোমল পানীয় প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম বা টেক্সটাইলের রঙ, কৃত্রিম।
১৬. ফলের ফ্লেভার ও সোডিয়াম সাইক্লামেট।
১৭. মুড়ি শাদা ও বড় করার জন্য ব্যবহার করা হয় ইউরিয়া।
১৮. খেজুরের গুড়ের রঙ উজ্জ্বল ও আর্কষণীয় করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
১৯. কাপড়ের সোডা বা চক পাউডার।
২০. ভাজাপোড়া মুখরোচক খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় নিচু মানের ডালের গুঁড়া, ব্যবহৃত পোড়া তেল কিংবা নিম্নমানের পামওয়েল ও টেক্সটাইলের রঙ।
২১. দারুচিনি হিসেবে বাজারে বিক্রি করা হয় কেসিয়া গাছের ছাল (Cassia)।
২২. দৈ তৈরি করা হয় দুধের সাথে স্টার্চ পাউডার, সোডিয়াম সাইক্লামেট ও কৃত্রিম রঙ।
২৩. মাছের শুটকি সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয় কীটনাশক (Insecticide)।
২৪. পটল, করলা ও লাল শাক রঙিন করায় ব্যবহৃত হচ্ছে টেক্সটাইলের রঙ।

খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীরা গোটা জাতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এতে দেশের জনসাধারণের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যই আশংকাজনকভাবে হুমকির মুখে। ভেজাল প্রতিরোধে যে খাদ্য আইন হয়েছে অতিসত্বর তার সঠিক ও সুষ্ঠ বাস্তবায়ন অত্যন্ড় জরুরি। ভেজালের এই বিষচক্র থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তেমনি প্রয়োজন জনসাধারণের সচেতনতা। আর জনসাধারণের সচেতনতা ও আইন প্রয়োগের লক্ষ্যে খাদ্যদূষণের ওপর সামগ্রিক একটি জরিপের কোনো বিকল্প নেই। এই জরিপের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা খাদ্যভোক্তাদের ভেজাল সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি করতে পারে। খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল প্রতিরোধে দেশের সব ধরনের খাদ্যদ্রব্যের ওপরে সঠিক ও সুষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত থাকলে সক্রিয়ভাবে খাদ্যবিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিজ্ঞানীরা জনসাধারণকে সরাসরি জন-অবহিতকরণ-প্রক্রিয়া (যেমন কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার ও পাঠচক্র) ও গণমাধ্যম (যেমন

দৈনিক পত্রিকা, টেলিভিশন ও রেডিও) দ্বারা সাবধান করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে আইন প্রয়োগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারবে। এইভাবে জনগণ, বিশেষজ্ঞ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশে ভেজাল প্রতিরোধ ও পঙ্গুত্বের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করতে সফল হবে বলে আশা করা যায়।

[লেখক: আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। এই বিষয়ে রয়েছে তাঁর গবেষণা গ্রন্থাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিটের অধ্যাপক এবং শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বরত।]

সা ক্ষা ৎ কা র

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও তার ভয়াবহতা: মোকাবেলার এখনই সময়

শা ই খ সি রা জ

[আজ ৪ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে আমরা মুখোমুখি হয়েছি প্রখ্যাত কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম-ব্যক্তিত্ব জনাব শাইখ সিরাজ এর। তাঁর জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, চাঁদপুরে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অশোকা ফাউণ্ডেশনের একজন ফেলো। পরিচালক ও বার্তাপ্রধান, চ্যানেল আই। কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠানের সফল টিভি উপস্থাপক হিসেবে দেশে-বিদেশে বিশেষ সুনাম কুড়িয়েছেন। আজ আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া এবং এর পরিণতি সম্পর্কে। উল্লেখ্য, বহুদিন ধরে তিনি টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশের জনগণ এবং সরকারের সংশ্লিষ্টদের এ-বিষয়ে অবহিত ও সচেতন করবার চেষ্টা করে চলছেন।]

হালখাতা

আপনার মতে মানুষ খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল কেন দিয়ে থাকে? অর্থাৎ মানুষের জন্য ক্ষতিকর এই কাজটি মানুষই কেন করে? এর মনস্তাত্ত্বিক কারণটি আসলে কী?

শাইখ সিরাজ

মানুষের এই কাজটি করার মনস্তাত্ত্বিক কারণ হল অতি-মুনাফা করা। প্রতিটি মানুষই তার অবস্থানগত দিক থেকে মনে করে যত দ্রুত অর্থ উপার্জন করা যায়; ততোই ধনী হওয়া যায়। খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়ার মূল কারণ হিসেবে হয়তো লক্ষ করে থাকবেন; বাংলাদেশে গত ৩/৪ বছর ধরে নতুন একটি ফসল দেখছি; এটি একটি বরই, যাকে বাউকুল (Bau-Kul) বলা হয়। যে ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ বাওকুল খেয়েছে সে একটি আপেলের সাথে এই বাউকুলের কোনো পার্থক্য করতে পারবে না। এবং একটি আপেলের সাইজ যা হয় একটি পরিপূর্ণ বাওকুলের সাইজও তাই হয়। কিন্তু বাজারে আপনি যে বাউকুলটি পান সেটি খেতে আপেলের মতো মিষ্টি লাগে না; বরং কষ-কষ লাগে। তখন বোঝা যায় বাউকুলটি আসলে অপরিপক্ক। অর্থাৎ বাংলাদেশে আগে আপনি একটি বাউকুল পেতেন আপেলের সাইজ ও স্বাদের মতো– এখন পাচ্ছেন কষ-কষ এবং আকারে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট। এক্ষেত্রে যিনি বাগানটি কিনে নিচ্ছেন অর্থাৎ ব্যবসা করছেন তিনি অতি-মুনাফার লোভে বাজার ধরার জন্য বাউকুলটি পূর্ণাঙ্গভাবে পরিপক্ক হওয়ার আগেই ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন।

হালখাতা

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর ফলাফলটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

শাইখ সিরাজ

এতে করে মূলত ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হল। এর ফলে ক'দিন পরে দেখবেন বাজার থেকে বাউকুলটি হারিয়ে যাচ্ছে। কেননা কষ-কষ বা স্বাদহীন লাগার কারণে ভোক্তা এই বাউকুলটি থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু বাউকুলটিকে যদি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ভোক্তার কাছে এনে দেয়া যেত তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এর চাহিদা বেড়ে যেত। এই একটা বিষয় দিয়ে আমি বাংলাদেশের সমগ্র বিষয়কে বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

হালখাতা

বরই, কলা, আম, লিচু– যে কোনো ধরনের ফলই তো অপক্ক অবস্থায় ক্যামিক্যাল দিয়ে পাকিয়ে বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি করা হচ্ছে; ক্রেতারা সেগুলো ক্রমাগত কিনে খাচ্ছেনও। প্রশ্ন হল, ক্রেতারা সেগুলো কিনে খাচ্ছেন কেন? এব্যাপারে ক্রেতাদের কোনো রি-এ্যাকশন বা বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে না– এর কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

শাইখ সিরাজ

প্রথমত, অধিকাংশ ক্রেতারা এই বিষক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন না। দ্বিতীয়ত, এই বিষক্রিয়া সম্পর্কে ক্রেতা বা ভোক্তারা ধীরে ধীরে জানতে বুঝতে পারার পরও তারা কী

করবেন? ক্রেতাদের তো এগুলো কিনে খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। বলা যায় এক ধরনের বাধ্য হয়েই তাদের এগুলো কিনে খেতে হচ্ছে। তৃতীয়ত একটা সময় পর ক্রেতারা অনেক ক্ষেত্রেই কোনো কোনো ফল বা পণ্যদ্রব্য কিন্তু কেনা বন্ধ করে দেয়। যেমন আমি বাউকুলের কথা উল্লেখ করলাম। আবার জার-এ ভর্তি কথিত বিশুদ্ধ পানি মানুষ প্রথম অবস্থায় কিনে পান করেছে; এখন কিন্তু সচরাচর জারভর্তি পানি বিশেষ করে সচেতন মহল কিনে আর পান করছে না। কারণ জারভর্তি পানির ওপর মানুষের আস্থা আর নেই।

হালখাতা

ভোক্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন করি; সেটা হল বালি দিয়ে ভাজা মুড়ির দাম প্রতি কেজি ৮০ টাকা অন্যদিকে মেশিনে ভাজা ইউরিয়া সার ও অন্যান্য ক্যামিক্যাল মেশানো মুড়ির দাম প্রতি কেজি ৪০ বা ৫০ টাকা। অধিকাংশ ক্রেতা কিন্তু দাম কম হওয়ার কারণে বিষাক্ত মুড়িই ক্রয় করছেন এবং খাচ্ছেন। এর সমাধান কী?

শাইখ সিরাজ

এর কারণ দু'টো। প্রথমত বিষযুক্ত মুড়ি দামে সস্তা এবং দ্বিতীয়ত এগুলো দেখতে বেশি ঝকঝকে এবং দৃশ্যগতভাবে পরিমাণে বেশি পাওয়া যায়। তাই ক্রেতারা এই মুড়ি ক্ষতিকর এ-কথা জানা সত্ত্বেও বিষযুক্ত এই মুড়িকেই এখনো প্রাধান্য দিয়ে কিনে খাচ্ছেন; জানি না, হয়তো ভবিষ্যতে এই মুড়িকেও তারা বয়কট করতে পারেন।

পাশাপাশি আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা আমি তুলে ধরছি, সেটা আখের গুড়ের বিষয়টি; ক্ষেত থেকে আখ কেটে আনার সময় আখের শরীরে অনেক কাদা-ময়লা থাকে, সেই কাদা-ময়লা পরিষ্কার না করেই মেশিনে রস তৈরি করা হয় এবং সেই ময়লাযুক্ত রস দিয়ে তৈরি হয় গুড়; স্বাভাবিকভাবেই ময়লাযুক্ত গুড়ের রঙ কালো হয়; সেই কালো গুড় ক্রেতারা কিনতে আগ্রহী হয় না, আর কোনো ক্রেতা সেগুলো কিনতে চাইলেও অতি কম দামে কিনতে চায়। অন্যদিকে ময়লাযুক্ত রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির সময় রসের মধ্যে কেজি কেজি কাপড়-ধোয়া সোডা দিয়ে গুড়কে ঝকঝকে পরিষ্কার করা হয়; দেখা যাচ্ছে সেই পরিষ্কার গুড়ের প্রতিই ক্রেতা বা ভোক্তাদের অধিক ঝোঁক। এখন কথা হল, ক্রেতারা কী করবে? হয় ময়লাযুক্ত কালো রঙের গুড় খেতে হবে অন্যথায় বিষযুক্ত ফর্সা গুড় খেতে হবে।

হালখাতা

কিন্তু এর থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় আমাদের সামনে খোলা আছে?

শাইখ সিরাজ

মুক্তির উপায়ের কথা বললে সবার আগে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মুক্তির কথা চলে আসে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনো উচ্চ আসন করে নিতে পারেনি, পরিচ্ছন্ন জবাবদিহিতার আসনে রাজনীতি পৌঁছতে পারেনি; তার বিরূপ প্রভাব সব ক্ষেত্রেই পড়ছে– ফলে খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে যে বিষ ঢালাওভাবে মেশানো হচ্ছে এবং সেটা বন্ধ

করার কোনো সুখবর আমাদের কাছে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি উচ্চ আসনে পৌঁছতে না পারার কারণে এর প্রভাব প্রশাসন, ক্যামিক্যাল আমদানিকারক, সকল পণ্যের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী এবং ভোক্তার মানসিকতার ওপর গিয়ে পড়ছে। সর্বগ্রাসী ভেজাল ও বিষক্রিয়ার এটি হল প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়ত এই চলমান বাস্তবতার মধ্যে থেকেও যদি আমরা এই ধ্বংসের পথ থেকে মুক্তির কথা ভাবি; তাহলে সবার আগে ক্রেতা ও ভোক্তাসমাজকে সচেতন করতে হবে বিভিন্ন রকম প্রচারণার মাধ্যমে। সচেতনামূলক এই প্রচার কাজে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং বিভিন্ন সংগঠন বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। ক্রেতামহল যদি একবার জেনে যায় কোন খাদ্য বা পণ্যে কী ধরনের ক্যামিক্যাল মেশানো হয় এবং কোন ক্যামিক্যাল খেলে কী ধরনের ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে– তাহলে ক্রেতা বিষযুক্ত সব ধরনের খাদ্য ও পণ্য কেনা থেকে বিরত থাববে এবং এতে করে পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষ মেশানো বন্ধ হওয়া শুরু হবে।

ভেজাল ও বিষক্রিয়াকে আইনের দৃষ্টিতে চরম অপরাধমূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে ভোক্তা-অধিকার আইন এবং সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ অর্থাৎ অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিতকরণ যতদিন-না আমাদের দেশে হবে, ততদিন এগুলো চলতেই থাকবে। কাজেই এই কাজগুলো হওয়ার লক্ষ্যে শেষপর্যন্ত আগ্রাসী অতি ও দ্রুত মুনাফাভিত্তিক ব্যবসায়িক ধারার এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন হওয়া জরুরি কাজ। কারণ প্রচলিত রাজনৈতিক ধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিশ্চয়ই ব্যক্তিগতভাবে হাতেগোনা কয়েক জন সৎ মানুষ আছেন কিন্তু এই হাতেগোনা কয়েক জনের সদিচ্ছা হারিয়ে যায় অধিকাংশ অসৎ এবং অপসংস্কৃতির রাজনীতিকের কর্মকাণ্ডের কাছে। তবে সব মিলিয়ে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হল, জনস্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় সরকার, জাতীয় সংসদ-এর সদিচ্ছাটাই বড় প্রভাব ফেলতে পারে দেশের জনগণের দুর্দশা ঘোচাবার জন্য।

হালখাতা

যে ক্যামিক্যালগুলো মেশানো হয়, সেগুলো তো দেশের বাইরে থেকে আসে; প্রশ্ন হল সেক্ষেত্রে দেশের প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকায় নিশ্চয়ই ভীষণ রকম দুর্বলতা আছে। প্রশাসনিক ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়-দায়িত্বের মধ্যে এই ধরনের দুর্বলতা যে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে আছে, এর থেকে উত্তরণের উপায় কী?

শাইখ সিরাজ

যে ক্যামিক্যালগুলো খাদ্য ও অন্য পণ্যদ্রব্যে মেশানো হয় সেগুলোর অধিকাংশই দেশের বাইরে থেকে আসে এবং বাংলাদেশের এক শ্রেণীর অতি-মুনাফালোভী সমাজের কথিত উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়ী মহল এই ক্যামিক্যাল আমদানি করে থাকে। কোনো ছোট দোকানদার বা খুচরা-বিক্রেতার পক্ষে এই কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে টন টন ক্যামিক্যাল আমদানি করা সম্ভব নয়। দেশের প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দেশের এই অতি মুনাফালোভী জনগণের শত্রুদের চেনে না– একথা অবিশ্বাস্য, অবশ্যই তারা চেনে বরং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যোগসাজসেই এই বিষ আমদানি এবং বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই অতি-মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীদের

কোনো আদর্শ নেই; এদের রাজনৈতিক কোনো মতাদর্শ নেই; এরা সবসময় ক্ষমতাশীল দলের ছত্রছায়ায় থেকে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যোগসাজসে এই কাজগুলো করে থাকে। অথচ দেশ পরিচালনার দায়দায়িত্ব যাদের কাঁধে জনগণ তুলে দিয়েছেন সেই জনগণই প্রায় প্রতিটি খাবারের সঙ্গে বিষ খাচ্ছেন; যে বিষ ভক্ষণের বাইরে কিন্তু ঐ সব দস্যু-ব্যবসায়ী এমনকি সরকারের কোনো সদস্যও নেই; অর্থাৎ ঘুরেফিরে সবাই আজ বিষ খাচ্ছেন। তাহলে এই বন্যতা এবং দস্যুতা প্রতিহত করা হচ্ছে না কার স্বার্থে? সরকারে এর প্রতিরোধের উদ্যোগ এতই অপ্রতুল যে, তাতে খাদ্য বা অন্যান্য পণ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া বন্ধের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে না। এখানে থেকে উত্তরণের দু'টি উপায়ই আছে: এক. জনগণকে সচেতন করা এবং দুই. সরকারের মধ্যে এই বিষয়ে সত্যিকার অর্থে তাগিদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে চাপ প্রয়োগ করা।

হালখাতা

ভেজাল-বিরোধী অভিযান চলাকালে প্রায় সময়ই দেখা যায় দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যে পরিমাণ অর্থ জরিমানা করা হয় সেটা এতই কম বা নগণ্য যে, ঐ পরিমাণ জরিমানা পরিশোধ করতে ভেজালকারীর কোনোই বেগ পেতে হয় না; ফলে ঐ পরিমাণ জরিমানা পরিশোধ করে সে ঠিকই পূর্বের মতোই ভেজাল মেশানোর কাজটি করে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, অপরাধের তুলনায় এই জরিমানা বা শাস্তি এত কম হয় কেন, এটা কি আইনের দুর্বলতা?

শাইখ সিরাজ

খাদ্যে ভেজাল এবং বিষক্রিয়া; আমাদের দেশের মতো করে উন্নত কোনো দেশে চিন্তাই করা যায় না; সেখানে আমাদের দেশে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যেই ভেজাল ও বিষক্রিয়া রয়েছে। চাল-ডাল-আটা, মাছ-মাংস, শাক-সবজি, ফল-মূল, ঔষধপত্র– যা কিছুর কথা বলি না কেন, প্রায় প্রতিটি খাদ্য এবং পণ্যেই ভেজাল এবং বিষক্রিয়া রয়েছে; সেখানে বিচ্ছিন্ন দু'একটি ভেজাল-বিরোধী অভিযান চালিয়ে কী ফল হবে? এ ধরনের অভিযান চালিয়ে কাজ হত যদি অধিকাংশ খাদ্য ও পণ্য নির্ভেজাল থাকত এবং দু-একটি খাদ্য বা পণ্যে ভেজাল থাকত, তাহলে এই ধরনের অভিজানের প্রাসঙ্গিকতা থাকত এবং তাতে এক ধরনের সুফল বয়ে আসত। কিন্তু যেখানে সারাদেশ ভেজালে নিমজ্জিত হয়ে আছে, সেখানে প্রতিকারের এই ধরনের অপ্রতুল ব্যবস্থা কোনো আশার সৃষ্টি করে না; বরং দিন দিন আমাদের– এদেশের সচেতন মানুষদের আতঙ্কিত করে তুলছে।

সমস্ত শরীর যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে আছে তখন টোটকা চিকিৎসার ওপর নির্ভর করে বসে আছি আমরা। আমাদের এই মুহূর্তে চিকিৎসা ছড়িয়ে দিতে হবে সারা শরীরে এবং সেটা হতে হবে অবশ্যই অতি উন্নত মানের, অত্যাধুনিক ও কালোপযোগী।

খুবই দুঃখজনক যে, এ ব্যাপারে আমাদের যুগোপযোগী আইন ছিল যা অনেক দেরিতে প্রণীত হলেও এর প্রয়োগ অপ্রতুল। সেই আইন যে আরো বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন তা নিয়ে ভাববার এবং গবেষণা করবার যেন মানুষ নেই। আমি বলব যে বিশাল দৈত্যের সমান অবয়ব নিয়ে সমস্যা বা ব্যাধিটি আমাদের সামনে হাজির হয়েছে;

সেই দৈত্যকে হত্যা করবার জন্য, পরাজিত করবার জন্য জনসচেতনতা ও আইনের যথার্থ প্রয়োগ প্রয়োজন।

হালখাতা

আমরা যে শাকসবজি খাচ্ছি, আপনার প্রতিবেদনগুলোতে দেখেছি, সেগুলোও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষকিকর। কারণ, সেগুলো বিষে ভরা। আপনি কি বলবেন যে, প্রতি বছর কী পরিমাণ কীটনাশক বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানি করা হয়?

শাইখ সিরাজ

প্রতি বছর বিদেশ থেকে বাংলাদেশে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টন কীটনাশক আমদানি করা হয়, যার আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। বুঝতেই পারছেন, এই পরিমাণ কীটনাশক এইটুকু ছোট্ট একটি দেশে নানাভাবে প্রয়োগ করা হয়। যার একটা সাইড-এফেক্ট তো নিশ্চয়ই হবে। এর প্রভাব হিসেবে কান্সার, শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রদাহ, চর্মরোগসহ অনেক কঠিন রোগব্যাধি এখন ঘরে ঘরে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কল্পনাও করতে পারি না এই দেশের ভবিষ্যৎ তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণভাবে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ রয়েছে। পৃথিবীর কোথাও কোনো দেশে এইভাবে যত্রতত্র নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিষ প্রয়োগ করা হয় না। তাহলে বাংলাদেশে হচ্ছে কেন? আমাদের জাতীয় জীবনে সত্যি একটা বড় প্রশ্ন, এটা দেখবার, নিয়ন্ত্রণ করবার কি তাহলে কেউ নেই!

হালখাতা

যে-বিষয়ের ওপর হালখাতা আপনার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, সে-বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও, ভিন্ন ধরনের একটি প্রশ্ন আপনাকে করছি; সেটা হল, আপনি "চ্যানেল আই"-এর পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম, অন্যদিকে আপনাদের আরেকজন অন্যতম পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর একজন উল্লেখযোগ্য শিশু-সাহিত্যিক; প্রশ্ন হল চ্যানেল আই কর্তৃক সম্প্রচারিত "ক্ষুদে গানরাজ" নামক অনুষ্ঠানটিতে শিশুদের দিয়ে যে-ধরনের বয়স্কদের উপযোগী গান গাওয়ানো হয়েছিল, সেটা কী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা হয়েছিল, পাঠকের উদ্দেশ্যে বলবেন কি? "ভ্রমর কইও গিয়া" কিংবা "বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পেলাম না"– ইত্যাদি ধরনের গান কি ঐ-বয়সী শিশুদের চিন্তাজগৎ, মনোজগৎ বা কল্পনাজগতের সঙ্গে যায়? এ-বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা কী?

শাইখ সিরাজ

ষাটের দশকে যে-সব বিখ্যাত গান রচিত হয়েছিল এবং গাওয়া হয়েছিল, আমরা "ক্ষুদে গানরাজ" অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সেই গানগুলোকে আবার নতুন করে তুলে আনতে চেয়েছিলাম। আমরা ঐ অনুষ্ঠানটি প্রচারের পর থেকেই পুরনো সেই গানগুলো আবার নতুন করে মানুষের মুখে মুখে বাজতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, আমাদের অনুসরণ করে অন্য কয়েকটি চ্যানেলও বাচ্চাদের দিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করতে শুরু করেছিল।

হালখাতা

আচ্ছা মূল প্রসঙ্গে আসি। মিডিয়ার নির্বাহী হিসেবে আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন না-করলেই নয়; সেটা হল, ছানার পানিতে ক্যামিকেল মিশিয়ে দুধ তৈরি করা কিংবা প্রকাশ্যে অপরিপক্ষ কলায় কার্বাইড স্প্রে করা কিংবা বিভিন্ন খাবারের মধ্যে কাপড়ের রঙ মেশানো– ইত্যাদি বিষয়ে সচিত্র সংবাদ আমরা প্রায়ই টিভিতে দেখে থাকি, কিন্তু এরপর এরূপ প্রতিটি ঘটনা কোন্ দিকে যায়– সেটা আমরা সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারি না; প্রশ্ন হল, অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মিডিয়ার মাধ্যমে এ-ধরনের সংবাদের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ পরবর্তী পরিণতিসমূহ কি কোনো উপায়েই জানানো সম্ভব নয়?

শাইখ সিরাজ

এটা ঠিক যে আমাদের মিডিয়াগুলো কখনোই "ফলো-আপ রিপোর্ট" করে না। অর্থাৎ খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়াসহ যে-কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে তার শেষ পরিণতি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লেগে থেকে লাগাতার সংবাদ পরিবেশন করে না। আমাদের সংবাদ-জগতের এটি একটি বড় ধরনের দুর্বলতা। কিন্তু সংঘটিত এ ধরনের অপরাধের ধারাবাহিক সংবাদ যদি পরিবেশন করা যেত তাহলে দর্শক বা শ্রোতা, সরকারের প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সবাই পুরো ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারত। তাতে করে একদিকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেত, অন্যদিকে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের দায়িত্বশীল লোকজনদের মধ্যে তৎপর থাকার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হত। এতে করে নিশ্চয়ই একটি দীর্ঘমেয়াদি সুফল আমরা পেতাম।

হালখাতা

কিন্তু প্রশ্ন হল এধরনের "ফলো-আপ রিপোর্ট" মিডিয়াগুলো প্রচার বা প্রকাশ করে না কেন?

শাইখ সিরাজ

আমাদের মিডিয়াগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যবসা করা। সে ক্ষেত্রে ব্যয় যত কমিয়ে আনা সম্ভব ব্যবসার আয় তত বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। ধরা যাক খাদ্যে ভেজাল মেশানোর মতো কোনো একটি বিশেষ অপরাধ সংঘটিত হলে, এর শুরু থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত লেগে থেকে ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রচার বা প্রকাশ করতে গেলে যে আর্থিক ব্যয় হবে সেটা কিন্তু আমাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠানগুলো বহন করতে এখনো পর্যন্ত পারছে না। তবে মাঝেমধ্যে হয়তো এক-আধটি সংবাদের ক্ষেত্রে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখানোর চেষ্টা হয়ে থাকে। এ বিষয়টি অন্তত চ্যানেল আইয়ের ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে হলেও দেখা যায়। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের 'ফলো-আপ রিপোর্ট' যাতে বেশি বেশি করে প্রচার করা যায় সেদিকে আমাদের মিডিয়াগুলোর আরো বেশি বেশি মনোনিবেশ করা প্রয়োজন বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। সেটা দু'উপায়ে হতে পারে; প্রথমত মুনাফা কম করে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং দ্বিতীয়ত বিশেষভাবে সাহসী, প্রতিশ্রুতিশীল এবং পরিশ্রমী সংবাদকর্মী নির্বাচন

করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা, যিনি এ পেশাটি গ্রহণ করবেন সংবাদ পরিবেশনের বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে তার ভালো-মন্দের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে।

হালখাতা

অপরিপক্ক কলায় কার্বাইড স্প্রে করে পাকানো হচ্ছে, ছানার পানির সঙ্গে ক্যামিক্যাল মিশিয়ে দুধ তৈরি করা হচ্ছে, মাছে ফরমালিন দেয়া হচ্ছে– এরকম শত ঘটনা তো প্রকাশ্যেই ঘটছে; সেসব বিষয় মিডিয়াতে সচিত্র প্রচার করাও হচ্ছে কিন্তু ভোক্তাদের মধ্যেও তো এ-নিয়ে তেমন কোনো উদ্বেগ, ক্ষোভ বা বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ কী?

শাইখ সিরাজ

ক্রেতা বা ভোক্তাদের মধ্যে তাদের মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণগুলো নানাভাবে কাজ করে; যেমন মুড়িতে ইউরিয়া সার দেয়া হয় তা জানা সত্ত্বেও মানুষ সেটা কিনে খায় কারণ এ ধরনের প্রতি কেজি মুড়ির মূল্য ৪০ টাকা। পক্ষান্তরে ইউরিয়ামুক্ত বালু দিয়ে ভাজা প্রতি কেজি মুড়ির মূল্য ৮০ টাকা। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল; এসকল দুর্বল বা দরিদ্র জনগোষ্ঠির কাছে অর্ধেক মূল্যে কিনতে পাওয়া মুড়ি ইউরিয়ার মতো রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো কিনা, সেটা তার শরীরের জন্যে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর কিনা– এসব প্রশ্ন তুচ্ছ বিষয়ে পর্যবসিত হয়।

আরেকদিকে আমাদের দেশের প্রায় সকল মানুষের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে তারা বালুতে ভাজা মুড়ির তুলনায় ইউরিয়াযুক্ত মুড়ি দেখতে অধিক ঝকঝকে বলে সেটা বেশি পছন্দ করে। আবার মাছে ফরমালিন দেয়া হয়েছে তা জানা সত্ত্বেও অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাছিমুক্ত, গন্ধমুক্ত মাছ কিনে খেতেই তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আবার গুঁড়া মরিচ ও হলুদের ক্ষেত্রে পেপরিকা ও মেটালিন ইয়োলো মেশানোগুলো অধিক ঝকঝকে রঙিন ও ঝাঁঝালো হয় বলে ক্রেতাসাধারণ হলুদ-মরিচের গুঁড়ার তুলনায় ক্যামিক্যালযুক্তগুলোই বেশি পছন্দ করে।

এরকম টমেটো ও অন্যান্য শাক-সব্জি, ফলমূল, কলা, সেমাই, জুস, তরল ও গুঁড়ো দুধ, কসমেটিকস, ঔষধপত্র ইত্যাদিসহ প্রায় সকল খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়াযুক্ত খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যই অধিকাংশ মানুষ বুঝে বা না-বুঝে কিংবা কেউ কেউ জানা সত্ত্বেও, আবার কেউ কেউ না-জেনে ক্রয় করে খাচ্ছে বা ব্যবহার করছে। সাধারণ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এই প্রবণতাগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে দুটো বিষয় বেরিয়ে আসে; প্রথমত: তারা তাৎক্ষণিক সৌন্দর্য বা ঝকঝকে দ্রব্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছে; দ্বিতীয়ত: এই ঝুঁকে পড়ার পেছনে প্রধান কারণ হল এরা হয়তো কোন দ্রব্যে কী মেশান হয় তা সুনির্দিষ্ট না জানলেও নানা দ্রব্যের মধ্যে যে ক্যামিকেল মেশান হয় সেটা তারা জানার পরেও সেসব দ্রব্য ক্রয় থেকে বিরত থাকতে পারছে না সাধারণ

মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্যাকে তুলে ধরতে পারছে না এবং কোনো প্রতিরোধও গড়ে তোলার মতো অবস্থা তাদের নেই। ফলে তারা নিরূপায় হয়েই এসব পণ্য কিনতে বাধ্য হয়।

হালখাতা

কিন্তু এটা তো পুরো সমাজে ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এখান থেকে উত্তরণের কী উপায় আছে বলে আপনি মনে করেন?

শাইখ সিরাজ

উত্তরণের উপায় নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেটা মোটেও সহজ উপায় নয়। তবে যত জটিল এবং কঠিনই হোক না কেন মানুষ এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ মানুষ হয়তো জানে পণ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া দেয়া হয় কিন্তু এই খাদ্য গ্রহণ ও পণ্য ব্যবহারের ফলে আমাদের যে ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগ হচ্ছে, কিডনি ও বাল্ব বিকল হয়ে যাচ্ছে, হার্টে ও ব্রেইনে মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি হচ্ছে, জটিল সব চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে– এবং এসব যে ভেজাল ও বিষযুক্ত খাদ্য ও পণ্যদ্রব্য ব্যবহারের কারণেই হচ্ছে সেটা তারা ভালোভাবে ওয়াকিবহাল না। সুতরাং সরকার এবং সরকারের বাইরের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির প্রধান কাজই হবে জরুরি ভিত্তিতে এই ভেজাল ও বিষক্রিয়ার চরম ভয়াবহতার দিকগুলো সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা। দ্বিতীয়ত ভেজাল ও বিষক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার মতো যথেষ্ট আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে। এ দুটো কাজ করা গেলে আমার ধারণা এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে আমরা অনেকটা বেরিয়ে আসতে পারব।

হালখাতা

অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও 'হালখাতা'কে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শাইখ সিরাজ

'হালখাতা'কেও আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জনকল্যাণকর এ ধরনের একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ সংখ্যা করার জন্য।

প্র ব ন্ধ

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া এবং এর নানা দিক

মো. রো ক ন - উ দ - দৌ লা

ফরমালিন কী

ফরমালিনের (Formalin) উৎপত্তি মূলত ফরমালডিহাইড (Formaldehyde) হতে, আবার এই ফরমালডিহাইড-এর সৃষ্টি হচ্ছে অবিভক্ত এলডিহাইড (Aldehyde) হতে, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন-এর সমন্বয়ে একটি যৌথ গ্যাস, যাতে শ্বাসরোধক গন্ধ কঠিনভাবে বিদ্যমান।[১] সংগত কারণে ফরমালিন প্রসংগে আলোচনা করতে হলে ফরমাল ডিহাইড সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। ফরমালডিহাইড হচ্ছে $H_2C=O$ ফরমুলার যৌগ উপাদান (Organiz Compound)। নির্ভেজাল ফরমালডিহাইড রং-বিহীন বিষাক্ত গ্যাস এবং তীব্র গন্ধযুক্ত। এর স্ফুটনাংক ২১° সেলসিয়াস এবং গলনাংক ৯২°। মিথানল গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা অন্যান্য হাইড্রোকার্বন-এর রাসায়নিক সংযোগে বাণিজ্যিকভাবে ফরমালডিহাইড প্রস্তুত করা হয়।[২] বস্তুত এলডিহাইড-এর একটা যৌগ উপাদানকে ফরমালডিহাইড HCHO বলা হয়, যা গঠিত হয় তখন, যখন প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যালকোহল (alcohol) বিলুপ্ত হয়ে ২টা এটম ও একটা হাইড্রোজেন পরিণত হয়।[৩] আরো স্পষ্ট করে বলা যায় ফরমালডিহাইড হচ্ছে কার্বনের একটা এটম অক্সিজেনের ১টা এটম এবং হাইড্রোজেনের ২ এটম (CH_2O)-এর সমন্বয়ে গঠিত যৌগ উপাদান। এটা পানিতে এবং অ্যালকোহলে দ্রবণীয়।[৪] বিশুদ্ধ ফরমালডিহাইড তীব্র গন্ধযুক্ত দাহ্য (flammable) গ্যাস। মূলত বলা যায় কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে একটা যৌগ উপাদান হচ্ছে ফরমালডিহাইড। রং-বিহীন বিষাক্ত ও শ্বাসরোধকর গন্ধ বিদ্যমান থাকায় এটা অন্যান্য উপাদানের সাথে সংমিশ্রণ এত প্রতিক্রিয়াশীল যে তা নিয়ন্ত্রণ বা প্রয়োগ-ব্যবহার খুবই কঠিন। এই স্পষ্ট গন্ধযুক্ত গ্যাস সম্ভবত প্রকৃতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বহু জীববিজ্ঞানবিদ অনুমান করেন যে বৃক্ষরাজির জীবনযাত্রা শুরু হয় যে ফটোসিনথেসিস (photosynthesis) অর্থাৎ সূর্যের আলোতে এটা শ্বেতসার কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করে এর প্রক্রিয়ায় কার্বনডাই অক্সাইড এবং পানির সংশ্লেষ ঘটে ফরমালডিহাইডের মাধ্যমে।[৫]

ফরমালডিহাইডের ব্যবহার

ফরমালডিহাইড বহু প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হয়। Formaldehyde and ammonia yield mathenamine or hexamethylenetetramine, which is used as urinary antiseptic।[৬] ফরমালডিহাইড এমোনিয়ার সাথে প্রতিক্রিয়ায় white solid hexamine প্রস্তুত করে। ঘনীভূত নাইট্রিক এসিড-এর সংমিশ্রণ করে সৃষ্টি হয় সাইক্লানাইট। (cyclanite-CH_2 NNO)। যার ফলে পানির ভিতরে বিস্ফোরক দ্রব্যের উপাদানে পরিণত হয় এবং যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ডুবোজাহাজ (U-Boats)-এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কার্বোলিক এসিডের সাথে সংমিশ্রণে ফরমালডিহাইড অতি সুপরিচিত উপাদানে পরিণত হয় যা ব্যাপকভাবে প্লাস্টিক ব্যাকেলাইট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফরমালডিহাইড চামড়া পাকাকরণ, রং শিল্পে এবং বহু ড্রাগের সিনথেসিস (synthesis) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৭] বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত ফরমালডিহাইডের প্রায় ৭৫% ব্যবহৃত হয় সিনথেটিক শিল্পে। ফরমালডিহাইড একটা শক্তিশালী Germkiller, এটা ঘরের কক্ষে ব্যাকটেরিয়া ও সংক্রামক জীবানুনাশক গ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।[৮] Bakelite is a special polymer used for coatings and plastic. Many foams, insulation and banding materials also contained formaldehyde.[৯] ফরমাল ডিহাইড শিল্পকারখানার কাঁচামাল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান, যা প্লাস্টিক, বিস্ফোরক দ্রব্য, ড্রাইং অয়েল, ফোমিং উপাদান এবং পোকামাকড় ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হয়। ফরমালডিহাইডের সাথে ফিনাইল সংযোগ করে ব্যাকেলাইট প্রস্তুত হয়, ইউরিয়া সংযোগ করে মোল্ডিং প্লাস্টিক, এমোনিয়া সংযোগ করে মিথাইলিন ট্রেট্রামাইন (Tetramine) যা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১০] তাছাড়া ফরমালডিহাইড উদ্ভিদের কোষের ক্লোরোফিল-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় এবং এটা গাছপালার জীবানুনাশক (Germicide) হিসেবে খুবই কার্যকরী।[১১] ফরমালডিহাইডের সাথে অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে RDX, PETN-এর মতো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।[১২]

ফরমালিন

ফরমালডিহাইড এবং ফরমালিনের যোগসূত্র একই সঙ্গে গাঁথা। ফরমালডিহাইডের বাণিজ্যিক উৎপন্ন দ্রব্য হচ্ছে ফরমালিন।[১৩] ফরমালডিহাইড যখন ৩৭% পানির সাথে দ্রবীভূত করে মজুদ ও ব্যবহার করা হয় তখন তাকে ফরমালিন বলে।[১৪] অন্য অর্থে ফরমালিন হচ্ছে ৪০% ফরমালডিহাইড, ৮% মিথাইল অ্যালকোহল এবং ৫২% পানি সংমিশ্রিত রাসায়নিক উপাদান।[১৫] Formalin may be dehydrated to trioxane, a crystalline trimer or to an amorphous polymer, paraformaldehyde, which is convenient source of gaseous formaldehyde।[১৬] এই ফরমালডিহাইড পানির সাথে সংমিশ্রণ করে তরল আকারে ফরমালিন রূপে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করা হয়।[১৭] Although formaldehyde is actually a gas at room temperature, most people who have worked with formaldehyde have used it in a diluted liquid solution called formalin.[১৮] এটা সাধারণত পানিতে

দ্রবীভূত করে ব্যবহৃত হয়। তখন ৩৭% ফরমালডিহাইডের বিদ্যমান থাকাকে ফরমালিন বলে।

ফরমালিন-এর ব্যবহার

ফরমালিন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জীবাণুনাশক ও পচনরোধক এবং মৃত ব্যক্তির লাশ বা মৃত জীবজন্তুর দেহ সংরক্ষণের কাজে এটা ব্যবহৃত হয়।[১৯] অধিকন্তু কৃষিকাজে, বীজ ও মাটিতে কোনো কোনো সময় জীবাণুরোধে ও চারাগাছের রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এমব্লেমিং ফ্লুইড প্রস্তুতে এবং জীবনমুনা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।[২০] ঘরের কক্ষে ব্যাক্টেরিয়া ও সংক্রামণ জীবানুনাশক গ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত ফরমালডিহাইডকে পানিতে মিশিয়ে ফরমালিন প্রস্তুত করে স্ক্যাব (Scab) স্মাট (antiseptic) এবং অন্যান্য ফাঙ্গাস রোগব্যাধি হতে মুক্ত রাখার জন্য গোলআলু, যব, গম, ইত্যাদি বীজ বা চারাগাছে ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।[২১] ফরমালিন এন্টিসেপ্টিক (antiseptic) হিসেবে খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।[২২] অতীতে সকল বায়োলজি ল্যাবে ফরমালিন ব্যাপকভাবে সবক্ষেত্রে সব সময় ব্যবহার করা হত।[২৩] অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন যে, বিভিন্ন জিওলজিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল প্রজাতি সংরক্ষণে যেমন মৃত মাছ, পোকামাকড় ও প্রাণী সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহৃত হয় (দৈনিক যুগান্তর ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা-১০)।

ফরমালিন অপব্যবহারে ক্ষতিকর দিক ও নিষিদ্ধ ঘোষণা

ফরমালিন একসময়ে খাদ্য সংরক্ষণের উপাদান (food preservative) হিসেবে ব্যবহৃত হত।[২৪] যদিও অতীতে জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল বস্তু, মৃত জীবজন্তুর সংরক্ষণ ও বায়োলজি ল্যাবে ব্যাপকভাবে ফরমালিন ব্যবহার করা হত কিন্তু সাম্প্রতিককালের গবেষণায় এটা ক্যান্সার উৎপাদনকারী ক্ষতিকর উপাদান (hazardous caricinogen) হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে ফরমালিন ব্যবহার অনেক হ্রাস পেয়েছে।[২৫] খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন ব্যবহার পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২৬] উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৬ সালে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।[২৭] বাংলাদেশে ২০০৫ সনে ১৯৫৯ সনের বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ সংশোধন করে ৬(A) (a) ধারা সংযোগ করে অন্যান্য ক্ষতিকর রঙ ও কেমিক্যাল-এর পাশাপাশি বিষাক্ত ফরমালিন খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় এবং ৪৪/৬(এ) ধারার বিধান মোতাবেক প্রথমবার অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড এবং দ্বিতীয়বার বা পুনরায় অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- টাকা জরিমানা এবং তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং সেই সাথে দোকান-ফ্যাক্টরি মেশিনপত্র সহ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার বিধান করা হয়।[২৮] থাইল্যান্ডে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন নিষিদ্ধ করা হয় কয়েক বছর আগে।[২৯] ফরমালিন বিষাক্ত এবং খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের উপাদান হিসেবে এটা ব্যবহার করা উচিত নয়।[৩০] এর বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তির নাক, চোখ এমনকি চামড়া, ঝিল্লিতে অসহ্য জ্বালাপোড়া, যন্ত্রণা।[৩১] বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ফরমালিন মানুষের পেটে গেলে

যকৃত, কিডনির ক্ষতি হয়। দীর্ঘদিন এটা চলতে থাকলে এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে। গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য এই আশঙ্কা অনেক বেশি। অধ্যাপক আ. ব. ম. ফারুক বলেন– যকৃত মানবদেহের অপ্রয়োজনীয় আমিষ, স্নেহপদার্থ ও শর্করা দূর করে। কিন্তু ফরমালিনযুক্ত কোনো কিছু যকৃত দূর করতে পারে না। এতে যকৃতে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ মেয়াদে এর প্রভাবে লিভার সিরোসিস এবং শেষ পর্যায়ে ক্যান্সারও হতে পারে। ফরমালিন কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষত গর্ভবতী মা, গর্ভের শিশু, ছোট শিশু, হাঁপানি রোগী এবং এলার্জি রোগীদের জন্য ফরমালিন বিশেষভাবে বিপদজনক। ফরমালিনের ঝাঁঝালো গন্ধে ফুসফুসের টিস্যুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফরমালিনের প্রভাবে হাঁপানি হতে পারে। আরো হতে পারে "ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমুনারি ডিজিজ (সিওপিডি)"। এই রোগে রোগী নিঃশ্বাস নিয়ে তৃপ্ত হন না।[৩২] বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় মৎস্য উপদেষ্টা ড. সি.এস. করিম বলেছেন– মাছে ফরমালিন মেশানোর কারণে জনস্বাস্থ্য ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। এ ধরনের মাছ খেয়ে নতুন প্রজন্ম ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে।[৩৩] নিয়মিত ফরমালিন মেশানো মাছ খেলে গ্যাস্ট্রিক ও আলসার হতে পারে। যকৃত পচে যেতে পারে। লিভার সিরোসিস রোগের উদ্ভব হতে পারে। হজমক্ষমতা হ্রাস ও কিডনি অকেজো হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। গর্ভবতী মায়েদের সন্তান-বিকলাঙ্গতা দেখা দিতে পারে। অস্থিমজ্জায় রক্তকণিকার গঠনেও ত্রুটি দেখা দিতে পারে। যারা খাবারে ফরমালিন মেশায় তারাও নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, হাঁপানি, এমনকি ফুসফুসে ক্যান্সারও হতে পারে। এছাড়া ফরমালিনের প্রভাবে চোখের কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে।[৩৪] ফরমালিনের প্রভাবে মানুষের যে কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।[৩৫] ফরমালিনের মাছ খেয়ে মানুষ ব্রেন ও হার্টস্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন। অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন যে ফরমালিন মেশানো খাবার খেলে তা শরীরের ডি.এন.এ.-এর সঙ্গে শরীরের প্রধান প্রধান অনুষঙ্গের সাথে বিক্রিয়া করে। ফলে অত্যন্ত বিষাক্ত নতুন এক যৌগের সৃষ্টি হয়। যা বায়োলজিক্যালি প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রান্ত করতে পারে।[৩৬] যারা হাত দিয়ে মাছে ফরমালিন ব্যবহার করছে, তাদের হাত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা আমার নিজের চোখে দেখা।[৩৭] বিশেষজ্ঞদের মতে ফরমালিন এমন এক বিষাক্ত উপাদান যা কোনো ক্রমেই শোধন করা সম্ভব নয়।[৩৮] যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে ভেজাল খাদ্য গ্রহণের বর্তমান অবস্থা বিদ্যমান থাকলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০২৫ সাল নাগাদ কিডনি রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়বে।[৩৯] সুতরাং দেখা যাচ্ছে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিনের অপব্যবহারে এর ক্ষতিকর দিক খুবই ভয়ংকর এবং মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থে এটা বন্ধ করা প্রয়োজন।

ভেজাল প্রতিরোধে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন-কানুনসমূহ

অনেকের মতে বাংলাদেশের মতো এত বেশি আইন-কানুন পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে আর নেই। একথার সত্যতা যাচাই করতে হলে অনেক গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমি মনে করি আমাদের দেশে প্রচুর আইন (Laws), অ্যাক্টস (Acts), অধ্যাদেশ (Ordinances), মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ (President order), বিধি বিধান (Rules), বিদ্যমান। প্রয়োজন শুধু এসব বিদ্যমান আইন-কানুনসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। প্রচলিত আইন-কানুন ও নিয়মনীতিসমূহ সততা, আন্তরিকতা, নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হলে আমাদের সার্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে বাধ্য। সাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ যথার্থই বলেছেন, আইন প্রণয়নের চেয়ে আইনের প্রয়োগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক আইন রয়েছে যেগুলোর কোনো প্রয়োগ নেই। অনেক রয়েছে যেগুলোর অপপ্রয়োগ হচ্ছে। (দৈনিক ইনকিলাব-২১ মার্চ, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১২)। তেমনিভাবে খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, প্রসাধনসামগ্রীসহ যা কিছু নকল ও ভেজাল প্রতিরোধে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আইন-কানুন বিদ্যমান। প্রয়োজন শুধু এসব সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা।

১. বাংলাদেশ দণ্ডবিধি

খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল প্রতিরোধে আমাদের সবচেয়ে পুরাতন আইন ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি। দণ্ডবিধি ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬ ধারায় এই বিষয়ে শাস্তির বিধান করা আছে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

দণ্ডবিধি-২৭২ ধারা– "বিক্রয়ের জন্য অভিপ্রেত লক্ষ্য বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মেশান": যে ব্যক্তি কোনো দ্রব্যকে খাদ্য বা পানীয় হিসেবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা উহা খাদ্য বা পানীয় হিসেবে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া কোনো খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে এমনভাবে ভেজাল মিশায় যাহাতে অনুরূপ দ্রব্য খাদ্য বা পানীয় হিসেবে ক্ষতিকর হয় সে ব্যক্তি যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে– যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

ব্যাখ্যা– এই ধারা শুধুমাত্র মানুষের ভোগ্যপণ্য খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নয়। অধিকন্তু গবাদিপশুর জন্য ক্ষতিকর খাদ্য সরবরাহকারী ব্যক্তিও অত্র ধারায় সমানভাবে শাস্তি পাবার উপযুক্ত (Penal Law of India– Dr. Hari Singh Gaur, vol-2, পৃষ্ঠা-১৯২৪)

(এই ধারার মূল কথা হিসেবে যা প্রকাশ পায় তা হল খাদ্য হিসেবে অস্বাস্থ্যকর খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের কোনো ধারণার বিষয় নয়– পূর্বোক্ত: পৃষ্ঠা-১৯২৫)

(অধিকতর মুনাফা লাভের জন্য কোনো অক্ষতিকর উপাদান মিশিয়ে ভেজাল করা অত্র ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। যেমন দুধের সাথে বিশুদ্ধ পানি মেশানো। এ-ধরনের

ভেজাল অত্র ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। নিচুমানের খাদ্য বিক্রি করা এই ধারায় অপরাধ নয়। –পূর্বোক্ত– পৃষ্ঠা-১৯২৫)।

তবে আমি মনে করি দুধের সাথে পানি মেশানো এক ধরনের প্রতারণা। এমন প্রতারকদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা হতে পারে। তাছাড়া আজকাল আর দুধের সাথে বিশুদ্ধ পানি মেশানো হয় না। মেশানো হয় খাল-বিল, নদী-নালা, পুকুরের দূষিত পানি, রঙ এবং ফরমালিন (মাসিক 'ইতিহাস অন্বেষা' পত্রিকা)।

অত্র ধারায় কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা বা দণ্ড দান করতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে যে খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মেশানো হয়েছে এবং উক্ত ভেজাল দ্রব্য বিক্রি করা উদ্দেশ্য ছিল এবং উক্ত ভেজাল দ্রব্য খাদ্য বা পানীয় হিসেবে বিক্রি হবে তা নিশ্চিত জানা থাকা বা জ্ঞাত থাকা বাঞ্ছনীয় (Penal Law of India– Dr. Hari Singh Gaur, vol-2, পৃষ্ঠা-১৯২৬)।

এ ধারায় অপরাধ প্রমাণ করার জন্য একজন এনালিস্ট-এর রিপোর্ট যিনি সরকারের এনালাইজার নন কিন্তু পৌরসভার এনালিস্ট তিনি অত্র ধারায় ফৌ.দ.বি. ৫১০ ধারা মোতাবেক আওতায় পড়েন না, যেখানে বলা হয়েছে সরকারের যে কোনো রাসায়নিক পরীক্ষা অথবা সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষকের রিপোর্ট বা মতামত যাহা হিসেবে সঙ্গত হতে পারে (পূর্বোক্ত– পৃ, ১৯২৭ এ.আই.আর ১৯৪৩– পৃ. ৪৪৬)।

দণ্ডবিধি-২৭৩– ক্ষতিকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়

যে ব্যক্তি, খাদ্য বা পানীয় হিসেবে ক্ষতিকর এই কথা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে দ্রব্য ক্ষতিকর হইয়া পড়িয়াছে বা ক্ষতিকর বনিয়াছে বা খাদ্য বা পানীয় রূপে ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে– সে দ্রব্যকে খাদ্য বা পানীয় হিসেবে বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করে, সেই ব্যক্তি যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে– যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে– যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(ব্যাখ্যা– অত্র ধারায় ভেজাল সামগ্রী বা অনুপযুক্ত তা বিক্রি অথবা বিক্রির জন্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এ ধারায় শুধু শাস্তিযোগ্য নয় বরং যেসব টিনজাত খাদ্যদ্রব্য মেয়াদোত্তীর্ণ (by lapse of time) হবার কারণে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় এবং দীর্ঘকাল রেখে দেয়ার কারণে– অথবা দীর্ঘসময় প্রদর্শনের কারণে, অবহেলা বা দূষণ ঘটিয়ে ভোগের অনুপযুক্ত হয় তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ (পূর্বোক্ত– পৃ: ১৯২৭)।

অত্র ধারায় খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য বোঝানোর পাশাপাশি ড্রাগ অথবা প্রস্তুত ঔষধসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত (পূর্বোক্ত– পৃষ্ঠা-১৯২৭)।

অত্র ধারায় শুধু ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ঐসব খাদ্যসামগ্রীও অন্তর্ভুক্ত হবে যা অন্যভাবে ক্ষতিকর অথবা মানুষের ভোগ্য হিসেবে অনুপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়। (পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা– ১৯২৮)।

কোনো নৈশভোজের আয়োজন করা হল, কিন্তু কোনো দাম ধার্য করা হল না বা মূল্য নেয়া হল না তাহলে অত্র ধারায় অপরাধ হবে না (পূর্বোক্ত– পৃষ্ঠা-১৯২৮)। তাহলে কি কোনো লোককে ক্ষতিকর দ্রব্য খাইয়ে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ বা ক্ষতি করলে সে কি

কোনো শাস্তি পাবে না? অবশ্যই পাবে। এক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্য আইন প্রয়োগ করতে হবে। এখানেই ভোক্তা আইনের প্রশ্ন এসে যায়। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ প্রয়োগ প্রমাণ করা যায়।

ক্ষতিকর অথবা ভোগের অনুপযুক্ত খাদ্য বা পানীয় সংক্রান্ত অত্র ধারা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং পশুর জন্য অত্র ধারা প্রযোজ্য (পূর্বোক্ত– পৃষ্ঠা-১৯২৯)। 'Noxious' শব্দের অর্থ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যে কোনো অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য শরীরের জন্য ক্ষতিকর (পূর্বোক্ত– পৃষ্ঠা-ঐ)।

অত্র ধারায় ক্রেতার জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই বলেনি (পূর্বোক্ত– পৃষ্ঠা-ঐ)।

কোনো বিক্রেতা যদি ক্রেতার কাছে ক্ষতিকর খাদ্য বিক্রি করে এবং তা ক্রেতাকে অবহিত করে তথাপি সে অপরাধী হবে কারণ– ক্ষতিকর খাদ্যদ্রব্য দ্বারা একজন ব্যক্তিকে বিষ দেয়া আইনে অনুমতি দেয় না এবং অধিকন্তু এটা আপনা-আপনি এ ব্যক্তি (বিক্রেতা)-র বিরুদ্ধে যাবে। (পূর্বোক্ত)।

দ.বি. ২৭৪ ধারা– ভেষজ পদার্থে ভেজাল মেশান

যে ব্যক্তি কোনো ভেষজ পদার্থ বা প্রস্তুত ঔষধ, কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে উহাতে ভেজাল মিশান হয় নাই বলিয়া বিক্রিত বা ব্যবহৃত হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া উক্ত ভেষজ পদার্থ বা প্রস্তুত ঔষধ এমনভাবে ভেজাল মিশায় যাহাতে অনুরূপ ভেষজ পদার্থ বা প্রস্তুত ঔষধ উপযোগিতা হ্রাস পায় বা উহার কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয় বা ক্ষতিকর হইয়া পড়ে– সে ব্যক্তি যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে –যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ড– যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা– একটা বিশুদ্ধ ঔষধের গুণগত মানের অপরিহার্য হচ্ছে এর ফলপ্রসূতা (efficiency) এবং কোনো ঔষধের মান হ্রাস বা পরিবর্তন করার ভয়ানক পরিণাম হতে পারে যারা তা প্রয়োগ করেন। কঠোর শাস্তির বিধান ও প্রয়োগপূর্বক ঔষধের শুদ্ধতা ও নির্ভেজাল নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব। জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা করা মূলত রাষ্ট্রের দায়িত্ব (Penal Law of India– India Penal code– Dr. Hari singh Gaur– Vol-2-Page-1932) অত্র ধারা সংক্ষিপ্ত বিচারপদ্ধতিতে বিচার্য এবং আলামত ফৌ.দ.বি. ৫২১ ধারায় ক্ষতিকর ও নষ্ট ঔষধ ধ্বংস করে ফেলার আদেশদানে ক্ষমতাবান।

দ.বি. ২৭৫ ধারা– ভেজাল মিশ্রিত ভেষজ পদার্থসমূহ বিক্রয় করা

যে ব্যক্তি কোনো ভেষজ পদার্থ বা প্রস্তুত ঔষধে এমনভাবে ভেজাল মেশান হইয়াছে, যাহাতে উহার উপযোগিতা হ্রাস পায় বা কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয় বা ক্ষতিকর হইয়া পড়ে– এই তথ্য জানিয়া উহা বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে বা প্রদান করে বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উহা ভেষজ মিশ্রিত নহে বলিয়া কোনো ঔষধালয় হইতে ইস্যু করে, কিংবা ভেজাল মিশাইবার কথা জানে না এইরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করায়, সে ব্যক্তি যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ছয়

মাস পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদণ্ডে– যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা– অত্র ধারা সংক্ষিপ্ত বিচারপদ্ধতিতে বিচার্য এবং ক্ষতিকর ঔষধসামগ্রী ফৌ.দ.বি. ৫২১ ধারার বিধান মোতাবেক ধ্বংস করার জন্য আদালত আদেশ দেয়ার জন্য ক্ষমতাবান।

ওখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে ভেজালের মাত্রা এত বেশি যে এই শাস্তি হয়তো অনেকের কাছে খুবই নগণ্য বলে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এটা ১৮৬০ সালের প্রেক্ষিতে বা তারও আগের প্রেক্ষাপটে প্রণীত। তখনকার দিনে ভেজালের ভয়াবহতা বর্তমানের তুলনায় এত বেশি ছিল না। তখনকার দিনে ফরমালিনসহ বিভিন্ন ভয়াবহ ক্ষতিকর রাসায়নিক রঙ ও পদার্থ খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহারের কথা ছিল অজানা। তখনকার প্রেক্ষিতে অপরাধের মাত্রা অনুসারে ছয় মাস কারাদণ্ড ছিল পর্যাপ্ত, যদিও এখনকার অপরাধের মাত্রা অনুসারে এটা হয়তো পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ প্রয়োজন যে, ভেজাল প্রতিরোধে দণ্ড বিধির এই ধারাসমূহ প্রায় প্রয়োগ হত না বললেই চলে। অন্তত পক্ষে আমার চাকরি জীবনের প্রথম ১৪ (চৌদ্দ বছরে) কখনো দণ্ডবিধি ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬ ধারার কোনো মামলা আমি দেখিনি। এই প্রথম (২০০৫ সাল) আমার ম্যাজিস্ট্রেসি চাকরি জীবনের ১৫ (পনের) বছরে পদার্পণ করে সর্বপ্রথম ভেজাল প্রতিরোধে দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রয়োগ করার সুযোগ বা সৌভাগ্য হল। এই সুযোগ প্রথম সৃষ্টি করে দিয়েছেন আমাদের তৎকালীন মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। তিনি ১৪ জুন ২০০৫ খ্রিঃ তারিখে নির্দেশ দেন ঢাকা শহরের সমস্ত ফলের আড়তে মোবাইল কোর্ট করে সকল ক্ষতিকর কেমিক্যাল আটক করার জন্য (ইতিহাস অন্বেষা– ফেব্রুয়ারি-২০০৪)। তাঁর এই নির্দেশের পর তিনি তৎকালীন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জালাল আহমদ ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুমায়েত উল্লাহ দণ্ডবিধির ধারায় মোবাইল কোর্ট ও মামলা করার পরামর্শ দেন। মূলত এ দিন (১৪ জুন, ২০০৫) হতে ভেজাল প্রতিরোধে দণ্ডবিধির ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬ ধারার ব্যাপক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ ধারাগুলোতে শাস্তি কম হলেও আমরা ৬ (ছয়) মাস বা দু'ধারায় মিলে ১ (এক) বছর কারাদণ্ড দেয়ার পর ভেজালকারীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হয় এবং ভেজাল প্রতিরোধ কমে আসে। উদাহরণস্বরূপ কাওরানবাজার ফলের আড়তে প্রথমবার অভিযানে ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহারের জন্য ৭ জনকে অর্থদণ্ড, দ্বিতীয়বার ১৯ জনকে কারাদণ্ড দেয়ার পরে তৃতীয়বার আর কোনো ফলের মধ্যে কেমিক্যাল পাওয়া যায়নি। (ইতিহাস অন্বেষা : মার্চ ২০০৫ সংখ্যা)।

তদ্রূপ হোটেল-রেস্টুরেন্টসহ অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় আমাদের যতটুকু আইন আছে ততটুকু সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে অনেক সুফল ও সাফল্য আসবে এবং পুরো জাতি উপকৃত হবে।

২. খাদ্যদ্রব্য ভেজাল প্রতিরোধে আমাদের দ্বিতীয় আইন ১৯৫৯ সালের বাংলাদেশে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ– সংশোধিত ২০০৫ (ইধহমষধফবংয চঁৎব ঋড়ড়ফ ড়ৎফরহধহপব-অসবহফসবহঃ-২০০৫), ১৯৫৯ সালে প্রণীত বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশে শাস্তির পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। মূল অধ্যাদেশে প্রথমবার অপরাধের জন্য ২০০ (দু'শত) হতে ৮০০ (আটশত) টাকা জরিমানা অথবা তিন মাস হতে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০০ (একশ') হতে ৪০০ (চারশ') টাকা জরিমানা, অথবা ৬ সপ্তাহ হতে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্য ২০০০ টাকা হতে ৪০০০ হাজার টাকা জরিমানা ৬ মাস হতে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দোকান বা কারখানার যন্ত্রপাতিসহ বাজেয়াপ্ত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকা জরিমানা এবং ৩ মাস হতে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড সহ দোকান ও কারখানার যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত। নিঃসন্দেহে এই শাস্তি খুবই সামান্য। তথাপি তারপরও বলতে হয় যে দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড , কারাদণ্ড ও দোকান মেশিনপত্র বাজেয়াপ্ত এটা একই সাথে কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্য এটা একই সাথে প্রয়োগ করার নজির খুব একটা পাওয়া যাবে না। যা হোক, এটা বলা নিস্প্রয়োজন যে ভেজালের মাত্রার আধিক্য এত বেশি যে এই শাস্তি ভেজালের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। ২০০৫ সালে এই আইনটি সংশোধন করে সরকার একটা বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছেন। যা সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে বাংলাদেশে ভেজাল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। (সংসদে আইন পাসের তারিখে বিবিসি-র সাক্ষাৎকার ও ৪-১-২০০৬ তারিখে বিটিভি-র টক শো 'লাল গোলাপ' অনুষ্ঠানে আমার সাক্ষাৎকার)।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ভেজাল-বিরোধী এক আলোচনা সভায় তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া মহোদয়কে বলেছিলাম স্বাধীনতার আগে হতে বিভিন্ন রঙিন আইসক্রিম খেয়ে আসছিলাম, যাতে বস্ত্ররঙ ও চামড়ার রঙ ব্যবহার করে রঙিন করা হত। এতদিন কেউ তা খেয়াল করেননি। তৎকালীন সরকার ভেজাল-বিরোধী মোবাইল কোর্ট করে তা বন্ধ করেছেন।

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ সংশোধন-২০০৫ এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

(ক) ধারা-১ (জ)-তে তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) শব্দের সংযোজন :

(খ) ধারা ২(এ) অনুসারে খাদ্য সরবরাহের প্রতিষ্ঠান (Catring establishment) বলতে যে কোনো হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ক্যাফেটেরিয়া, ক্যান্টিন, দোকান এবং অন্য যেকোনো স্থানে অন্তর্ভুক্ত করে, সেখানে যে কোনো রকমের খাদ্য Supply, Consume সরবরাহ অথবা বিক্রি করা হয়।

(গ) ধারা ৩ (এ) অনুসারে কোর্ট বলতে ৪১ ধারার বিধান মোতাবেক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত (Pure Food Court)-কে বোঝাবে। অর্থাৎ এই আইনে এই প্রথমবারের মতো বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি জেলায় একজন

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেট) বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা মহানগরীতে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত পরিচালনার জন্য আমাকেসহ দশ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে তৎকালীন চিফ মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট জালাল আহমদ সাহেব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটগণ হলেন– জনাব আবদুল্লাহেল বাকী, জনাব মামুন আল-রশীদ, জনাব মো. মিজানুর রহমান, জগন্নাথ দাস (খোকন), জনাব মো. রফিকুল ইসলাম, জনাব আবুল বাশার, মো. আবদুল ফাত্তাহ, জনাব মোহাম্মদ মজিবুল হক, জনাব মো. শামসুল আলম, জনাব এম এ আনামকে নিয়োগ দিয়েছেন।

(ঘ) ধারা ৫ অনুসারে খাদ্য বলতে যেকোনো প্রকারের ভোজ্য তেল, মাছ, ফল, মাংস অথবা শাকসবজি অথবা অন্য যে কোনো রকমের দ্রব্যাদি, যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পানীয় জল অথবা ঔষধ (Drug) ব্যতীত মানুষের ভোগ্য যে কোনো পানীয় এবং আইস (বরফ), বায়বায়িত (wrated) পানি, কার্বনেটেড পানি অথবা যেকোনো বস্তু (substance) যা প্রক্রিয়াজাতকৃত, আধা প্রক্রিয়াজাতকৃত অথবা কাঁচা অথবা যেকোনো বস্তু যা খাদ্য ম্যানুফ্যাকচার, প্রস্তুত অথবা (ট্রিটমেন্ট) treatment এবং এসব সামগ্রী যা সরকার সময় সময় অবহিত করবেন এবং বিজ্ঞপ্তি দেবেন– যেমন খাদ্য প্রস্তুত বা উপাদানে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বা কোনো যন্ত্র অনুমোদিত ফ্লেভার, মসলা (spice) খাদ্যকে সুস্বাদু করার জন্য ব্যবহৃত এবং গুঁড়া মসলা, আচার, চাটনি প্রভৃতি খাদ্যে মানসম্মত রঙ (Food grade colour) সংরক্ষণ প্রক্রিয়া (preservative anti oxidant) এবং অন্যান্য সংযোজন দ্রব্য (additives) যা খাদ্যে ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

(ঙ) ধারা-৪(এ) অনুসারে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে আদালতের সমন্বয়ে দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার উপদেষ্টা পরিষদ (National Food Safety Advisory Council) গঠন করা হয়েছে।

(চ) বিষাক্ত রঙ কেমিক্যাল নিষিদ্ধ করা : ধারা ৬ (এ) অনুসারে বিষাক্ত অথবা বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ (Chemicals), ক্ষতিকর (intoxicated) খাদ্য রঙ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবং সে নিজে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার পক্ষে (a) মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক কোনো বিষাক্ত অথবা বিপজ্জনক কেমিক্যাল অথবা উপাদান (ingredients) অথবা সংযোজন (additives) or (substances) যেমন ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, কীটনাশক ঔষধ, ডিডিটি-পিসিবি তেল ইত্যাদি অথবা ক্ষতিকর খাদ্য রঙ অথবা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো ফ্লেভার ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(ছ) বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা-এর ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্রে ৪১ (১) ধারা অনুসারে সরকার অফিসিয়াল গেজেট জারির মাধ্যমে এক বা একাধিক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত অথবা প্রয়োজন মোতাবেক প্রতি জেলায় এবং প্রতিটা মেট্রোপলিটান এলাকায় এই অধ্যাদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা করবেন।

৪১(২) ধারা অনুসারে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট-এর কর্মকর্তা দ্বারা এই আদালত গঠিত হবে এবং তিনি এই অধ্যাদেশের আওতায় যেকোনো শাস্তির বিধান করতে পারবেন।

(এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৯৮ সালের ফৌ.দ.বি. অনুসারে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার বেশি জরিমানা করতে পারেন না। কিন্তু এই অধ্যাদেশে বর্ণিত তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা অত্র ৪১(২) ধারায় স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

৪১(১) ধারা মোতাবেক সরকার অফিসিয়াল গেজেট জারির মাধ্যমে প্রতিটা আদালতের অধিক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিবেন।

(জ) মামলা আমলে নেয়া (Cognizance of offences)– ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাই থাকুক না কেন, একজন পাবলিক এনালিস্ট, অথবা ইন্সপেক্টর (সেনেটারি ইন্সপেক্টর) অথবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত মামলা আমলে নিবেন না।

(ঝ) বিচারের স্থান– ৪১(বি) ধারা অনুসারে– ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাই থাকুক না কেন (a) বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যে কোনো স্থানে এই অধ্যাদেশের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচার করা যাবে।

(ঞ) আপিল– বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের রায়-এর বিরুদ্ধে দায়রা জজ আদালত অথবা মেট্রোপলিটান দায়রা জজ আদালতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে।

সার্বিক আলোচনায় আমার দৃষ্টিতে খাদ্যদ্রব্য ভেজাল প্রতিরোধে ২০০৫ সালের বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ সংশোধন আইনটি আমাদের জাতীয় জীবনে এক যুগান্তকারী পথ নির্দেশিকাস্বরূপ সম্পূর্ণ আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। এটা অনেকাংশে নিখুঁত ও প্রায় পরিপূর্ণাঙ্গ আইন বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। তৎকালীন সরকারের কিছু জনহিতকর কল্যাণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে এটা আরেকটা বৈপ্লবিক সংযোজন। যা সরকার, দেশ ও জাতিকে আরেক ধাপ সাফল্যের দিকে অগ্রগামী করবে। এখানেই শেষ নয়, এই আইনকে আরো কার্যকরী ও সাফল্য লাভের লক্ষ্যে এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টর-এর সংখ্যা পর্যন্ত না থাকায় সরকার স্থানীয় সরকার বিভাগ (পৌর-১ শাখা) স্মারক নং পৌর-১/ এফ-১৮/ ২০০৮(অংশ-১)/ ২১১৭-তাং ২৫/১০/০৫ প্রজ্ঞাপন অনুসারে The Bangladesh pure food (Amandment) Act-২০০৫-এর যথাযথ ও বহুল প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের জন্য উক্ত আইনের ৪১(এ) ধারার বিধান মতে সিটি কর্পোরেশনের পাবলিক এনালিস্ট, স্বাস্থ্য বিভাগীয় ইন্সপেক্টর, পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বি.এস.টি.আই)-এর ইন্সপেক্টর, মাঠ কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর-এর নিম্নে নহে এরূপ অফিসারগণকে প্রসিকিউটিং অফিসার-এর ক্ষমতা অর্পণ করা হল। নিঃসন্দেহে তৎকালীন সরকারের এ আদেশ ভেজাল প্রতিরোধে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার বহিঃপ্রকাশ।

৩. ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য ঔষধ ও প্রসাধনসামগ্রীতে ভেজাল প্রতিরোধে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী আইন হচ্ছে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন। যদিও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশন বিষয়টির কারণে

এটা বিতর্কিত আইন বলে সমধিক পরিচিত। কিন্তু এ অংশটুকু পরিহার করে যদি ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনকে সৎ ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হত তাহলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশে অনেক অপরাধ, অনাচার, অবিচার হ্রাস পেত। উক্ত আইনে ভেজাল প্রতিরোধের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ভেজাল দেয়া বা ভেজাল খাদ্য, পানীয়, ঔষধ ও প্রসাধনী বিক্রি করার শাস্তি ধারা-২৫-গ

(১) যদি কেউ–

(ক) কোনো খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল দিয়ে তা ভক্ষণ বা পান করার অযোগ্য করে ও তা খাদ্য-পানীয় হিসেবে বিক্রি করতে চায় অথবা তা খাদ্য বা পানীয় হিসেবে বিক্রি হবে বলে জানা সত্ত্বেও অনুরূপ ভেজাল দেয়, অথবা

(খ) কোনো দ্রব্য নষ্ট হয়েছে বা নষ্ট করা হয়েছে বা খাদ্য পানীয় হিসেবে অযোগ্য হয়েছে বলে জানা সত্ত্বেও বা তদ্রূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও অনুরূপ দ্রব্য বিক্রি করে বা বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করে। অথবা

(গ) কোনো ঔষধ বা চিকিৎসার জন্য ব্যবহার্য কোনো দ্রব্য ভেজাল দিয়ে তার ক্রিয়া হ্রাস করে, গুণ পরিবর্তন করে অথবা তা এ উদ্দেশ্যে নষ্ট করে যে, তা খাঁটি হিসেবে বিক্রি হবে বলে জানে অথবা তা বিশ্বাস করার কারণ আছে। অথবা

(ঘ) কোনো ঔষধ বা চিকিৎসার জন্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ক্রিয়া লাঘব বা গুণ পরিবর্তনের জন্যে বা তা নষ্ট করার জন্য ভেজাল দেয়া হয়েছে বলে জানা সত্ত্বেও বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও তা বিক্রি করে। বিক্রির জন্য উপস্থিত করে বা তা খাঁটি হিসেবে কোনো ঔষধালয় হতে বিতরণ করে অথবা যে ব্যক্তি তা ব্যবহার করতে দেয়, অথবা

(ঙ) কোনো ঔষধ বা চিকিৎসাসামগ্রী জ্ঞাতসারে অন্য কোনো ঔষধ বা চিকিৎসাসামগ্রী হিসেবে বিক্রি করে, বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করে বা কোনো ঔষধালয় হতে বিতরণ করে,

তবে সে ব্যক্তি মৃত্যু, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা ১৪ (চৌদ্দ) বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

(২) যদি কেউ–

(ক) মাথার তৈল, গোসলের সাবান বা কোনো প্রসাধন দ্রব্যে এমনভাবে ভেজাল দেয় যাতে তা চুল, ত্বক, গায়ের রঙ বা দেহের কোনো অংশের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এবং তা প্রসাধনী হিসেবে বিক্রি করতে চায় অথবা প্রসাধনী হিসেবে বিক্রি হবে বলে জানা থাকে, অথবা

(খ) কোনো মাথার তৈল, গোসলের সাবান বা অন্য কোনো প্রসাধন দ্রব্য এমনভাবে ভেজাল করা হয়েছে যাতে তা চুল, ত্বক, গায়ের রঙ বা দেহের কোনো অংশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে পড়েছে তা সত্ত্বেও উক্ত দ্রব্য বিক্রি করে বা বিক্রির জন্য উপস্থিত করে।

তবে সে ব্যক্তি ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

বলা নিস্প্রয়োজন, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, প্রসাধনসামগ্রীতে ভেজাল করার দায়ে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিষয়টি কার্যকরী হলে বাংলাদেশে ভেজাল অনেকাংশে কমে যাবে। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইনে ভেজালের জন্য তেমন একটা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

৪। বি.এস.টি.আই অধ্যাদেশ– ১৯৮৫ (The Bangladesh Standard and Testing Institution ordinance 1985)–সংশোধন ২০০৩ সালের ২৭নং আইন) বি.এস.টি.আই-এর আওতাভুক্ত খাদ্য, পানীয় ও প্রসাধনসামগ্রীতে অনুমোদন না থাকা, ট্রেডমার্ক না থাকা, রেজিস্ট্রেশন, গুণগত মান রক্ষা না করা, না থাকা, পরীক্ষা না করা, অনুমোদনবিহীন পণ্যসামগ্রী ভেজাল দেয়া ইত্যাদির জন্য ১৯৮৫ সনের মূল অধ্যাদেশ ৩০(১) ধারায় শাস্তি ছিল ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা পনের হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড , ৩০(২) ধারা অনুসারে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেআইনি সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণ।

৩১ ধারায় ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড , ৩২ ধারায় পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান ছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার (বিশেষত তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী শিল্পমন্ত্রী এম কে আনোয়ার)-এর উদ্যোগে ২০০৩ সনের বি.এস.টি.আই অর্ডিন্যান্সের সংশোধন (২০০৩ সালের ২৭নং আইন) করে এক আমূল পরিবর্তন আনা হয়। ২(জে.জে) ধারা সংশোধন করে বলা হল লেবেল বলতে লিখিত, মুদ্রিত অথবা উৎকীর্ণ (Graphic) যে কোনো উৎপাদন সামগ্রীর উপরের বিষয়কে বোঝায়-এর কন্টেইনার, ট্যাঙ্ক, অথবা উৎপাদন সামগ্রীর বর্ণনা (Literature) অথবা অন্য যথোপযুক্ত (Suitable material) এমনভাবে এখন হতে লাগানো থাকবে যাতে এর পরিচয়, উপাদান, উপকরণ, গুণাগুণ (attributes) ব্যবহার, নির্দেশিকা, সুনির্দিষ্ট ও পুংখানুপুংখ বর্ণনা (ওজন পরিমাণসহ) উৎপাদন তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ উল্লেখ করা।

৩০ ধারায় দু'বছর কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা কিন্তু সাত হাজার টাকার নিচে নয় শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

৩১ ধারায় চার বছর কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা অথবা উভয় দণ্ড পর্যন্ত জরিমানা কিন্তু সাত হাজার টাকার নিচে নয় অথবা উভয় দণ্ড শাস্তি আরোপ করা হয়েছে।

৩১(এ) ধারায় চার বছর কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা জরিমানা কিন্তু সাত হাজার

টাকার নিচে নয় অথবা উভয়দণ্ড ।

৩১(বি) ধারানুসারে পরিদর্শকের সরকারি কাজে বাধা প্রদান অথবা ভুল তথ্য প্রদান-এর অপরাধে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা

জরিমানা শাস্তির বিধান করা হয়েছে ।

৩২ ধারা (২) (জে.জে) ধারায় অন্যান্য অপরাধের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা

শাস্তির বিধান করা হয়েছে ।

৩৩(বি) ধারায় অপরাধমূলক মালামাল বাজেয়াপ্ত করার বিধান করা হয়েছে ।

৩৩(সি) ধারানুসারে মানসম্মত পণ্য পাওয়া না গেলে সে ফ্যাক্টরি, ব্যবসাকেন্দ্র, ইন্ডাস্ট্রি, ওয়্যারহাউজ, গোডাউন অথবা এমন কোনো স্থানে যেখানে পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন, বিক্রি যা মজুত করা নয়, বসতবাড়ি, যদি এর কোনো অংশ বা ব্যবসা-বাণিজ্য, ইন্ডাস্ট্রি, উৎপাদন বা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ততা বিদ্যমান অথবা যানবাহন, নৌকা জাহাজ (vessel) অথবা অন্য কোনো ভাসমান যান ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য করে তা বন্ধ করে দেয়া।

জরিমানা ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান– আমরা যখন (২০০৫ সনে) ভেজালবিরোধী অভিযানে এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা শুরু করি তখন অনেক পদস্থ কর্মকর্তা ও সিনিয়র বিজ্ঞ কৌসুলিরাও বলাবলি করছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট) দশ হাজার টাকার বেশি জরিমানা করতে পারে না– কিভাবে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। এমনকি কোনো একদিন আমার এক মামলায় পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দেখে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে হাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। আবার কেউ-বা মন্তব্য করেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট আইন জানে না। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আসলে এটা কারো দোষ নয়। বি.এস.টি.আই অর্ডিন্যান্স-এর ২০০৩ সালের ১২ জুলাই-এর সংশোধনের কথা তখন অনেকেই জানতেন না বিধায় এমনটি ধারণা করা অস্বাভাবিক নয়। উক্ত অর্ডিন্যান্স এর ৩৩ (ডি) ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– Not with standing anything lontained in section 32 of the code of criminal procedure– 1898 (Act of v of 1898) it shall be lawful for any metropolitan Magistrate or Magistrate of the first class to pass a sentence of fine under this ordinance exceeding ten thousand taka. অর্থাৎ (১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাই থাকুক না কেন এই অধ্যাদেশের আওতায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দশ হাজার টাকার বেশি জরিমানা করা আইনসঙ্গত হবে।)

মূলত এ কারণে ভেজালবিরোধী অভিযানের শুরুতে এই অর্ডিন্যান্স সবচেয়ে বেশি কার্যকরী আইন হিসেবে বিবেচিত ও পরিগণিত হয়েছে। বি.এস.টি.আই অধ্যাদেশ প্রয়োগে পরিদর্শক কে. এম. হানিফ, নাজির আহমেদ মিয়া, রেজাউল হকসহ প্রায় সকলেই আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। যার কারণে তখন ভেজালবিরোধী অভিযানে মোবাইল কোর্টের গতি, প্রকৃতি ও সাফল্য ছিল আশাতীত ও অকল্পনীয়।

তবে সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য ও প্রসাধনী বি.এস.টি.আই-এর আওতাভুক্ত নয়। কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় এর আওতাভুক্ত। ফলে সব ধরনের খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধে বি.এস.টি.আইকে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার বাংলাদেশে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশের ধারায় বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে মামলা দেয়ার

জন্য বি.এস.টি.আই-এর পরিদর্শকের ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। ফলে পূর্বের ঘাটতি তৎকালীন পূর্ণ হয়ে গেছে। যার কারণে এখন যে কোনো ভেজাল খাদ্যদ্রব্য প্রতিরোধে বি.এস.টি.আইকে প্রয়োগ করা সম্ভব। এটাও তৎকালীন সরকারের অতি বড় জনকল্যাণকর পদক্ষেপ এবং যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ও আদেশ।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩– বলা নিষ্প্রয়োজন প্রায় দেড় কোটি লোক অধ্যুষিত ঢাকার কঠিন এই নগরজীবনের সার্বিক কল্যাণে রয়েছে– ১৯৮৩ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ।

১২৪ ধারায় বর্ণিত বিপজ্জনক ও অপরাধমূলক দ্রব্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এবং ১৫০ ধারার তৃতীয় সিডিউল মোতাবেক কর্পোরেশনের অনুমোদন ছাড়া বিপজ্জনক ও অপরাধমূলক ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা কোনো ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক পণ্য মজুত করা বা বহন করা (১৪ উপধারা), পানীয় জলকে ব্যবহারের অনুপযোগী করার জন্য এমন কোনো কাজ করা (১৫ উপধারা), এমন কোনো উৎস হতে পানীয় জল ব্যবহার করা যা জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক এবং যা কর্পোরেশন কর্তৃক নিষিদ্ধ (উপধারা-১৬), সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত কোনো রুগ্ন ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রি করা (উপধারা-৩৫) নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া মাংস বিক্রির জন্য গবাদিপশু জবাই করা (উপধারা-৩৮), গুণমানহীন, উপাদান ও স্বাভাবিকতা বর্জিত কোনো খাদ্য ও পানীয় কোনো ক্রেতার নিকট বিক্রি করা (উপধারা-৩৯) ইত্যাদি অপরাধে ১৫১ (১) ধারা অনুসারে প্রথমবার অপরাধের জন্য দশ হাজার টাকা পর্যন্ত শাস্তি এবং অপরাধটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে প্রথমবার শাস্তি আরোপের পরে প্রতিদিনের জন্যে পাঁচশ টাকা করে জরিমানার বিধান করা হয়েছে।

১৫১(২) ধারা অনুযায়ী একই বিষয়ে দ্বিতীয়বার অপরাধের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান করা হয়েছে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঢাকা সিটি করপোরেশনের সৃষ্টির পর হতে অত্র অধ্যাদেশ এত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয়নি– যা সে সময় (২০০৫-২০০৬) সর্বপ্রথম ব্যাপক ও কঠিনভাবে প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে সে সময় ১২৪ ধারার প্রয়োগ ছিল খুবই লক্ষণীয় এবং এই ধারায় বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হোটেল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে অভিযান চালিয়ে অনেক অনিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়। সিটি করপোরেশন অধ্যাদেশের আওতায় মামলা প্রদানে সাহসী ভূমিকা রাখেন ঢাকা সিটি করপোরেশনের তৎকালীন পরিদর্শক ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ। মোবাইল কোর্টে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও কৃতিত্বপূর্ণ।

ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ– ১৯৮২ (সংশোধন-১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সন) উল্লেখ্য যে, ওজন ও পরিমাপে কম দেয়া অসৎ মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস এবং এটা ভেজালের অন্যতম ভিত্তি। ভ্রাম্যমাণ আদালতে এই বিষয়টাও গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। ১৯৮২ সালের ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ-এর ২৮ ধারা মোতাবেক কেউ ওজনে কম দিলে ৪৫ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রথমবার অপরাধের জন্য দশ হাজার টাকা জরিমানা এবং পরবর্তীকালে অপরাধের জন্য জরিমানাসহ তিন বছর কারাদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৪৬ (এ) ধারা অনুযায়ী কেউ সিল বা

স্ট্যাম্প নকল করলে, নকল সিল দখলে রাখলে, বিক্রি করলে, হস্তান্তর করলে, সিল উঠিয়ে ফেললে বা পরিবর্তন করলে, কোনো সিল উঠিয়ে অন্য কোনো ওজন বা পরিমাপে পুনঃস্থাপন করলে অথবা কাউকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে যে কোনোভাবে ওজন বা পরিমাপ বাড়ালে বা কমালে বা পরিবর্তন করলে উক্ত ব্যক্তির প্রথমবার অপরাধের জন্য কমপক্ষে ছয়মাস ঊর্ধ্বে দুই বছর কারাদণ্ড এবং পরবর্তীকালে পুনরায় অপরাধের জন্য জরিমানাসহ কমপক্ষে এক বছর ঊর্ধ্বে পাঁচ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৭. ড্রাগ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ– ১৯৮২ : অত্র অধ্যাদেশের ৮ ধারা মোতাবেক নিষিদ্ধ ঔষধ তৈরি, ৯ ধারা মোতাবেক আমদানি নিষিদ্ধ ঔষধ, ১০ ধারা অনুযায়ী লাইসেন্সবিহীন ঔষধ প্রস্তুত এবং ১৬ ধারা অনুসারে কেউ যদি তৈরি, আমদানি, বণ্টন বা বিক্রি করে, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন ঔষধ বা নিষিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত করে বা কোনো ভেজাল ঔষধ বিক্রি করে তাহলে শাস্তি দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা দু'লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং ড্রাগ কোর্ট ঔষধ বা ড্রাগ তৈরিতে সরঞ্জাম সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন।

১৭ ধারা মতে, নিম্নমানের ঔষধ তৈরি বা বিক্রির জন্য ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড ।

১৮ ধারা অনুসারে লাইসেন্স ছাড়া কোনো ঔষধ আমদানি করলে তিন বছর কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ।

১৯ ধারা অনুসারে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে উচ্চ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করলে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড ।

২০ ধারা অনুসারে সরকারি স্টোর, হাসপাতাল, ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোনো ঔষধ বিক্রি করলে বা চুরি করলে বা ড্রাগ বিক্রি করার জন্য নিজ দখলে রাখলে দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা দু'লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড ।

২১ ধারা অনুসারে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার করলে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা দু'লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৮. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫৬-এর ২ ধারা মোতাবেক অন্যান্য দ্রব্যাদির সাথে খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র, শিশুখাদ্য, ভোজ্য তেল ইত্যাদি সামগ্রী উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিলিবণ্টন, বিক্রয়, ব্যবহার ও মজুদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সরকার করবেন এবং কেউ এটা অমান্য করলে ৬ ধারা অনুযায়ী দোষী ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৯. অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ আদেশ-১৯৮১ এর তফসিল অনুযায়ী অন্যান্য দ্রব্যাদির সাথে ড্রাগ ও মেডিসিন, সাবান, ভোজ্য তেল, সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, ভেজিটেবল ঘি, ডাল, পেঁয়াজ, মরিচ, দুগ্ধখাদ্য, লবণ, আটা, ঔষধের কাঁচামাল, নারিকেল তেল, চিনি ইত্যাদির বিষয়ে ৪ ধারা মোতাবেক সরকার

সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন। মজুদ যাচাই করবেন, ডকুমেন্ট তলব করতে পারবেন। ৬ ধারা মোতাবেক কোনো মজুতদার বিক্রয়ের জন্য অস্বীকার করতে পারবেন না। ২৩ ধারায় লাইসেন্স বাতিল, ২৫ ধারায় দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার বিধান আছে।

১০. আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন– ১৯৮৯ : এই আইন অনুসারে লবণে আয়োডিন যুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অধিকাংশ উৎপাদনকারী লবণে আয়োডিন মেশান না। আমি চাঁদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে (২০০০-২০০১) লবণ কারখানাগুলোতে এবং নারায়ণগঞ্জ অন্যান্য স্থান হতে আনা লবণসমূহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে, প্রায় সকল লবণেই আয়োডিন নেই। এই আইনের অপরাধের জন্য ৯ ধারার বিধান মোতাবেক দোষী ব্যক্তির তিন বছর কারাদণ্ড বা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়দণ্ডের বিধান আছে।

১১. মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন– ১৯৯৯ : অত্র আইনের ৯ ধারা মোতাবেক মানবদেহের যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় বা এর বিনিময়ে কোনো প্রকার সুবিধা লাভ এবং সে উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন প্রদান বা অন্য কোনো রকম প্রচারণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ধারা-১০ (১) অনুসারে কোনো ব্যক্তি অত্র বিধান লংঘন করলে বা লংঘনে সহায়তা করলে ঊর্ধ্বে সাত বছর এবং কমপক্ষে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা তিন লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। ১০ (২) ধারা অনুযায়ী কোনো চিকিৎসক এই আইনের কোনো বিধান লংঘন করলে বা লংঘনে সহায়তা করলে উপরোক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়াও চিকিৎসক হিসেবে তাঁর রেজিস্ট্রেশন বতিলযোগ্য হবে।

১২. বাংলাদেশ দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন– ১৯৬৫ : অত্র আইনের ৬ ধারা মোতাবেক শাক-সব্জি, মাছ, মাংস, দুগ্ধজাত পরিচালনাকারী দোকানসমূহ, ঔষধপত্র, চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রির জন্য দোকানসমূহ, পানীয় খাবার, বরফ, হোটেল রেস্তোরাঁ, খাবার গৃহ বন্ধ থাকবে না। ১৮ ধারা অনুসারে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন এবং কোনো নর্দমা, পায়খানা অথবা আবর্জনা হতে দূষণমুক্ত রাখতে হবে। ১৯ ধারা মোতাবেক প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মান অনুযায়ী বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ২০ ধারা অনুসারে পর্যাপ্তভাবে আলোকিত হতে হবে। ২১ ধারা অনুসারে স্বাস্থ্যসেবা ও আহারের সুবিধার জন্য নির্ধারিত পন্থা ও মান অনুযায়ী বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৩৮ ধারার বিধান অনুযায়ী দোষী ব্যক্তি ১০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১৩. গবাদিপশু জবাই (বিধিনিষেধ) এবং মান নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৫৭ (১৯৮৩ পর্যন্ত সংশোধিত)। অত্র আইনের ৫ ধারার বিধান মোতাবেক (ক) দু'বছরের নিচের স্ত্রী ছাগল বা ভেড়া অথবা তিন বছরের নিচে কোনো স্ত্রী গবাদিপশু, (খ) এক বছরের নিচের পুরুষ ছাগল, ভেড়া অথবা সাত বছরের অথবা সাত বছরের নিচের কোনো পুরুষ গবাদিপশু যদি জমি কর্ষণ বা প্রজননের জন্য ব্যবহৃত হয় বা উপযোগী হয়, (গ) পাঁচ বছরের নিচের স্ত্রী ছাগল বা ভেড়া অথবা দশ বছরের বা

দশ বছরের নিচের অন্য কোনো গবাদিপশু যদি বংশবৃদ্ধির জন্য বা দুধ দেয়ার উপযোগী হয়, (ঘ) কোনো স্ত্রী গবাদিপশু যদি গর্ভবতী বা দুধ দেয়– এমন পশু জবাই করা ও মাংস বিক্রি নিষেধ। ৭ ধারা অনুসারে কেউ এই নিষেধ অমান্য করলে ছয় মাস কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়া বিশুদ্ধ খাদ্য বিধিমালা (১৯৬৭), ক্যান্টনমেন্ট বিশুদ্ধ খাদ্য এ্যাক্ট (১৯৬৬), ক্যান্টনমেন্ট বিশুদ্ধ খাদ্য বিধিমালা (১৯৬৭) ইত্যাদি কিছু আইন আছে যা ভেজাল প্রতিরোধে প্রাসঙ্গিক।

এই বিস্তারিত আলোচনা হতে সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশে ভেজাল প্রতিরোধ আইনের অভাব নেই। অভাব শুধু সদিচ্ছা, উদ্যোগ ও প্রয়োগের। আর সেই অভাব অনেকাংশে লাঘব করেছেন তৎকালীন সরকার। আইনগুলোর সুষ্ঠু ও সাহসী প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

[মূল প্রবন্ধটি পাঠ করা হয় গত ৬/১/২০০৬ইং তারিখে পাবলিক হেলথ্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে বিসিপিএম ভবন, মহাখালীতে বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে। উক্ত অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; তৎকালীন উপসচিব ডা. ওমর খৈয়াম; ড. শাহ মাহফুজুর রহমান– তৎকালীন প্রোগ্রাম অফিসার, খাদ্য নিরাপত্তা প্রোগ্রাম, ইন্সটিটিউট অব পাবলিক হেলথ্; ইত্তেফাক-এর স্টাফ রিপোর্টার
আবুল খায়ের; তৎকালীন সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, তৎকালীন বিএমএ'র মহাসচিব এ জেড এম জাহিদ হোসেন; ডা. শাহাদাত হোসেন, তৎকালীন ডিজি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; ডা. মাহবুবুর রহমান– তৎকালীন সভাপতি, পাবলিক হেলথ্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ– মহোদয়সহ বরেণ্য চিকিৎসকবৃন্দ। পরবর্তীকালে মূল প্রবন্ধে আরো বিস্তারিত সংযোজন ও পরিবর্ধন করে অত্র লেখাটা প্রস্তুত করা হল।]

মোবাইল কোর্ট প্রসঙ্গ : ভিত্তি ও আইন

মোবাইল কোর্টের ভিত্তি : বহু বিতর্কিত অথচ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য স্বতঃসিদ্ধ একটি বিষয়– তা হচ্ছে মোবাইল কোর্ট। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান– তথা এই উপমহাদেশে মোবাইল কোর্ট নিয়ে বহু প্রশ্ন, বহু তর্ক-বিতর্ক, (২০০৫ সালের শেষের দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সভায় আইন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব মোবাইল কোর্টের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন) সূচিত হলেও ঐতিহ্যগতভাবে (Traditionally) মোবাইল কোর্ট চলে আসছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট তথা উচ্চতর আদালতের বহু সুচিন্তিত মতামত/ আদেশ এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। সেই

বিস্তারিত আলোচনায় যাবার পূর্বে আমরা মোবাইল কোর্টের ভিত্তি প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করতে চাই। উল্লেখ্য যে, মোবাইল কোর্ট নামটা, শব্দটা ফৌজদারি কার্যবিধির কোথাও উল্লেখ নেই।

১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure-1898)-এর ৯ (২) ধারায় যেমন দায়রা জজ আদালত সম্পর্কে বলা হয়েছে– The Government may, by general or special order in the official Gazette, direct at what place or places the court of sessions shall hold its sitting. (অর্থাৎ সরকারি গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারি করে সরকার নির্দেশ দিতে পারেন যে কোনো স্থানে বা স্থানসমূহে দায়রা আদালত বসবে।) ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮ ফৌজদারি কার্যবিধি ধারায় চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ থানা ম্যাজিস্ট্রেট, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট ব্র্যাঞ্চ নিয়োগের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের অধিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা/ বিচারকার্য পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ৯-এর (২) ধারার মতে, যেমন আদালতের অনুরূপ নির্দিষ্ট কোনো স্থানে বা ভবনে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারকার্যকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। ফলে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারিক কার্যক্রম তার অধিকারের সীমানা সর্বত্র বিস্তৃত ও ব্যাপক। ম্যাজিস্ট্রেট কোথায় বা কোন স্থানে বসবে এ বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধিতে দায়রা জজ আদালতের মতো মোটেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। বরং ফৌজদারি কার্যবিধি ৩৫২ ধারায় বলা হয়েছে– The place in which any criminal court is held for the purpose of inquiring into or trying any offence shell be deemed an open Court, to which the public generally may have access, so far as the same can convenietly contain them. Provided that the presiding Judge or magistrate may, if he thinks fit, order at any stage of any inquiry into or trial of any particular case, that the public generally or any particular person shall not have access to be or remain, in the room or building used by the court. (অর্থাৎ কোনো অপরাধের তদন্ত বা বিচারের উদ্দেশ্যে যে স্থানে ফৌজদারি আদালতের অধিবেশন বসে, সে স্থানকে উন্মুক্ত আদালত বলে গণ্য করতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্থানে সংকুলান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে। তবে প্রিসাইডিং জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত মনে করলে কোনো বিশেষ মামলার অনুসন্ধান বা বিচারের যে কোনো পর্যায়ে আদেশ দিতে পারেন সর্বসাধারণ বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত কক্ষ বা রুমে প্রবেশ করতে বা তথায় অবস্থান করতে পারবেন না।) মূলত এটাই মোবাইল কোর্টের ভিত্তি। অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট কোথায় কোন স্থানে বসবে তার জন্য সরকার কর্তৃক গেজেট নেটিফিকেশন বা কোনো আদেশের প্রয়োজন নেই। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট যে কোনো স্থানে যে কোনো জায়গায় আদালত পরিচালনা

করতে পারেন। যার কারণে মোবাইল কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করার অন্যতম একটা অংশ হিসেবে বিবেচ্য। ফৌজদারি কার্যবিধিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে Bangladesh Standard and Testing Institution (BSTI) Act. (Amendment-2003) ও Pure food Act (Amendment)– ২০০৫ সাল ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর (২২) ধারা সংশোধন করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত আইনসমূহের অপরাধ তাঁর অধিক্ষেত্রের যে কোনো স্থানে বিচার করতে পারবেন এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন।

বিএসটিআই অর্ডিনেন্স ১৯৮৫ (সংশোধন-২০০৩)-৩৩-এ ধারানুসারে Place and Procuduere of trial : Not-with-standing anything contained in the code of criminal Procedure, (Act V of 1898) (a) An offence punishable under this ordinance may be tried at any place in this the local jurisdication of the Metropolitan Magistrate or of the Magistrate of the first class. (অর্থাৎ ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাই থাকুক না কেন– একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট তার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যে কোনো স্থানে এই অধ্যাদেশের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবেন)।

(b) An offence punishable under this ordinance may be tried summarily in accordance with as far as possible the provisions laid down in chapter XXII of the said code. (অর্থাৎ ফৌজদারি দ্বাবিংশ অধ্যায় নির্দেশিত বিধিবিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক এ অধ্যাদেশের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংক্ষিপ্ত বিচারপদ্ধতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে হবে।) অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ (সংশোধন-২০০৫) ৪১ (বি) ধারা অনুসারে উক্ত আইনে যে কোনো স্থানে আদালত পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত বিচারপদ্ধতিতে বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য বিধান রাখা হয়েছে। (Pure food ordinance–1959 (সংশোধন ২০০৫)– Place and Procedure of trial 41 (a) ধারানুসারে Not-withstanding anything contained in the code of criminal procedure (Act V of 1898) (a) an offence punishable under this ordinance may be tried at any place within the local jurisdiction of the pure food court.

(b) an offence punishable under this ordinance may be tried summarily in accordance with as far as possible the previous laiddown in chapter XXII of the said code.)

সার ব্যবস্থাপনা আইন– ২০০৬-এর ২২ ধারা অনুসারে ফৌ.কা.বি. যা কিছুই থাকুক না কেন এ আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের বিচার সংশ্লিষ্ট আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারবে। এবং ২৩ ধারা অনুসারে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার অনুষ্ঠিত হবে।

মোবাইল কোর্ট প্রসঙ্গে বাংলাদেশসহ ভারত-পাকিস্তান তথা এই উপমহাদেশের উচ্চ আদালতের কিছু মতামত/ আদেশ আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি–

বিচারের স্থান নির্বাচনে বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে– (২১-DLR-৩০৭) (২১-DLR-১০) কোনো ভবনে বা কোনো প্রকোষ্ঠে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এমনে কোনো কথা নেই, ঘটনাস্থলে প্রকাশ্যে স্থানে খোলা জায়গায় বিচার পরিচালনা করা যেতে পারে। [(PLD-1962 kar. 249 (BD)] যতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট উন্মুক্ত আদালত হিসেবে পরিচালিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিচারিক অধিক্ষেত্রের যে কোনো স্থানে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধিতে কোনো বাধানিষেধ নেই। তবে সাধারণ নিয়ম ও সিদ্ধান্ত হচ্ছে– এটা যথোপযুক্ত স্থানে (Proper place) অনুষ্ঠিত হতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট অনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে বা প্রাঙ্গণেও আদালত পরিচালনা করতে পারেন। (Law and Practice of criminal Procedure– Zahirul Hoque Page– 544) ম্যাজিস্ট্রেট তার আদালতকক্ষ ছাড়াও অন্যান্য স্থানে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবেন। তবে যে স্থানে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া অপরিহার্য। (২১-DLR-৩১০) ফৌজদারি কার্যবিধি ৩৫২ ধারা মোতাবেক কারাগারে কোনো বিচারকার্য পরিচালনা করা অবৈধ নয়। (২-DLR-৮০) যতক্ষণ পর্যন্ত সুবিচারের নিশ্চয়তা ও অধিকার বিদ্যমান ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে হবে– এমন কোনো বাধ্যবাধকতা বা অধিকার কোনো আসামির নেই। [১৯৮৪-p.cr.lj. 273 (kar)], কোর্টহাউজ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিজস্ব বিচক্ষণতার (Discretion) অধিকার আছে– (21 DLR page 307) সাধারণত আদালতের কার্যক্রম আদালতকক্ষে সম্পন্ন হবে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকার্য অন্য যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে– (১৯৮৭ cr.l.j. ১৯২২) ফৌজদারি কার্যবিধি ৩৫২ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট তার পছন্দসই যে কোনো স্থানে তার আদালত পরিচালনার জন্য তাঁকে চিন্তাভাবনা করার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে (The code of criminal Procedure– Md. Zahirul Islam Page 853) তবে যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকার্য পরিচালনার সময় প্রক্রিয়া পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বা কার্যকরী করতে পারেন না সেখানে বিচারিক কার্যক্রম বা তদন্ত না-করাই উচিত। [48. c.r.l.j. 866(872)] এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন বাড়ি বা কারাগার অভ্যন্তর বা অন্য কোনো স্থানে বিচারকার্য পরিচালিত হয় তবে তা হবে উন্মুক্ত এবং প্রত্যেকের প্রবেশাধিকার থাকবে। তবে এক্ষেত্রে কোর্ট কতজনের প্রবেশাধিকার থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারিত করে দিতে পারবেন। (AIR 1988 sec 883 The Code of Criminal Procedure– Md. Zahirul Islam– 855) ম্যাজিস্ট্রেট রুদ্ধদ্বার কক্ষে (In camera) এবং ব্যক্তিগত খাসকামরায়ও বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন। (3. cr.l.j.443) কোনো পর্দানশীল মহিলা তিনি যেখানে উপস্থিত হতে সক্ষম সেখানে ব্যক্তিগত কক্ষে তার সাক্ষ্য নেয়া অপরিহার্য (২ বিরৎ ৪৩২) এই বিস্তারিত আলোচনা হতে সুস্পষ্ট যে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য আইনে সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও আইনগতভাবে এর নিষেধ বা

বাধ্যবাধকতা নেই। এই উপমহাদেশের সকল উচ্চ আদালত কর্তৃক এটা স্বীকৃত এবং ঐতিহ্যগতভাবে (Traditionally) চলে আসছে।

মোবাইল কোর্টের উদ্দেশ্য

১. আইনের দ্রুত ও কার্যকরী প্রয়োগ।
২. সরকার জনসাধারণের অধিকার জরুরিভাবে সংরক্ষণ।
৩. আইনবিরোধী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত প্রতিরোধ প্রতিহত করণ ইত্যাদি।

মোবাইল কোর্টের কার্যকারিতা/ প্রভাব

১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব।
২. অপরাধের পুনরাবৃত্তি হ্রাস।
৩. নির্বাচনের সময় জাল ভোট বন্ধ করা ও বিশৃঙ্খলা দমন করা।
৪. জনসচেতনতা সৃষ্টি (সাম্প্রতিককালে ভেজালবিরোধী অভিযানের কারণে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অকল্পনীয়ভাবে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে)।
৫. ম্যাজিস্ট্রেট ও ম্যাজিস্ট্রেসির ভাবমূর্তি (Image) বৃদ্ধি পাওয়া।

সাম্প্রতিককালে ২০০৫-২০০৬ সনে ভেজালবিরোধী মোবাইল কোর্টের ফলে বাংলাদেশের সরকার ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট ও ম্যাজিস্ট্রেসির পরিচিতি, মর্যাদা, সম্মান, গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি– নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কারণে অপরাধ দমনের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। ২০০৫-২০০৬ সালে শুধু ঢাকা মহানগরীতে ভেজালবিরোধী অভিযানে মোবাইল কোর্ট এককভাবে জরিমানা আদায় করছে ৯ কোটি টাকা। অন্যান্য মোবাইল কোর্ট এবং সারা দেশের পরিসংখ্যান মিলানো হলে এর পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।

৭. সরকারের ইমেজ বৃদ্ধি– সততা, নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হলে জনসাধারণের কাছে সরকারের ইমেজ বৃদ্ধি পায় এবং সরকার হয় প্রশংসিত। ভেজালবিরোধী অভিযানকে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণ ভালো কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করছেন এবং সরকারের আন্তরিকতা মূল্যায়ন করছেন।

মোবাইল কোর্ট কে পরিচালনা করতে পারেন

কোন শ্রেণীর ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন– তা আইনের কোথাও বলা নেই। তবে এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন মোবাইল কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটকে তাৎক্ষণিকভাবে মামলা আমলে নিয়ে উপস্থিত মামলা নিষ্পত্তি করতে হয়। সে কারণে স্বাভাবিক যে ম্যাজিস্ট্রেটের মামলা আমলে নেয়ার (Cognizance) ক্ষমতা আছে শুধু সেই ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট করতে পারেন। আরো সুস্পষ্ট করে বলতে গেলে ফৌ. কা. বি. ১৯০ (১) এ, বি, সি (২) (৩) ধারা মোতাবেক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা/ থানা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয়

শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারেন। তবে মোবাইল কোর্ট সাধারণত পরিচালনা করে মাইনর এ্যাক্টের আওতায় বিচার করা হয়। অধিকাংশ মাইনর অ্যাক্ট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য। ফলে মোবাইল কোর্ট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত হওয়া উত্তম এবং কোনোভাবে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালনা না করাটাই ভালো।

মোবাইল কোর্টে লক্ষণীয় বিষয়

১. উপযুক্ত পরিবেশ, শালীনতা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

২. প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র– আদেশপত্র, প্রসিকিউশন ফরম, জব্দ তালিকা, জরিমানা রশিদ বই (যেমন ওয়ারেন্ট, সাজা পরোয়ানা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, অভিযোগ ফরম, আসামি পরীক্ষা ফরম, সাক্ষী ফরম, প্রয়োজনীয় সাদা কাগজ, কলম, সিল, পর্যাপ্ত পরিমাণে সাথে নেয়া।

৪. প্রয়োজন সংখ্যক কর্মকর্তা– কর্মচারী-প্রসিকিউশন দাখিলকারী কর্মকর্তা, বেঞ্চ, ক্লার্ক (পেশকার), এমএলএসএস (পিয়ন) সাথে রাখা।

৫. আনুষাঙ্গিক সকল আয়োজন সম্পন্ন করা।

৬. ফৌ. কা. বি. ২৪৩ ধারা মোতাবেক দোষ স্বীকার করলে আসামির নিজ ভাষায় বিস্তারিতভাবে আলাদা সাদা কাগজে লেখা এবং আসামির স্বাক্ষর বা টিপসহি নেয়া। সম্ভব হলে আসামি কর্তৃক নিজ হাতে লিখে নেয়া।

৭. দোষ স্বীকার না করলে সংক্ষেপে সাক্ষী নেয়া ও ফৌ. কা. বি. ৩৪২ ধারায় আসামি পরীক্ষা করা।

৮. সংক্ষেপে রায় ঘোষণা করা।

৯. আসামিকে জরিমানা করা হলে যদি না দিতে পারে তাহলে ১ মাস সময় দেয়া ও আসামিকে জামিন দেয়া অথবা মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়া এবং আদালতে হাজিরার জন্য পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করে দেয়া।

১০. আসামিকে ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিলে ফৌ. কা. বি. ৪২৬ (২-এ) ধারা মোতাবেক জামিন প্রদানপূর্বক আপিলের সুযোগ দেয়া। তবে এক্ষেত্রে জামিন দেয়া আদালতের ইচ্ছাধীন বিষয়।

১১. দোষ স্বীকার না করে কেউ যদি Law point-এ মামলা আদালতে Contest করতে চায়, তাহলে আসামিকে সেই সুযোগ দেয়া।

১২. উপস্থিত জনতার মধ্যে যে কোনো রকমের উত্তেজনা বা উচ্ছৃঙ্খলতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সেই বিষয়টা ম্যাজিস্ট্রেটকে খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে।

১৩. যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট তার নিজস্ব descretion এবং Tactfullness হওয়া, দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত– (Quick or prompt Decision) প্রদানে প্রত্যুৎপন্নমতি হতে হবে।

১৪. মোবাইল কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটকে মনে রাখতে হবে যুদ্ধের ময়দানে আছেন। সার্বিক বিষয় চিন্তা করে কখনো অগ্রসর, কখনো পিছনে চলে আসা, কখনো ছাড় দেয়া, কখনো সন্ধি করা, কখনো গ্রেফতার, কখনো ছেড়ে দেয়া, কখনো কঠিন, কখনো শান্তভাবে কাজ করতে হবে।

জরিমানা পরিশোধের জন্য সময়ক্ষেপণ

মোবাইল কোর্টে কোনো আসামি যদি তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানা পরিশোধ করতে না পারেন এবং সময় চান তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌ.কা.বি. ৩৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক ৩০ দিন সময় দিয়ে তিন কিস্তিতে অথবা এক কিস্তিতে পরিশোধের আদেশ দিবেন।

আপিলের সুযোগ প্রদান : মনে রাখতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট সর্বনিম্ন আদালত। (অবশ্য গ্রাম্য আদালত একদৃষ্টে সর্বনিম্ন আদালত। কারণ ভিলেজ কোর্টের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আপিল হয়)। একজন মানুষের মৌলিক অধিকার রয়েছে উচ্চতর আদালতে যাবার। সে জন্য কেউ আপিল করতে চাইলে তাকে আপিল করা বা সুযোগ দেয়া বা জামিন দেয়া উচিত।

মোবাইল কোর্টের Indemnity বা অব্যাহতি

যেহেতু বিশেষত মাইনর অ্যাক্টে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স ধারার ৩৪, বিশুদ্ধ খাদ্য অর্ডিন্যান্সের ১৩ ধারা, দোকান প্রতিষ্ঠান আইন ৩০ ধারা, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধন ২০০২) ধারা ১৮, জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০৩-এর ১০ ধারাসহ বেশ কিছু মাইনর অ্যাক্টসমূহ যেগুলো সাধারণত মোবাইল কোর্টে প্রয়োগ করা হয় বা পরিচালনা করা হয়, এরূপ অনেক আইনে বলা হয়েছে– উক্ত আইনসমূহের অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃতকাজের জন্য দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো মামলা মোকদ্দমা বা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। অর্থাৎ Indemnity দেওয়া হয়েছে।

মোবাইল কোর্টে প্রয়োগকৃত কিছু আইনকানুন :

১. বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (সংশোধিত অ্যাক্ট ২০০৫)
২. বিএসটিআই অধ্যাদেশ ১৯৮৫ (সংশোধিত অ্যাক্ট ২০০৩)
৩. ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ ১৯৮২ (দি স্ট্যান্ডার্ড অব ওয়েটস এ্যান্ড ম্যাজার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮২-এর ৫২ (সি) ধারা।
৪. পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ আইন ১৯৮০)
৫. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৫৬-এর ১১ ধারা
৬. পরিবেশ আদালত আইন ২০০০ (স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের ধারা ৫ বি) এবং ৫ (সি) (২) ধারা
৭. ডিএমপি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬
৮. মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩
৯. রেলওয়ে আইন ১৮৯০
১০. অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অর্ডিন্যান্স ১৯৮৬
১১. আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন

১২. অতিথি নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৮৪
১৩. ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯
১৪. সার (ব্যবস্থাপনা) আইন-২০০৬-এর ২৩ ধারা
১৫. ধূমপান নিষিদ্ধকরণ আইন
১৬. বিদ্যুৎ আইন
১৭. দোকান প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬৫
১৮. বাংলাদেশ বাণিজ্যিক নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ ১৯৮৩
১৯. সিনেমাটোগ্রাফ এ্যাক্ট ১৯১৮
২০. বন আইন ১৯৬৭
২১. ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২ (১৯৯০ সাল পর্যন্ত সংশোধিত)
২২. প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন
২৩. বাংলাদেশ বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ ১৯৭৪-এর ৩৫ ধারা
২৪. মৎস্য সম্পদ ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এর (সংশোধন ২০০২)-এর ৭ (ডি) ধারা
২৫. সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩
২৬. গবাদি-পশু জবাই বিধিনিষেধ এবং মাংস নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৫৭। (১৯৮৩ সন পর্যন্ত সংশোধিত)।
২৭. প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৫২
২৮. বঙ্গীয় প্রকাশ্য জুয়া আইন ১৮৬৭
২৯. দোকান ও প্রতিষ্ঠান বিধিমালা ১৯৭০
৩০. কারখানা আইন ১৯৬৫
৩১. সর্বনিম্ন মজুরি অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর ১০ (৩ ধারা)
৩২. বাংলাদেশ অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস (সংরক্ষণ) আইন ১৯৫২-এর ৭-এর (৫)/(বি) ধারা
৩৩. বাংলাদেশ অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস ২ অধ্যাদেশ ১৯৫৮ (৩ ধারা)

মোবাইল কোর্টের শাস্তির পরিমাণ

সাধারণত মোবাইল কোর্টে সংক্ষিপ্ত বিচারপদ্ধতিতে বিচারিক কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয় বিধায় মোবাইল কোর্টে ২ বছরের বেশি কারাদণ্ড দেওয়া সঙ্গত নয়। তবে তা বাধ্যতামূলক নয় এবং এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ আইন ১৯৮০)-এর ১৪ ধারা অনুসারে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ক্ষমতা অতিরিক্ত হলেও এ আইনের আওতায় যে কোনো দণ্ডাদেশ (১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড) দিতে পারবেন। বন আইনের ৬৭-এর (এ) ধারায় ফরেস্ট ম্যাজিস্ট্রেট যে কোনো প্রকার দণ্ড দিতে পারেন।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট আইনে যদি সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা না থাকে তবে মোবাইল কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট তার ক্ষমতার অতিরিক্ত জরিমানা করতে পারবেন না। যেমন– একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ১০ হাজার টাকার বেশি জরিমানা করতে পারবেন না। কিন্তু কিছু কিছু আইনে এই সীমাবদ্ধতা নেই।

বিএসটিআই অধ্যাদেশে ৩৩ (ডি) ধারায় বলা হয়েছে ১৮৯৮ সনে ফৌজদারি কার্যবিধিতে যা-ই থাকুক না কেন উক্ত আইনে ম্যাজিস্ট্রেট ১০ হাজার টাকার বেশি অর্থাৎ (১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) জরিমানা করিতে পারবেন এবং তা আইনসঙ্গত হবে। অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ ৫২ (১) ধারায় বলা হয়েছে ১৮৯৮ সনের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাই থাকুক না কেন অত্র আইনে বিচারকারী আদালত যে কোনো পরিমাণ শাস্তি– ৫২ (২) ধারায় ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন। বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ (সংশোধন ২০০৫)-এর ৪১ (২) ধারা অনুসারে উক্ত আইনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট যে কোনো দণ্ড (৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন)। সাম্প্রতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০-এর অন্য ধারায় বলা হয়েছে ১৮৯৮ সনের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যা-ই থাকুক না কেন, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ৮ ধারা অনুসারে ৫ বছর কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করবেন। ১৮৯৮ সনের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যা-ই থাকুক না কেন সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ (১৯৮৩) ৫৪ ধারায় বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট অত্র আইনে ১০ হাজার টাকার বেশি (২২ ধারায় ১ লাখ টাকা) পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন। কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯-এর ১৮৫ ধারায় উক্ত আইনের বিচারকার্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ৫ বছরের অধিক কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকার অধিক জরিমানা আদেশের ক্ষমতাবান ছিলেন। (তবে ১৯৭৪ সনে বিশেষ ক্ষমতা আইন করে চোরাচালানির মামলা স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হওয়ায় কাস্টমস এ্যাক্ট এখন আর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার হয় না।

সার ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৬-এর ২১(২) ধারা অনুসারে ফৌ.কা.বি. যা-ই কিছু থাকুক না কেন এ আইনের অধীন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এ আইনে অনুমোদিত যে কোনো দণ্ড আরোপ করতে পারবেন। সার ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৬-এ ৮(২), ১০(৩), ১১(২), ১৩(২), ১৫(২), ২০(২) ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন এবং উক্ত আইনের ১৪(৬), ১৬(৩), ১৭(৩) ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। The pesticides ordinance, 1971-এর ২৬(২) ধারা অনুসারে Not with standing anything contained in section 32 of the code of criminal procedure, 1898, it, shall be lawful for any Magistrate of the first class to pass any sentence authorised by this ordinance even if such sentence exceeds his powers under the said section 32.

এ বিস্তারিত আলোচনা হতে স্পষ্ট যে আইন বিশেষে মোবাইল কোর্টের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৫ বছরের বেশি কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকার বেশি জরিমানার আদেশ বা রায় দিতে পারেন।

খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল : আমাদের জাতীয় সমস্যা

খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল মূলত একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য ক্ষতিকর। এটা পৃথিবীব্যাপী একটা মারাত্মক ব্যাধি। যার ফলে ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রায় সব কয়টা দেশে খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য মৃত্যুদণ্ড ও বড় অংকের জরিমানাসহ কঠিন শাস্তির বিধান বিদ্যমান। তবে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এটিকে আমাদের জাতীয় সমস্যা হিসেবে আমরা মনে করি। কারণ ভেজাল খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও ঔষধের কারণে আমাদের দেশের প্রতিটা মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ভেজালের কারণে অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত। উদাহরণস্বরূপ যে মিষ্টিবিক্রেতা মিষ্টির মধ্যে সোডিয়াম সাইক্লামেট, স্যাগারিন, কাপড়ের ও চামড়ার ক্ষতিকর রঙ ব্যবহার করে বিক্রি করছেন, সেই মিষ্টিবিক্রেতা বাজার হতে ফরমালিন দেয়া মাছ অথবা দুধ খাচ্ছেন অথবা ফরমালিন দেয়া মাছবিক্রেতা বাজার হতে ক্ষতিকর কেমিক্যালমিশ্রিত বিস্কুট খাচ্ছেন অথবা তার বাচ্চাকে ক্ষতিকর রঙিন চকলেট খাওয়াচ্ছেন। এমনিভাবে প্রতিটা মানুষ ভেজাল খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ ভেজাল নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জাতীয় সমস্যা এবং স্থানীয়ভাবে এটা মোকাবিলা না করে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয়ভাবে এই সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন। তবে এই বিষয়ে মনে করি ঢাকার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করি– ঢাকাতে ভেজালবিরোধী অভিযান সফল করা সম্ভব হলে ভেজালের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সফল হবে, আর বাকি অংশ বাকি পঞ্চাশ ভাগ সারাদেশের জন্য প্রয়োজন। কারণ ঢাকা শহরের প্রায় দেড় কোটি মানুষের সবকিছুই কিনে খেতে হয়। ঢাকা শহরকে বাদ দিয়ে কোনো বড় ব্যবসাই সম্ভব নয়, নয় আমদানি-রফতানিতে। অন্য কথায় ঢাকা শহর হতে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ প্রস্তুত হয়ে চলে যাচ্ছে, দেশের অন্যান্য স্থানে। আবার দেশের অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন দ্রব্য ও প্রস্তুতকৃত খাদ্যসামগ্রী ঔষধপত্র ঢাকা শহরে চলে আসছে। সবকিছু কিনে খাওয়া দেড় কোটি ভোক্তার এই ঢাকা শহরকে ভেজালমুক্ত রাখার জন্য অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকলে আমার বিশ্বাস আমাদের জাতীয় সমস্যার অর্ধেক সমাধান হয়ে যাবে, বাকি অর্ধেক সারা দেশে বাস্তবায়ন করতে হবে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল যে আমাদের জাতীয় সমস্যা তার প্রমাণ ভেজাল খাদ্যের কারণে ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, প্যারা টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, ক্রিমি, কিডনি রোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি সৃষ্টি এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে।

(নিরাপদ খাদ্য বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট এবং আমাদের করণীয়, ড. শাহ মাহফুজুর রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফুড সেফটি প্রোগ্রাম, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা।)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকার ড. শাহ মাহফুজুর রহমান ও তাঁর সহযোগী গবেষকগণ ২০০৩ সালে, ঢাকা মহানগরীর ৪০০ মিষ্টি, ২০০ আইসক্রিম, ২৫০ বিস্কুট ও ৫০টি পাউরুটি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, ৯৭% মিষ্টি, ৫৯% আইসক্রিম, ৫৪% পাউরুটি ও ২৪% বিস্কুট ভেজাল। পরীক্ষাকৃত বিস্কুটের নমুনার ৬২%-এর কোনোরূপ বিএসটিআই অনুমোদন ছিল না।

দেশে বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী, মিষ্টিদ্রব্যে শতকরা অন্তত ১০ ভাগ মিল্কফ্যাট থাকার কথা, কিন্তু পরীক্ষাকৃত মিষ্টির নমুনাসমূহের শতকরা প্রায় ৯১ ভাগে ফ্যাট ১০% এর কম। আবার যেগুলোতে ফ্যাটের পরিমাণ ঠিক আছে কিন্তু, সেগুলোর বেশির ভাগে মিল্ক ফ্যাটের পরিবর্তে ভেজিট্যাবল ফ্যাট ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকার ডা. মো. আবু বকর সিদ্দিক ও তাঁর সহযোগী গবেষকগণ রাস্তার পাশের খাদ্যদ্রব্য (Street vended food) পরীক্ষা করে দেখেন যে, শতকরা ১০০% খাবারই জীবাণুঘটিত দূষণে দুষ্ট। (তথ্যসূত্র-এ)।

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (CAB) পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ, নিরাপদ খাদ্য পরিস্থিতির চিত্র ফুটে তোলে। ক্যাব-এর জরিপে দেখা যায় বাজারে বিক্রিত বিকল্প শিশুখাদ্যের ৪৬.৫%-এর রেজিস্ট্রেশন নেই। ৭টি বোতলজাত পানির নমুনা পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেগুলোর কোনোটিই মোটেই মিনারেল ওয়াটার নয়। ২০০৪ সালে ক্যাব এক জরিপে দেখে যে বাজারে বিপণনকৃত ২৬টি লজেন্স ক্যান্ডির প্রায় ৩৯ ভাগই গুণমানহীন এবং বিএসটিআই-এর মান সনদ নেই। ২০০৫ সালে ক্যাব পরিচালিত জরিপে বিএসটিআই কর্তৃক পরীক্ষিত ১২টি ব্রান্ড জুসের ৮টিই বিডিএস মান অনুসারে মানহীন বলে বিবেচিত হয়েছে (তথ্যসূত্র-ঐ)।

অন্য প্রতিষ্ঠানের অন্য এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঢাকা শহরের শতকরা ৭১ ভাগ খাদ্য ভেজাল বা মানহীন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, উপজেলা, পৌরসভা এলাকা থেকে স্যানেটারি ইন্সপেক্টরগণ, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যসমূহের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগই ভেজাল। এগুলোর মধ্যে ভেজাল তালিকার শীর্ষে রয়েছে– বাটার অয়েল, ডালডা, ঘি, মিষ্টি, আয়োডাইজড সল্ট, মধু, গাভীর দুধ, সরিষার তৈল ইত্যাদি (তথ্যসূত্র-ঐ)।

তাছাড়া ঔষধে ভেজাল করা, অনুমোদনবিহীন সেলাইন, বোরিক পাউডারের মধ্যে চক পাউডার মেশানো, মধুতে আখের গুড় মেশানো, চাল-মুড়িতে ইউরিয়া সার ব্যবহার, লবণ ধবধবে সাদা করার জন্য ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার, বিদেশি মেয়াদ-উত্তীর্ণ জুস, বিস্কুট, চকলেট, কসমেটিক ইত্যাদি এনে নতুন করে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বসানো, আম, কলা, আনারস, টমেটোসহ বিভিন্ন ফলে ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার, মাছ ও দুধে ফরমালিন ব্যবহার, বিদেশি ডাল বা পশু জাতীয় খাদ্য আমদানি করে তা মানুষের খাদ্য হিসেবে বিক্রি, খেজুরের গুড়ে আখের গুড়ের সংমিশ্রণ, খাদ্যদ্রব্যে নষ্ট ডিমের ব্যবহার, মরা মোরগ-মুরগির মাংস বিক্রি, খাদ্যদ্রব্যে সোডিয়াম সাইক্লামেট ব্যবহার, খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর টেক্সটাইল কালার, লেদার (চামড়ার) রঙ ব্যবহার করা, অতিরিক্ত পরিমাণে এমোনিয়া বাইকার্বোনেটসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার, পচাবাসি খাবার বিক্রিসহ বহু ভেজালের অভিযোগ জানা যায়। সাদা ডিমকে কেমিক্যাল দিয়ে লাল করা, ভেড়ার মাংসকে খাসি, মহিষের মাংসকে গরুর মাংস হিসেবে বিক্রির প্রতারণা দেখা যায়।

সবকিছু মিলে খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল আমাদের বড় ধরনের একটা জাতীয় সমস্যা।

ভেজাল অনেক পুরনো সমস্যা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল সংমিশ্রণে সহস্র বছরের পুরনো সমস্যা। তার প্রমাণ পৃথিবীর হাজার বছরের পুরনো ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে সৎভাবে ব্যবসা করা, ওজনে কম না দেয়া, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল সংমিশ্রণ না করার জন্য নির্দেশ ও উপদেশ দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশে ভেজাল নতুন কিছু নয়। ভেজাল শত শত বছরের সমস্যা। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধিতে খাদ্যদ্রব্য ভেজালের কারণে শাস্তির বিধান করাই তার প্রমাণ। তাছাড়া ১৮৯৭ সালে একজন প্রখ্যাত রসায়নবিদ নিজ বাড়িতে প্রস্তুতকৃত ঘি ও ভাঙানো সরিষার তৈলের সাথে বাজারের ঘি ও সরিষার তৈলের সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষণা শেষে দেখতে পান বাজারের ঘি ও সরিষার তৈলে ভেজাল সংমিশ্রণ আছে। স্বাধীনতার আগে হতে আমাদের দেশে বিভিন্ন রঙে রঙিন আইসক্রিম ও চকোলেট মূলত কাপড় রঙ করার ক্ষতিকর রঙ দিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসছে। বর্জ্য তেলের মধ্যে ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশিয়ে নকল সয়াবিন তেল প্রস্তুতের দায়ে একজন বিদেশি নয়াবাজরে গ্রেফতার হয়েছিলেন-বহু আগে। সুতরাং ভেজাল আমাদের দেশে অনেক দিনের সমস্যা।

অতীত বর্তমান

তবে এই সমস্যা পূর্বে সীমিত পর্যায়ে ছিল, কিন্তু এর ব্যাপকতা এখন অনেক বেশি। পূর্বে ক্ষতিকর রঙ, ফরমালিন, কেমিক্যাল, ইউরিয়া সার-এর ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল না। বর্তমানে প্রতিটা জিনিসের মধ্যে ক্ষতিকর রঙ, বিষাক্ত ফরমালিন, বিপজ্জনক কেমিক্যাল ব্যবহার করা যেন একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পূর্বে দুধে মেশানো হত টিউবয়েলের পানি, কিন্তু এখন দুধে ঢালা হয় নদী-নালা, খালবিল, পুকুর-ডোবার পানি আর ভয়ংকর ফরমালিন। এই বিষয়ে প্রায় বছরখানেক আগে এন.টি.ভি'র সুপন রায় একটি ডকুমেন্টারি অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রচার করেছিলেন। পূর্বে ফল পাকানো হত রৌদ্রে রেখে অথবা গরম কোনো জায়গায় চাপা দিয়ে, কিন্তু বর্তমানে ফল পাকানো হয় কৃত্রিমভাবে কার্বাইডসহ বিভিন্ন সর্বনাশা কেমিক্যাল দিয়ে।

ভেজাল একটি সামাজিক সমস্যা

বলা নিষ্প্রয়োজন খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটা একটি সামাজিক সমস্যা। তবে এটা রাজনৈতিক সমস্যা না হলেও ভেজাল প্রতিরোধের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন প্রয়োজন আছে। রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধিতা করলে ভেজাল-বিরোধী অভিযান কখনও এতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পারত না। ভেজালের কারণে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। যিনি রাজনীতির সাথে জড়িত নন তিনিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। যিনি ব্যবসায়ী তিনিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সুতরাং এতে সকলের স্বার্থ জড়িত। জনস্বার্থে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে না হলেও নীরবে আমাদেরকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। 'দেশবাংলা'সহ কিছু কিছু পত্রিকায় দেখলাম প্রাক্তন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল মহোদয় ও জাসদের হাসানুল হক ইনু মহোদয় ভেজাল অভিযানের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। এটা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে।

ভেজাল প্রতিরোধে জাতীয় স্বার্থ জড়িত

ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদার করার পর যখন ব্যাপকভাবে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেখতে পেলাম তখন আমার মনে একটা ভয় কাজ করছিল– বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয় কিনা। কারণ আমার কাছে সব সময় আমাদের জাতীয় স্বার্থ বড়। একবার মনে হল নামকাওয়াস্তে কাজ করি, বেশি ভেজাল ধরার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমি দেখলাম ভেজালের কারণে সারা জাতির ক্ষতি হচ্ছে, এটাতে জাতীয় স্বার্থ জড়িত। সত্য-সত্যই, মিথ্যা-মিথ্যাই। আজ আমরা বিদেশে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে মনে করে ভেজালকে যদি চাপা দিয়ে রাখি এর বিস্ফোরণ একদিন ঘটবেই, ততদিনে জাতির আরো অনেক বেশি ক্ষতি হবে। সেকথা মনে করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ভেজালের বিষয়ে বিন্দু পরিমাণেও ছাড় দেব না। কঠিন হস্তে এটা প্রতিরোধ করব। পরে জানতে পারলাম আমাদের এ ভেজাল-বিরোধী অভিযান দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে। Daily Star-এর পিনাকী রায় একদিন আমাকে ফোন করে জানান আমাদের এই ভেজালবিরোধী অভিযান মডেল ও দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শুরু করার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে এবং তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের অভিযান স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ বেতারের কয়েকজন অফিসার আমাকে জানান যে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের বহু লোক চিঠি দিয়ে আমাদের এ কাজের প্রশংসা জানাচ্ছে এবং তাদের দেশে শুরু না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

ভেজালবিরোধী অভিযানে যাদের অবদান

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া তথা জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর। 'আমার দেশ'সহ প্রতিটা জাতীয় পত্রিকায় ভেজাল সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের সাথে সাথে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় কলাম, নিবন্ধ, মতামত ব্যাপকভাবে প্রচার করে জনগণকে সচেতন করেছেন। তার পাশাপাশি আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিটিভি, এনটিভি, এটিএন, চ্যানেল আই ব্যাপকভাবে ভেজাল সংক্রান্ত সংবাদ অনুষ্ঠান প্রচার করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যা খুবই প্রশংসাযোগ্য। সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ক্যাবসহ কয়েকটি এনজিও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, কেবিনেট সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বাস্থ্য সচিব, শিল্প সচিবসহ সকল সচিব মহোদয়গণ, ডিজি, বিডিআর, আইজিপি, ডিজি, বিএসটিআই, বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ মমিন উল্লাহ মহোদয়, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জালাল আহমেদ মহোদয় এবং আমাদের মহামান্য হাইকোর্টের বিজ্ঞ সিনিয়র কৌসুলিবৃন্দ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সমস্ত জনগণের অবদান আছে এই ভেজালবিরোধী অভিযানে।

সাফল্য :

আমাদের প্রয়োজনমতো ক্যামিস্ট ও কেমিক্যাল টেস্টের যন্ত্রপাতি না থাকায় অনেক কিছুতে এখনও হাত দিতে পারি নাই।

আমাদের সাফল্যগুলো নিম্নরূপ

প্রথমত জনগণ সচেতন হয়েছেন। এতে যে ভোক্তাদের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়– ভেজালবিরোধী অভিযান এবং ভোক্তা-সচেতনতা, কাজের মান উন্নয়নে অদূর ভবিষ্যতে অবশ্য খাদ্যমান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী। (নিরাপদ খাদ্য: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট এবং আমাদের করণীয়– ড. শাহ মাহফুজুর রহমান, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা)।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন সামগ্রীতে মেয়াদ-উত্তীর্ণের তারিখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে।

তৃতীয়ত, ক্ষতিকর রং, কেমিক্যাল, ফ্লেভার, সোডিয়াম সাইক্লামেট ব্যবহার কমে আসছে।

চতুর্থত, হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোতে পরিবেশগত উন্নয়ন ও পচাবাসি খাবার পরিবেশনের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।

পঞ্চমত, অনেক ভেজাল ও নকল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ভেজালকারীরা গা-ঢাকা দিয়েছে।

ষষ্ঠত, শুধু আমার একক অভিযানে এই পর্যন্ত ৫৫৪টা মামলায় ১ মাস হতে ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়েছে ১১৬ জনের এবং জরিমানা আদায় হয়েছে ৫৯,০৪,৪২০/- টাকা– এতে তেমন কোনো বাধাবিঘ্ন বা প্রতিরোধের সম্মুখীন হইনি।

সপ্তমত, ডাল ব্যবসায়ী সমিতি, হোটেল-রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতি, বেকারি ও বিস্কুট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি প্রভৃতি নিজেরাই ভেজাল-বিরোধী অভিযান শুরু করেছেন। এমনকি মৌলভীবাজারের গুঁড়ো দুধ ব্যবসায়ী সমিতি তাদের বিনষ্ট দুধ ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

অষ্টমত, ভেজালবিরোধী অভিযানের পর ডাক্তারদের মতে আমাশয় ও ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাবে কমে গেছে।

নবমত, ঔষধ ব্যবসায়ীদের মতে তাদের শতকরা দশভাগ ঔষধ বিক্রি কমে গেছে। অর্থাৎ মানুষের রোগব্যাধি হ্রাস পাচ্ছে এবং ঔষধ কম কিনতে হচ্ছে।

দশমত, ভেজালবিরোধী অভিযানের ফলে মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্যে পূর্বে যে বেশি পরিমাণে ভেজালের মাত্রা পাওয়া যেত, সেই তুলনায় বর্তমানে ভেজালের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। এটা কোনো অনুমানভিত্তিক কথা নয়– এটা বর্তমানে প্রমাণিত। ড. মাহফুজুর রহমানের মতে– ভেজালবিরোধী অভিযানের ইতিবাচক ফল পেতে আমরা অবশ্যই শুরু করেছি। বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর খানিকটা হলেও মান উন্নত হয়েছে। খাদ্যমানের কতখানি উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। (নিরাপদ খাদ্য: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট এবং আমাদের প্রয়োজনীয়তা, ড. শাহ মাহফুজুর রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফুড সেফটি প্রোগ্রাম, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা)।

একদশত, ভেজালবিরোধী অভিযানের পর ঢাকা শহরের বেশ কিছু হোটেল-রেস্টুরেন্টে পরিবেশগত ও গুণগত মান-এর উন্নতি সাধিত হয়েছে। অপরিষ্কার ও নোংরা পাকঘরে টাইলস বসিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত করা হয়েছে।

দ্বাদশত, ঢাকায় ভেজালবিরোধী অভিযানের প্রভাবে প্রত্যন্ত উপজেলায় বিভিন্ন হাটবাজারে ভেজাল খাবার ও উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

ত্রয়োদশত, সরকার বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ সংশোধন করেছেন ও শাস্তির পরিমাণ বাড়ানোসহ অনেক নতুন বিষয় সংযোজন করেছেন।

চতুর্দশত, বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে ও প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে ইত্যাদি।

সুপারিশ

সারাদেশে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে ভেজালবিরোধী অভিযান আরও ব্যাপকভাবে শুরু করা প্রয়োজন। সর্বশেষ একটা কথা বলা প্রয়োজন। ভেজালবিরোধী অভিযানে দল মত নির্বিশেষে পুরো জাতি যেরূপ এককভাবে মিলিত হয়েছেন তা অভাবনীয় ছিল আমাদের কাছে। এ প্রসঙ্গে আবারো বলব এক্ষেত্রে আমাদের মিডিয়াগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি। ভেজালকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আমাদের মিডিয়াগুলো যে আকর্ষণীয় জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করেছেন আগামীতেও যে কোনো জাতীয় স্বার্থজড়িত জাতীয় সমস্যা মোকাবেলায় যদি আমাদের মিডিয়াগুলো এরূপ অভিন্ন ভূমিকা পালন করেন তাহলে আমাদের দেশ ও পুরো জাতি সীমাহীন উপকৃত হবে।

ফরমালিনের সাথে বসবাস : মাছে ফরমালিন সনাক্ত

আমরা দীর্ঘদিন শুনে আসছিলাম যে, বাংলাদেশের সর্বত্র মাছের মধ্যে ক্ষতিকর ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে। তা প্রাথমিকভাবে কিছুটা নিশ্চিত হওয়া গেল তখন, যখন বিভিন্ন বাজার দর্শন করে দেখা যায় যে, বরফ ছাড়া দিনের পর দিন একই মাছ ফেলে রাখা হয়েছে এবং সন্ধ্যা বা রাত যাবার পরও ছোট ছোট মাছ (যেমন কাচকি, মলা, পুঁটি, ছোট চিংড়ি, ছেউয়া) গুলোতে পচনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। দীর্ঘক্ষণ পরেও ছোট মাছগুলো ঝরঝরে তরতরে উজ্জ্বল দেখা যায়। বিষয়টা আমি আরও নিশ্চিত হবার জন্য ২০০৬ সালের মার্চের ২২ তারিখ সকালবেলায় পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি মহাখালী ঢাকায় তৎকালীন চিফ ডা. জহুরুল ইসলাম মহোদয়ের কাছে জানতে চাইলাম যে, মাছে ফরমালিন সংযুক্তির বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কিনা? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, মাছে ফরমালিন মেশানো হচ্ছে। এটা তিনি ভালো করে জানেন এবং বাজার হতে ফরমালিন দেয়া মাছ কেনা অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা কিভাবে সনাক্ত সম্ভব জানতে চাইলে চিফ স্যার বলেন, ফরমালিনযুক্ত মাছ নাকের কাছে নিলে এক ধরনের ঝাঁঝালো গন্ধ অথবা ইঁদুর পচার মৃদু গন্ধ পাওয়া যাবে। এটাকে সূত্র ধরে আমি ফরমালিনযুক্ত মাছের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি (অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাছে ফরমালিন দেয়া হচ্ছে এটা জানার পর প্রায় এক বছর আমি গোপনে চেষ্টা করেছি মাছের বাজারে ফরমালিন ধরার জন্য। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা এটা অত্যন্ত গোপনে করে এবং ফরমালডিহাইড পানিতে মেশানোর পরে অথবা বরফের সাথে মেশানোর পরে মাছে সংযুক্তি শেষে এটা কেমিক্যাল টেস্ট ছাড়া সনাক্ত করা সম্ভব নয়)।

অতঃপর ২২ ও ২৮ মার্চ ২০০৬ তারিখে নিউমার্কেট, শান্তিনগর ও কাওরান বাজারের মাছের দোকানে অভিযান করে বিদেশি রুই-কাতলা এবং দেশীয় বাইলা, চিংড়ি ও পোয়া মাছসহ ১১টি নমুনা সংগ্রহ করি। পরীক্ষার জন্য বিএসটিআই ও পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিতে যোগাযোগ করি। কিন্তু ফরমালিনযুক্ত মাছ পরীক্ষা করার মতো তাদের যন্ত্রপাতি-কলাকৌশল (Equipments and devices) না থাকায় অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ ব ম ফারুক স্যারের সাথে যোগাযোগ করি এবং তিনি মাছে ফরমালিন পরীক্ষা করে দিতে সম্মত হন। অতঃপর অধ্যাপক আ ব ম ফারুক ও আবু শারা মো. শামসুর রউফ যৌথভাবে উক্ত ১১টি মাছ পরীক্ষা করে ৯টির মধ্যে ফরমালিন সনাক্ত করেন। শুধু তাই নয়, উক্ত ১১টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ টার কানকোতে অরেঞ্জ টেক্সটাইল কালার এবং ১টির মধ্যে লাল টেক্সটাইল কালার প্রমাণিত হয়। (ফরমালিন সংযুক্ত মাছ যেহেতু প্রকৃতপক্ষে পচা– তাজা নয়, সেহেতু মাছের কানকোতে রং ও রক্ত ব্যবহার করা হয়, যাতে লাল দেখা যায় এবং লাল কানকোওয়ালা মাছ তাজা মনে করে ক্রেতারা কিনে প্রতারিত হন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে মাছের দোকানে এসব ক্ষতিকর রঙের কৌটা প্লাস্টিকের প্যাকেটসহ হাতেনাতে আটক করা হয়)।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের সমস্ত হাটবাজারে মাছের মধ্যে এসব ক্ষতিকর ফরমালিন ও রঙ ব্যবহার করা হচ্ছে (এমনকি চট্টগ্রামে লটিয়া মাছের মধ্যে রঙ ব্যবহার করা, ঢাকার কাওরানবাজারে রুই, কাতলা মাছের

পাশাপাশি পোয়া মাছ, রিটা মাছ ও চিংড়ি মাছের মধ্যে রঙের ব্যবহার স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি) এবং সমস্ত জাতি প্রতিদিন এই বিষ খেয়ে যাচ্ছেন। জাতিকে এই বিষ সেবন হতে রক্ষা করার জন্য সরকারের সর্বোচ্চ মহল হতে শুরু করে প্রতিটি জায়গায় আমি এটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

একথা সত্য যে, আমার একার পক্ষে সারা বাংলাদেশে ফরমালিন দেয়া বন্ধ করা সম্পূর্ণ সম্ভব হবে না। তাছাড়া আজ হতে ২৫/৩০ বছর আগে আমাদের দেশে মাছে ফরমালিন ব্যবহার করা হত না। যতদূর জানা যায়, আজ হতে ১৯/২০ বছর আগে একটা বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ হতে সর্বপ্রথম ফরমালিনযুক্ত মাছ আমাদের দেশে পাঠানো শুরু হয়। বিষয়টা জানার পর এক পর্যায়ে ঐ দেশ থেকে মাছ আনা কিছুটা কমে যায়। মূলত ঐ বিদেশি মাছ আমদানি হতে আমাদের দেশের অসাধু লোকেরা মাছে ফরমালিন ব্যবহারের খারাপ বিষয়টা রপ্ত করে। আমি মনে করি পুরো জাতিকে এই ফরমালিনযুক্ত মাছ তথা বিষ খাওয়া হতে রক্ষা করা প্রয়োজন। ফরমালিনযুক্ত বিদেশি মাছ আমদানি নিষিদ্ধ করা, চোরাচালানি বন্ধ করা এবং দেশের অভ্যন্তরে মাছে ফরমালিন ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সরকারের নীতি-নির্ধারক মহলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে আমি সরকারকে জানানো একান্ত দায়িত্ব-কর্তব্য মনে করি।

মাছে ফরমালিন প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য আমার মোবাইল মামলা নং ৭, তারিখ ২৮/৩/২০০৬ইং, ধারা দ.বি. ২৭২/২৭৩-এর আদেশের কপি ১. মাননীয় মুখ্য সচিব, ২. মহামান্য রাষ্ট্রপতি সচিব, ৩. স্বরাষ্ট্র সচিব, ৪. স্বাস্থ্য সচিব, ৫. স্থানীয় সরকার সচিব, ৬. খাদ্য সচিব, ৭. মৎস্য সচিবসহ খাদ্য-সংশ্লিষ্ট সকল সচিব মহোদয়ের নিকট কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করি। এতে কিছুটা কাজ হয়। মাননীয় মুখ্য সচিব মাছে ফরমালিন বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৭ জুলাই ২০০৬ তারিখে নীতি-নির্ধারণের জন্য সভার মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কিন্তু তা বেশিদূর এগোয়নি। সাম্প্রতিককালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে অন্যান্য অনিয়ম প্রতিরোধের পাশাপাশি মাছে ফরমালিন বন্ধ করার বিষয়টি স্থান পায়। এই বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে প্রথম আলোচনা করেন সেকেন্ড বেঙ্গল (জুনিয়র টাইগার্স)-এর সিও লে. কর্নেল নূরুল হুদা মহোদয়। তিনি প্রয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অতঃপর সেনাবাহিনীর তৎকালীন চিফ লে. জেনারেল মইন ইউ আহমেদ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ সকল প্রকার সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে তৎকালীন মাননীয় উপদেষ্টা ড. সিএস করিম, কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় মহোদয় ফরমালিন বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং FAO-এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পরীক্ষার জন্য থাইল্যান্ড হতে কিট বক্স আনার ব্যবস্থা করেন এবং মাছে ফরমালিন পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব এস এম জহুরুল ইসলাম ও মৎস্য সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানের

সার্বিক সহযোগিতায় সকল প্রস্তুতি শেষে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে লে. কর্নেল হুদা পরিবেশ অধিদপ্তরের কেমিস্ট খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান ও ড. আবুল কালাম আজাদসহ রায়সাহেব বাজারে (কোতোয়ালি, ঢাকা) বিদেশি ৩টি রুই মাছ এবং দেশি ১টি কাতলা মাছ মোট ৪টি দোকানের মাছ তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করে ফরমালিন সনাক্ত হয়। কিন্তু এর চেয়ে বড় অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল। লে. কর্নেল হুদা, মেজর জাহিদ, মেজর ফরহাদসহ সেকেন্ড বেঙ্গল-এর প্রায় ৬০ জন সৈনিক এবং মৎস্য কর্মকর্তা নাজিম উদ্দিন আহম্মেদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কেমিস্ট খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান ও ড. আবুল কালাম আজাদসহ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে ভোর ৩টা হতে সকাল ৯টা পর্যন্ত ঢাকার সোয়ারিঘাটে ১১টি মাছের দোকানে/আড়তে মাছ পরীক্ষা করি। এতে ৬টি মাছের আড়তে বিদেশি বার্মিজ ও ভারতীয় রুই-কাতলা এবং আমাদের দেশীয় চিংড়ি ও ছেউয়া মাছের মধ্যে ফরমালিন সংযুক্তি ধরা পড়ে এবং ফরমালিনযুক্ত ১৬৪ মণ রুই-কাতলা, ৫ মণ ছেউয়া ও ১০ কেজি বড় চিংড়ি মাছ জব্দপূর্বক ঢাকা সিটি করপোরেশনের ইন্সপেক্টর মো. ফখরুদ্দিন মোবারকের সহযোগিতায় মাতুয়াইলে মাটির নিচে পুঁতে ধ্বংস করা হয়।

বিষয়টি ছিল সবার কাছে অভাবনীয়। সবার ধারণা ছিল জরিমানা করে মাছ ছেড়ে দেয়া হবে। কিন্তু দোষী ব্যক্তিদের জরিমানাসহ এক বছর করে কারাদণ্ড দেয়ার পাশাপাশি ১৬৯ মণ ফরমালিনযুক্ত মাছ মাটিতে পুঁতে ফেলার এই নজিরবিহীন ও যুগান্তকারী ঘটনায় ভেজাল প্রতিরোধে এক আতঙ্ক সৃষ্টি হয় (অবশ্য বিগত দুই বছর যাবত আমি ঢাকা শহরের বিভিন্ন ফোরামে যেমন ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তন, পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তন, প্রেসক্লাব (ভিআইপি লাউঞ্জ), গ্র্যান্ড আজাদ হোটেল অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফরমালিনযুক্ত মাছ ধ্বংস করার বিষয়ে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে আসছিলাম এবং সকলেই বলেছেন যে, আপনি কাজ করেন– আমরা আপনার সাথে আছি)। আমাদের এই কঠিন পদক্ষেপের কারণে ফরমালিনযুক্ত মাছের বাজারে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। বিদেশি মাছ প্রায় এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রামে লটিয়া মাছের মধ্যে রঙ ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। মাছে বরফ ব্যবহার হয়। কোনো কোনো বাজারে বিকালে মাছের পচন শুরু হতে দেখা যায়। মাছে মাছি বসতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, মাছবিক্রেতাগণ নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তারা মাছ পরীক্ষা করার সহযোগিতা চান এবং ফরমালিনযুক্ত মাছ বিক্রি করবেন না। সরকারিভাবে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বেসরকারি উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ফরমালিন পরীক্ষা করার জন্য কিট-যন্ত্রপাতিসহ ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন (শুধু তাই নয়, তৎকালীন মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা ড. সিএস করিম মহোদয়ের নির্দেশে তৎকালীন পরিবেশ ও বন সচিব এসএম জহুরুল ইসলাম ও তৎকালীন মৎস্য সচিব আতাউর রহমান মহোদয়ের সাথে বাংলাদেশ ফিস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাহমুদুল করিমসহ আমি কক্সবাজার সার্কিট হাউজে ১ মার্চ ২০০৭ তারিখে মাছ আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের সাথে

মতবিনিময় সভা করি এবং ২ ও ৩ মার্চ টেকনাফ বন্দরে বার্মিজ মাছের ৫টি নমুনা পরীক্ষা করে কোনো ফরমালিন সনাক্ত হয়নি। যা খুবই আশাব্যঞ্জক।

মাছে ফরমালিন ব্যবহার করা ছাড়াও সাম্প্রতিক কালে আপেল, আঙুর, নাশপাতিসহ বিভিন্ন ফলের মধ্যেও ফরমালিন ব্যবহার হয়। বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। যা পুরো জাতির জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনছে। জাতীয় স্বার্থে মাছে ফরমালিন ব্যবহার বন্ধসহ সকল খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন ব্যবহার বন্ধ করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

মাছে ফরমালিন ব্যবহার বন্ধ করার জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা

১. আমদানিকৃত মাছে কোথায় ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে তা নির্ণয় করা অর্থাৎ ফরমালিন বিদেশে দেয়া হচ্ছে, না আমাদের দেশে আমদানির পর দেয়া হচ্ছে তা নির্ণয় করা। এই উদ্দেশ্যে বার্মা হতে আমদানিকৃত মাছ টেকনাফ স্থলবন্দরে আসার সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে সেখান হতে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষা করা।

রাসায়নিক পরীক্ষায় যদি ফরমালিন শনাক্ত হয় তবে বিদেশ হতে মাছ আমদানি নিষিদ্ধ করা। যদি তাতে ফরমালিন শনাক্ত না হয় তাহলে মাছের গোডাউন (কোল্ড স্টোরেজ) বা আড়তে কোথায় ফরমালিন মেশানো হচ্ছে তা গোপনে অনুসন্ধান করা।

২. আমাদের দেশীয় মাছে ফরমালিন কি পাইকারি বিক্রেতা অথবা খুচরা বিক্রেতারা মেশাচ্ছে তা শনাক্ত করার জন্য ঢাকার বুড়িগঙ্গা ঘাট, যাত্রাবাড়ি, কাওরানবাজার আড়ত, চট্টগ্রাম ফিশারি ঘাট, চাঁদপুর মাছঘাটসহ বিভিন্ন ঘাট ও আড়ত হতে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষা করা। যদি তাতে ফরমালিন শনাক্ত হয় তাহলে বুঝতে হবে পাইকারি বিক্রেতারাই ফরমালিন মেশাচ্ছে। আর যদি তাতে শনাক্ত না হয় তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে, খুচরা বিক্রেতারা ফরমালিন মেশাচ্ছে।

৩. বিভিন্ন মৎস্য আহরণস্থল ও মাছবাজারে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে কখন কিভাবে ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে তার তথ্য সংগ্রহ করা এবং তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক মোবাইল কোর্টকে সহযোগিতা করা।

৪. ফরমালিন পরীক্ষা করার জন্য সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ, কেমিস্ট্রি, বায়োকেমিস্ট্রি, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক জব্দকৃত বিনা ফিতে পরীক্ষা করার জন্য কার্যকর অনুরোধ করা।

৫. তথ্য সংগ্রহের জন্য বেসরকারি গোপন সোর্স নিয়োগ করা এবং অভিযানে সফল হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞ সি.এম.এম.-এর মাধ্যমে সোর্সকে পুরস্কৃত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া ।
৬. মাছে ফরমালিন ব্যবহারকারী প্রকৃত অপরাধী শনাক্ত হলে তাকে তাৎক্ষণিক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উপযুক্ত সাজা প্রদান ।

৭. সারা দেশে প্রতিটি মাছের আড়ত ও বাজারে ফরমালিন রং বা ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার না করার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো । মোবাইল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট বিশুদ্ধ খাদ্য আইনে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা বা ৩ (তিন) বছর কারাদণ্ড দেয়া হবে এই মর্মে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, রেডিও, সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচার করা এবং প্রতি বাজারে বাজারে মাইকিং, ঢোল সহরত করা । সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, বাজার কমিটিকে প্রচারের জন্য নির্দেশ দেয়া যেতে পারে । সামাজিক সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি (social awareness and motivation programme) গ্রহণ করা যেতে পারে। লিফলেট প্রচারপত্র ব্যাপকভাবে বিলি করা এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ।

৮. মোবাইল কোর্টের সাথে একজন কেমিস্ট বিশেষজ্ঞ সংযুক্ত করা ।

৯. প্রতিবেশী দেশ হতে চোরাচালানের মাধ্যমে কোনো স্মাগলার মাছ যাতে বাংলাদেশে না আনতে পারে সেজন্য সীমান্ত বিডিআর ও কোস্ট গার্ডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান ।

১০. মোবাইল কোর্টের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক জিপ এবং সার্বক্ষণিক কিছুসংখ্যক বিডিআর, পুলিশ নিয়োজিত রাখা ।

১১. কোনো মাছের আড়ত বা কোল্ডস্টোরেজে যদি রাতে ফরমালিন মেশানোর খবর জানা যায় তবে রাতেই অভিযান পরিচালনা করে আটক করা ।

১২. মাছ ব্যবসায়ী, বিক্রেতা ও জেলেদের একেবারে ভিতরেই সোর্স সৃষ্টি করা । যাতে একেবারে ভিতর হতে নির্দিষ্টভাবে ফরমালিন ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায় ।

১৩. বিশুদ্ধ খাদ্য আইন-সংশোধন ২০০৫-এর ৪৪/৬(এ) ধারার বিধান কার্যকরী করে মাছ ব্যবসায়ী, মাছবিক্রেতাদের কাছে ফরমালিন বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ ।

১৪. দেশের অভ্যন্তরে পানিভর্তি বালতি বা ড্রামের মধ্যে ফরমালিন মিশিয়ে তাতে মাছ চুবিয়ে ফরমালিন সংযুক্তির অভিযোগ আছে । বিশেষ করে ছোট মাছ ও চিংড়ি মাছে ফরমালিন বেশি ব্যবহার করা হয় মর্মে জানা যায় । এমতাবস্থায় প্রতিটি মাছবাজারে, আড়তে, কোল্ডস্টোরেজে অভিযান পরিচালনা করে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে সায়েন্স

ল্যাবরেটরি, মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট, ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণপূর্বক পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ফি ও বিশেষজ্ঞ, পরীক্ষকদের উপযুক্ত সম্মানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত পূর্ণাঙ্গভাবে চালু না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞ সিএমএম মহোদয়কে কন্টিনজেন্সি বাবদ (সোর্স মানি, ফটোকপি, যাতায়াত খরচ, কম্পিউটারাইজড খরচ ইত্যাদি) কিছু অনুদান বরাদ্দ ও ১টা জিপ দেয়া যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

১. মাছের মধ্যে ফরমালিন, রঙ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য শনাক্ত ও পরীক্ষার জন্য বিএসটিআই পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিতে অত্যাধুনিক প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা এবং শক্তিশালী করা এবং প্রতিটা জেলা সদরে ল্যাবরেটরি স্থাপন করা।

২. মাছে ফরমালিন শনাক্ত করার জন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

৩. মোবাইল কোর্ট চলাকালে মাছে ফরমালিন তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করার জন্য উন্নত বিশ্বে অত্যাধুনিক কোনো মেশিন আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা এবং থাকলে তা সংগ্রহ করা।

৪. ভেজালবিরোধী অভিযানে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিদের পুরস্কার প্রদান করে উৎসাহিত করা।

৫. বিশুদ্ধ খাদ্য আইন (সংশোধিত ২০০৫)-এর ধারা মোতাবেক প্রত্যেক জেলায় বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা করা এবং সৎ, সাহসী, নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ দান এবং অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন ও বিশেষজ্ঞ, কেমিস্ট নিয়োগ করা।

৬. ফরমালিনসহ ভেজাল খাদ্যদ্রব্য, রাসায়নিক পদার্থ ও রঙ-এর ব্যবহারের ফলে শারীরিক রোগ-ব্যাধি ও পারিপার্শ্বিক ক্ষতি সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৭. অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যেও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, রং ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য উপরোক্ত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। শেষ বাজারে বিকেলে বা রাতেও দেখা যায় ছোট ছোট মাছগুলো কড়কড়া, ঝরঝরা। আসলে এগুলো ফরমালিন মেশানো পানি হতে তোলা। এগুলো খাওয়া উচিত নয়। এছাড়া ক্রেতাসাধারণকে মাছ কেনার সময় অধিকতর সতর্ক হতে

হবে। ফরমালিনযুক্ত মাছ গন্ধ নিলেই বোঝা যায়। ফরমালিনের এক ধরনের গন্ধ আছে, নাকের কাছে নিলেই তা টের পাওয়া যায়। ফরমালিনযুক্ত মাছ কেনা পরিহার করতে হবে।

মাছের কানকোতে লাল দেখানোর জন্য রঙ ও রক্ত ব্যবহার করা হয়। কানকোর ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে পরিষ্কার করলে দেখা যাবে কানকো সাদা। তাতে বোঝা যাবে উক্ত মাছ পচা ও ফরমালিনযুক্ত। তাছাড়া ফরমালিনযুক্ত মাছের চোখ ভেতরে ঢুকে যায় এটার মাধ্যমেই শনাক্ত করা সম্ভব। প্রতিটা মানুষের জীবন ও সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ফরমালিনযুক্ত মাছ কেনা ও খাওয়া বন্ধ করা প্রয়োজন।

মাছে ফরমালিন বুঝার উপায়

মাছের গায়ে বা ফুলকায় পিচ্ছিলভাব থাকে না।
মাছের আঁইশের স্বাভাবিক চকচকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। নতুবা খসখসে হয়ে যায়।
নাকের কাছে নিলে মাছের গা থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ বের হয়, স্বাভাবিক আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় না।
মাছের গায়ে মাছি বসে না, আর বসলেও সাথে সাথে উড়ে যায়, স্থায়ীভাবে বসে থাকে না।
চোখ ঘোলাটে দেখায়।
মাছের ফুলকা কালচে দেখায়।
মাছের গন্ধ নিতে গেলে চোখ জ্বালা করে।

ফরমালিনযুক্ত মাছ খেলে মানুষের প্রধানত কী কী ক্ষতি হতে পারে?

ক্যান্সার।
শ্বাসকষ্ট ও এজমা।
বদহজম, পেটে জ্বালা-যন্ত্রণা, আলসার, বমি।
চোখে জ্বালা-পোড়া, ছানি পড়া।
কিডনি ও লিভারের রোগ।
চর্মরোগ, এলার্জি।
ক্রমাগত মাথাব্যথা, মানসিক ভারসাম্য নষ্ট।

মাছে ফরমালিন ব্যবহার করলে যা হয়

মাছের আমিষ ও অন্যান্য পুষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।
মাছের আমিষের সঙ্গে ফরমালিন মিশে তৈরি হয় কার্বামেট নামক ভয়ংকর বিষ।

পানি, ভিনিগার বা খারযুক্ত পানি দিয়ে হাজার ধুলেও মাছ থেকে এ বিষ আর দূর করা যায় না। এমনকি মাছ পানিতে অনেকক্ষণ সিদ্ধ বা ওভেনে গ্রিল করলেও কার্বামেট বিষ নষ্ট হয় না। ফরমালিন-দেওয়া মাছ খাওয়ার পরিণতি হল অকাল মৃত্যু।

ভেজালবিরোধী অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে

(৩ এপ্রিল ২০০৫ থেকে ১৩ জুন ২০০৫ পর্যন্ত) বহুল আলোচিত ভেজালবিরোধী অভিযান মূলত আমি শুরু করেছিলাম ৩ এপ্রিল ২০০৫ খ্রি. হতে। বিএসটিআই-এর তৎকালীন ডিজি (অতিরিক্ত সচিব) আব্দুল হক চৌধুরী মহোদয়ের উদ্যোগে তৎকালীন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জালাল আহমদ স্যারের নির্দেশে বস্তুত বিএসটিআই-এর আওতাভুক্ত খাদ্যপণ্য সামগ্রীর মধ্যে গুণগত মান এবং উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলা যায় নকল পণ্য ধরার পাশাপাশি আমাদের অন্যতম কাজ ছিল খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট, টিন, বোতল, কৌটা ইত্যাদির লেবেল উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দিতে উৎপাদনকারী/ প্রস্তুতকারীদের বাধ্য করা। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। আমি মনে করি যার যতটুকু অবদান ততটুকু স্বীকৃতি দেয়া উচিত। আমাদের এই কাজের পেছনে যার সবচেয়ে বেশি অবদান, তিনি হচ্ছেন বিটিভির ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় উপস্থাপক হানিফ সংকেত। তিনি নীরবে এক বিশাল দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আমরা মোবাইল কোর্ট শুরু করার আগে তিনি ঢাকা শহরের বিভিন্ন দোকান হতে মেয়াদ-উত্তীর্ণের তারিখবিহীন বিস্কুট, চকোলেট, চিপস, আইসক্রিম, চানাচুর, ব্রেডসহ ১২০ ধরনের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং এগুলো বিএসটিআই কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার অনুরোধ জানাতেন, এই বিষয়ে মোবাইল কোর্ট করার জন্য। বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট না থাকায় সীমাবদ্ধতার কথা প্রকাশ করেন। তখন হানিফ সংকেত তাদেরকে জোর দিয়ে বলেন, সরকারের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট চাওয়ার জন্য। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তৎকালীন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জালাল আহমেদ মহোদয়ের নিকট ম্যাজিস্ট্রেট চান। সি.এম.এম মহোদয় সৌভাগ্যবশত আমাকে নিয়োগ করেন বিএসটিআই-এর মোবাইল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে। বিএসটিআই-এর পরিদর্শক কে এম হানিফসহ সকল অফিসার এই সময় সাহস ও আন্তরিকতার সাথে মোবাইল কোর্টে দায়িত্ব পালন করেন।

অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়

(১৪ জুন ২০০৫ থেকে ৯ জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত) ১৪ জুন ২০০৫ তারিখে 'দি ডেইলি স্টার' পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় একটি ছবি ছাপানো হয়। তাতে দেখানো হয় তরল কেমিক্যালের গামলায় চুবিয়ে কিভাবে আমকে রঙিন করা হচ্ছে। আমি শুনেছি এই

ছবিটা দেখে তৎকালীন মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সি.এম.এম মহোদয়কে নির্দেশ দেন সমস্ত ফলের আড়তে অভিযান চালিয়ে কেমিক্যাল আটক করার জন্য। সি.এম.এম মহোদয় আমাকে কোর্ট থেকে নামিয়ে এনে নির্দেশ দেন তাড়াতাড়ি কোর্ট শেষ করে তেজগাঁও এলাকায় কাওরানবাজারসহ বিভিন্ন ফলের আড়তে অভিযান চালানোর জন্য ও কেমিক্যাল আটক করার জন্য। আমি তেজগাঁও থানায় গেলাম।

প্রচণ্ড বৃষ্টি। বৃষ্টি শেষে সন্ধ্যায় ডিসিসি পরিদর্শক ফখরউদ্দিন মোবারক আসলেন। দুপুরের পর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। শেষে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় মোবাইল কোর্ট করব কিনা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম, কিন্তু তেজগাঁও থানার ওসি কামরুল ইসলাম বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বললেন, কাওরানবাজার এলাকায় অন্তত একটি অভিযান পরিচালনা করা দরকার। কারণ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক স্বয়ং ডিএমপি কমিশনার মহোদয় সরাসরি ফোন করে তাঁকে পুলিশ দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। থানাও এ ব্যাপারে অপ্রস্তুত থাকায় মাত্র ৩ জন পুলিশ দিতে সক্ষম হলেন। মাত্র ৩ জন পুলিশ (এসআই সাইদুর রহমান, কনস্টেবল নং ১০১৭৮ মোজাম্মেল, কনস্টেবল নং ২১৪৮৪ মজিবর রহমান)-কে সাথে নিয়ে কাওরানবাজারের বিশাল আম ও কলার আড়তে অভিযান শুরু করলাম। একটা কলার আড়তে কয়েক বোতল কেমিক্যালসহ মালিককে গ্রেফতার করলাম। এরপর ছয়টা আমের আড়তে বিভিন্ন ঝুড়িতে তল্লাশি করে হাতেনাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ ৬ জনকে আটক করি। একদিকে রাত হয়ে গেল অন্য দিকে তিনজন পুলিশ নিয়ে কাওরানবাজারের বিশাল মার্কেট হতে ৭ জন আসামি নিয়ে অগ্রসর হওয়া কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সার্বিক বিবেচনায় ঐদিন রাতে দণ্ডবিধির ২৭২ ধারায় প্রত্যেক আসামিকে ১০০০/- টাকা করে জরিমানা করে ভবিষ্যতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার না করার জন্য সতর্ক করে মোবাইল কোর্ট শেষ করি। একই দিন ম্যাজিস্ট্রেট মামুনুর রশিদ বাদামতলি আমের আড়তে গিয়ে কার্বাইডসহ ৬ জনকে আটক করেন এবং প্রত্যেককে ছয়মাস করে কারাদণ্ড দেন। মূলত এদিন হতে শুরু হয়েছিল প্রকৃত ভেজালবিরোধী অভিযান এবং সৃষ্টি হয়েছিল একটা নতুন গতি।

তৃতীয় পর্যায়

(১০ জুলাই ২০০৫ হতে বর্তমান) ১০ জুলাই ২০০৫ খ্রি. তারিখে সি.এম.এম মহোদয় সকালে আমাকে ডেকে বললেন 'ইত্তেফাকে'র আবুল খায়েরের 'আমরা কী খাচ্ছি' সিরিজ রিপোর্টের বিষয়টি তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভেজালবিরোধী মোবাইল কোর্ট জোরদার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বলা যায় মূলত এদিন ১০ জুলাই ২০০৫ হতে ভেজালবিরোধী অভিযানের এক যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। আমি যখন দেখলাম তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভেজালের বিরুদ্ধে, তৎকালীন মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

ভেজালের বিরুদ্ধে, তখন আমার মনে এই বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, ভেজাল অভিযানের বিরুদ্ধে ভেজালের পক্ষে কেউ আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। সেদিন হতে আমি ভ্রাম্যমাণ আদালতের নতুন প্রেরণা ও নতুন সাহস পেলাম। এদিন হতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ভেজালের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমি অভিযান শুরু করব। পরদিন ১১ জুলাই আমি কাওরানবাজারে শুটকির আড়ত, আমের আড়ত, তরিতরকারির বাজারের পাশাপাশি ভিন্ন রকম একটা বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করি। 'ইত্তেফাকে'র সিনিয়র স্টাফ রির্পোটার আবুল খায়ের উক্ত অভিযানটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পরদিন পত্রিকায় প্রকাশ করেন (অবশ্য 'প্রথম আলো'তেও স্বল্প পরিসরে অভিযানটা প্রকাশ হয়েছিল)।

ভেজালবিরোধী অভিযানে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা

১. আমের আড়তে কেমিক্যাল কার্বাইড আটক : ১৪ জুন ২০০৫ খ্রি. তারিখে কাওরান বাজারে ৬টা আমের আড়তে কেমিক্যাল কার্বাইড উদ্ধারের পর ১৬/৬/২০০৫ তারিখে পুলিশের পাশাপাশি বিডিআরসহ অভিযান পরিচালনা করি, মিরপুর শাহ আলী মার্কেট, বটতলা আমের আড়তে। এদিন বিএসটিআই-এর অফিসাররাও আমাদের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১১ টা আমের আড়ত হতে কেমিক্যাল কার্বাইডসহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে দণ্ডবিধির ২৭২ ধারায় এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৮/৬/২০০৫ তারিখে কাওরানবাজারে দ্বিতীয়বারের মতো অভিযান পরিচালনা করি। ১৯টি আড়তে কেমিক্যাল কার্বাইডসহ ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮ জনকে ১ মাস করে কারাদণ্ড ও ১০০০/- টাকা করে জরিমানা করা হয় এবং ১ জন বয়স্ক লোক হওয়ায় ৩ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মোবাইল কোর্টের নিয়ম বা ট্রাডিশন হচ্ছে জরিমানা করা, কারাদণ্ড হচ্ছে ব্যতিক্রম। কিন্তু ভেজাল বন্ধের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কারাদণ্ড দেয়া শুরু করি এবং আমি এক সাক্ষাৎকারে বলেছি একদিনেই এক জায়গায় ১৯ জনতে কারাদণ্ড দেয়া মোবাইল কোর্টের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা (দৈনিক ইনকিলাব, পৃষ্ঠা ১৫, তারিখ ২৮/১০/২০০৫)। অতঃপর ১৯/৬/২০০৫ তারিখে মেরুল বাড্ডা আমের আড়তে অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে কেমিক্যাল কার্বাইডসহ আটক করি। ঘটনাচক্রে সেখানে জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ৫/৬ জন ফটোগ্রাফার হাজির হন এবং এই অভিযানের ছবি পরদিন 'দৈনিক আমার দেশ', 'প্রথম আলো', 'ইনকিলাব', 'সংবাদ'সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২০/৬/২০০৫ তারিখে হাজারিবাগ খলিল সর্দার কৃষি মার্কেটে কার্বাইডসহ ২ জনকে আটকপূর্বক ১ মাস করে কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। ২৩/৬/২০০৫ তারিখে মহাখালী কাঁচাবাজারে ২ জন, ২৬/৬/২০০৫ তারিখে মিরপুর শাহ আলী মার্কেটে (২য় বার) ৮ জন, ২৭/৬/২০০৫ তারিখে পল্লবী কালসী বাজারে

১০ জন, ১১/৭/২০০৫ তারিখে কাওরানবাজারে ১ জন, ২০/৭/২০০৫ ইং তারিখে মহাখালী ১ জনকে কার্বাইডসহ গ্রেপ্তারপূর্বক জেল-জরিমানার আদেশ হয়।

আমে কার্বাইডের ব্যবহার

আমের ঝুড়ির আমের মাঝখানে ভিতরে এক টুকরো কার্বাইড অথবা কার্বাইড গুঁড়ো করে ছিটিয়ে দেয়া হয়। কার্বাইডের তেজস্ক্রিয়তায় আম আগুনের মতো গরম হয়ে যায় এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আম হলুদ বর্ণ ধারণ করে ও পেকে যায়।

২. কলা পাকানোর কাজে কেমিক্যাল ব্যবহার

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে দেখা যায়, কলা তিনভাবে কৃত্রিম উপায়ে পাকানো হয়। প্রথমত ড্রামভর্তি কেমিক্যালমিশ্রিত পানির মধ্যে কলার ছড়াকে চুবিয়ে তোলার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। দ্বিতীয়ত, একটা আবদ্ধ চুল্লীজাতীয় ঘরে কেরোসিনের স্টোভ জ্বালিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন আগুন নিভে যায়। কেরোসিন স্বয়ং নিজেই গ্যাসে পরিণত হয়। সে ক্ষতিকর গ্যাসের ফলে ২৪ ঘণ্টায় কলা হলুদ রংয়ের হয়ে যায়। তৃতীয়ত, একটা গামলায় তুষের মধ্যে আগুন জ্বালানো হয়, উক্ত তুষ চুলার ভেতর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, তুষের গ্যাসে কলা কৃত্রিমভাবে পেকে যায়। ফলে বর্তমানে ঢাকা শহরের কলায় না আছে কোনো ঘ্রাণ, না আছে কোনো স্বাদ, না আছে কোনো গাছপাকা কলার মতো কোনো স্বাভাবিকতা। ২৭/৬/২০০৫ তারিখে পল্লবী কালসি বাজারে কলার আড়তে অভিযান করে প্রায় প্রতিটি আড়তে ড্রামভর্তি কেমিক্যাল মিশ্রিত রঙিন পানি পাওয়া যায়। তবে দুইজনকে হাতেনাতে আটক করা হয় এবং কেমিক্যাল ঢেলে ফেলে দেয়া হয়। এছাড়া কাওরানবাজারে কেরোসিনের গ্যাস দিয়ে কলা পাকানোর জন্য একজনকে ১৯/৭/২০০৫ তারিখে, ১৪/৬/২০০৫ তারিখে কলায় কেমিক্যাল ব্যবহারের জন্য ১ জনকে আটক করে জেল জরিমানা করা যায়।

৩. হোটেল-রেস্টুরেন্ট-ফাস্টফুড, ডাইনিং হল ও ক্যান্টিনে অভিযান

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন, ভেজালের আসল জায়গা বা প্রকৃত উৎসস্থলে আঘাত না করে বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটা হোটেলে দু-একটা মোবাইল কোর্ট করলে কোনো দিন ভেজাল বন্ধ হবে না। তবে সেই সাথে এটাও সত্য যে, বর্তমানে মানুষের কর্মব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেছে। দৈনিক আচার-নীতি জীবনযাত্রা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। অনেক মানুষ নিজের ঘরে রান্না করার বা খাওয়ার সময় পান না, বাইরের খাবারের ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় হোটেল-রেস্টুরেন্ট, ফাস্টফুড দোকানগুলোকে অবশ্যই আমাদের নিয়মের মধ্যে আনতে হবে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা কিছু কিছু জায়গায় অভিযান করি। ১১/৭/২০৫ তারিখে একটা থ্রি স্টার হোটেলে, ১২/৭/২০০৫ তারিখে মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেট এলাকায় চারটা ছোট ছোট

রেস্টুরেন্ট, ১৭/৭/২০০৫ তারিখে মতিঝিল এলাকায় একটি থ্রি স্টার হোটেল, ১৮/৭/২০০৫ তারিখে মোহাম্মদপুর-মিরপুর এলাকায় চারটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, ২৪/৭/২০০৫ তারিখে গুলশানে একটা অভিজাত রেস্টুরেন্ট ও ফাস্টফুডের দোকান, ২৮/৭/২০০৫ তারিখে নাজিমউদ্দিন রোডে ৬টি রেস্টুরেন্ট, ৪/৮/২০০৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন, মহসিন হলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন, ১১/৮/২০০৫ তারিখে পিজি হাসপাতালের দুইটা ক্যান্টিনে, ১৩/৮/২০০৫ তারিখে বেইলি রোডস্থ একটি বিখ্যাত বিরানি ঘরে অতঃপর জগন্নাথ হলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসের ডাইনিং হলে, ১৩/৯/২০০৫ তারিখে গুলশানের একটি তার্কিজ রেস্টুরেন্টে, ১৮/৯/২০০৫ তারিখে ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসে, ৬/১০/২০০৫ তারিখে ডেমরা এলাকার স্বামীবাগ, গেন্ডারিয়া, যাত্রাবাড়ী তিনটি হোটেলে অভিযান এবং ১২/১০/২০০৫ চকবাজারে ১৬টি খাবার দোকানে ও ফুটপাতে এবং ২০/১০/২০০৫ তারিখে সদরঘাটে ৬টি লঞ্চের খাবার রুমে, ২৭/১২/২০০৫ তারিখে সিদ্দিকবাজারের ৪টি হোটেলে অভিযান পরিচালনা করা হয়। থ্রি স্টার হোটেলগুলোতে দেখা যায় তাদের নিজস্ব প্রস্তুতকৃত ব্রেড ও বিস্কুটের গুণগত মান পরীক্ষা করাননি এবং বিএসটিআই-এর লাইসেন্স নেই। একটা থ্রি স্টার হোটেলের কিচেন রুমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখা যায়। সাধারণ চাইনিজ ও হোটেল, রেস্টুরেন্টগুলোর কিচেন মোটেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পচাবাসি খাবারের পাশাপাশি পোড়া তেল, রং ব্যবহার, কেমিক্যাল, গোলাপজল খাবারে প্রয়োগ, কিচেনে আবর্জনার স্তূপ, একই ফ্রিজে রান্না খাবার, কাঁচা মাছ-মাংস, বাটা কাঁচা মসলা, বাসি ভাত, একই সাথে ফুডিং ও দই-জাতীয় মিষ্টান্ন খাবার রাখা হয়– যা কিছুতেই বিধিসম্মত নয়। সবকিছু একসাথে ফ্রিজে রাখলে এক ধরনের বিষক্রিয়া হয়।

৪. বিস্কুট ও বেকারিতে অভিযান

২/৮/২০০৫ তারিখে লালবাগ দেবীদাস রোডে, ১৪/৮/২০০৫ তারিখে নারিন্দা, ১০/৮/২০০৫ তারিখে কাজী রিয়াজউদ্দিন রোড ও রাজনারায়ণ ধর রোডে, ১৬/৮/২০০৫ তারিখে দয়াগঞ্জ এলাকায়, ২৪/৮/২০০৫ তারিখে বকসিবাজারে, ১৫/৮/২০০৫ তারিখে হাজারিবাগে, ৮/৯/২০০৫ তারিখে জুরাইনে, ১১/৯/২০০৫ তারিখে সোয়ারিঘাট এলাকায়, ১৪/৯/২০০৫ তারিখে দয়াগঞ্জ এলাকায় মোট প্রায় ২০টি বেকারিতে এবং ২০/১০/২০০৫ তারিখে সদরঘাট এলাকার ৬টা কনফেকশনারিতে অভিযান করে দেখতে পাই প্রায় প্রতিটি বেকারিতে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষতিকর রং, নামবিহীন, লেবেলবিহীন বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া বাই কার্বনেট, সোডিয়াম বাই কার্বনেট, সোডিয়াম সাইক্লামেট, পচা ডিম, ভেজাল ঘি ও তেল, ফ্লেভার, সুগন্ধি কেমিক্যাল ইত্যাদি। অধিকন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অধিকাংশ লাইসেন্স-বিহীন। দেবীদাস রোডে একটি বেকারিতে পাওয়া যায় মবিলের মতো পোড়া তেল। একজন কর্মচারী স্বীকার করেন যে, তেলের সাথে মবিল

মেশানো হয়, এতে নাকি চানাচুর শক্ত হয়, ঝরঝরে থাকে। আমি বেকারির কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করি– নামবিহীন, লেবেলবিহীন কেমিক্যালের নাম কী? নাম তারা বলতে পারে না। কোথা হতে আনে জিজ্ঞাসা করলে বলে মিটফোর্ড হতে। পরে মিটফোর্ডে যখন একই রকম কেমিক্যাল আমি ধরি, তখন ব্যবসায়ীরা বলেন যে, ঐ কেমিক্যাল গোলাপজল ও আগরবাতি বানানোর জন্য বিক্রয় করে। অথচ সেই কেমিক্যাল বেকারিতে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো কারখানায় শ্রমিকদের ঘাম ঝরে বিস্কুটের খামিতে পড়তে দেখা যায়।

৫. আইসক্রিম

২৯/৫/২০০৫ তারিখে মুনছুরাবাদ মোহাম্মদপুর, ৩/৮/২০০৫ তারিখে মিরহাজিরবাগ এলাকায় একটা আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, ৭/৯/২০০৫ তারিখে নারিন্দা এলাকায় তিনটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে অভিযান করে আমি দেখতে পেলাম কোনো রকমের বিশুদ্ধ করা ছাড়া ওয়াসার পানি দ্বারা সরাসরি নোংরা পরিবেশে আইসক্রিম বানানো হচ্ছে। টেক্সটাইল মিলের ডাইং রং দ্বারা রঙিন আইসক্রিম প্রস্তুত করা হচ্ছে। দুধের পরিবর্তে ময়দা ও ফ্লেভার ব্যবহার করা হচ্ছে। চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে সোডিয়াম সাইক্লামেট। একজন ম্যানেজার ও একজন মালিককে এক মাস করে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করি। পলাতক মালিকদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করি। ব্যবহৃত নোংরা পোস্টার জাতীয় কাগজ দ্বারা আইসক্রিমের উপরে আবরণ দেওয়া হয়েছে। কোনোটিরই বিএসটিআই-এর লাইসেন্স ছিল না। এছাড়া ঈগলু, পোলার, স্যাভয় এবং কিছু কিছু আইসক্রিমে মেয়াদ-উত্তীর্ণের তারিখ না থাকায় এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়।

৬.মিষ্টির কারখানা

২৭/৭/২০০৫ তারিখে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে একটি প্রসিদ্ধ মিষ্টির কারখানায় অভিযান করে যে নোংরা পরিবেশ দেখতে পাই তা অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। সেখানে পচা বাসি কিমা দুর্গন্ধযুক্ত বাটার, আর পাওয়া যায় টেক্সটাইল মিলের ডাইং রং। একটা টিনের কৌটায় লেখা ছিল ঁংব ভড়ৎ ড়হষু ঃবীঃরষব. কর্মচারীরা স্বীকার করেন যে সেই রঙ তারা লালচে দই প্রস্তুতে, লাল মিষ্টি ও কেক প্রস্তুতে ব্যবহার করে। সেখানে ৫ জনকে ১ মাস করে কারাদণ্ড সহ মালিকের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রুজু করা হয়। ২৮/৭/২০০৫ তারিখে নাজিমউদ্দিন রোডে অভিযান করে একটি মিষ্টির কারখানায় পাওয়া যায় লাল মিষ্টিসহ ১০০০ পাওয়ারের লাল রং। মালিককে একমাস কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৭/৮/২০০৫ তারিখে (সারা দেশে যেদিন বোমাবাজি হয়) লক্ষ্মীবাজারের একটি মিষ্টির কারখানায় অভিযান করে একই চিত্র পাওয়া যায়। সেই সাথে পাওয়া যায় এক গামলা পচা মিষ্টি, যার একটির অর্ধেক মালিক খেতে পারেননি। মালিককে দেয়া হয় এক মাস কারাদণ্ড। ১৮/৯/২০০৫ তারিখে চকবাজারে অবস্থিত বহুল প্রতিষ্ঠিত একটি মিষ্টির কারখানায়

অভিযান করে ভয়ানক নোংরা পরিবেশ দেখা যায়। পচা গাজর, রং ও কেমিক্যাল, গোলাপজল উদ্ধার করা হয়। ম্যানেজারকে কারাদণ্ড এবং দুই মালিকের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়। ২৫/৯/২০০৫ তারিখে দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি (ধোলাইরপাড়) এলাকায় একটি মিষ্টির কারখানায় চতুর্থবারের মতো অভিযান করেও পাওয়া যায় তিন ধরনের ডাইং রং, কেমিক্যাল, রংদানা। পাঁচজনকে ১ মাস করে কারাদণ্ড এবং মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করা হয় এবং ঐ কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়।

৭. ডিমের আড়তে কেমিক্যাল

কারো কারো কাছে শোনা যাচ্ছিল সাদা ডিমকে লাল করার জন্য কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে। ১২/৭/২০০৫ তারিখে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে একটা ডিম আড়তে পাওয়া যায় এক বালতি কেমিক্যাল। দোকানদার স্বীকার করেন যে প্রতি ডিমেই আট আনা বেশি লাভ হয় বলে সাদা ডিম ঐ কেমিক্যালে চুবিয়ে লাল করা হয়। মালিকসহ ২ জনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯/৭/২০০৫ তারিখে কলমিলতা বাজার, কাওরান বাজার, ২০/৭/২০০৫ তারিখে মহাখালী বাজারে ডিমের আড়তে অভিযান করে কৃত্রিম রঙিন ডিম আটক করা হয়। তবে হাতেনাতে কোনো কেমিক্যাল আটক করা সম্ভব হয়নি। ব্যবসায়ীরা কেমিক্যাল ব্যবহারের কথা স্বীকার করে একে অপরের ওপর দোষ চাপান। ২১/৮/২০০৫ তারিখে শুক্রাবাদ মোহাম্মদপুরে অভিযান করে আটক করা হয় প্রচুর পচা ও নষ্ট ডিম। যা কোনো কোনো বেকারিতে সরবরাহ করা হয়।

৮. চকলেটের কারখানায় রং ও কেমিক্যাল

১/৯/২০০৫ তারিখে দেবীদাস রোড, লালবাগ, ১৫/৯/২০০৫ তারিখে নাজিমউদ্দিন রোড ও নবাবের দেউরিতে অভিযান করে উদ্ধার করা হয় কয়েক প্রকারের ডাইং রং ও ক্ষতিকর কেমিক্যাল। তবে রং ও কেমিক্যাল উদ্ধার করা হয় স্টোররুম হতে। উৎপাদনের সময় মোবাইল কোর্টের ভয়ে কোনো রং ব্যবহার করা হচ্ছিল না। সাদা চকলেট প্রস্তুত করা হচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন যে পূর্বে রং ব্যবহার করতেন কিন্তু মোবাইল কোর্টের পর রং ব্যবহার করা তারা বন্ধ করে দিয়েছেন।

৯. সেমাই'র কারখানায় নোংরা পরিবেশ

১৫/৮/২০০৪ তারিখে হাজারিবাগের একটি সেমাই'র কারখানায় অভিযান করে দেখা যায় অত্যন্ত নোংরা পরিবেশ। অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন ঘরে মাকড়সার অসংখ্য জাল। সেমাই'র মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে ঝাড়ু, নোংরা ও ঘামযুক্ত শার্ট, ঘাম শুকানোর জন্য রেখে দেয়া হয়েছে সেমাই'র ওপর। অন্য দিকে উন্মুক্ত জায়গায় সেমাই শুকানো হচ্ছিল। সেখানে সেমাই'র মধ্যে অসংখ্য মাছি ভনভন করছিল। ১৮/৯/২০০৫ তারিখে সামসাবাদ নয়াবাজারে গিয়ে দেখতে পাই গাড়ির গ্যারেজের ভেতরে নোংরা পরিবেশে

একটি নামিদামি ব্রান্ডের লাচ্ছা সেমাই প্রস্তুত করা হচ্ছে। (তবে হক ও বম্বের মতো বড় বড় কারখানাগুলোতে উন্নত পরিবেশে লাচ্ছা সেমাই প্রস্তুত করতে দেখা যায়)।

১০. ওয়াসার পানি হচ্ছে মিনারেল ওয়াটার ও বিশুদ্ধ ড্রিংকিং ওয়াটার

৩/৪/২০০৫ তারিখে জনতাবাগ, শ্যামপুর, ৫/৪/২০০৫ তারিখে মদিনাবাগ, শ্যামপুর, হাটখোলা রোড, সূত্রাপুর, ২৪/৫/২০০৫ তারিখে রায়েরবাগ ধনিয়া, ২৯/৫/২০০৫ তারিখে মেরুল বাড্ডা, মনিপুর, মিরপুর, ২৩/৭/২০০৫ তারিখে শ্যামলী, শাহজাহানপুর, ২৮/৮/২০০৫ তারিখে আউটার সার্কুলার রোডে, ২৭/১২/২০০৫ তারিখে নীলক্ষেত মার্কেটে অভিযান করে দেখা যায় ওয়াসার পানিকে মিনারেল ওয়াটার বিশুদ্ধ পানি হিসেবে বোতলজাত ও পরিপ্যাক করা হচ্ছে কোনো রকমের শোধন ছাড়াই।

১১. নকল পণ্য :

৪/৪/২০০৫ তারিখে দেবীদাস রোড লালবাগে নকল ট্যাং, ১২/৬/২০০৫ তারিখে নিউ সুপার মার্কেটে নকল ম্যাগী নুডুলস, কাকরাইলে নকল নুডুলস, জনতাবাগ শ্যামপুর নকল ম্যাগী নুডুলস, ২৮/৮/২০০৫ তারিখে রহমতগঞ্জ লেনে নকল ম্যাগী নুডুলস, ২৮/৬/২০০৫ তারিখে দনিয়া রসুলবাগ শ্যামপুরে নকল ম্যাগী নুডুলস, ৩০/৮/২০০৫ তারিখে পল্টন এলাকায় নকল ট্যাং, ৩/৮/২০০৫ তারিখে মীরহাজিরবাগে নকল জর্দার কারখানায় অভিযান চালিয়ে আটক করা হয় এবং মামলা রুজু করা হয়। তাছাড়া জুরাইন ও সোয়ারিঘাট, লালবাগ এলাকায় পাওয়া যায় বিভিন্ন নামি ব্রান্ডের বিস্কুট ও নুডুলসের নকল কারখানা।

১২. ক্ষতিকর শুঁটকি

১০/৭/২০০৫ ও ১১/৭/২০০৫ তারিখে কাওরানবাজারে ৪৭টি শুঁটকির আড়ত ও দোকানে অভিযান পরিচালনা করে ক্ষতিকর ডিডিটি পাউডারযুক্ত শুঁটকি দেখা যায় এবং বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশে ৪৭ জনকে শাস্তি দেয়া হয়।

১৩. বিএসটিআই-এর লাইসেন্সবিহীন পণ্য

৪/৪/২০০৫ তারিখে শান্তিনগর এলাকায় আচার ও ঘি, ৫/৪/২০০৫ তারিখে পুরানা পল্টন এলাকায় সরিষার তেল, নারিকেল তেল, অনুমোদনবিহীন মধু ও ঘি বিদেশ হতে বাজারজাত করায় নয়াপল্টন এলাকায় ২৯/৬/২০০৫ তারিখে, ৬/৭/২০০৫ তারিখে গুলশানে ঘি প্রস্তুতের জন্য, ১৪/৭/২০০৫ তারিখে গুলশান-১ মার্কেটে বিদেশি কসমেটিক, দুধ, স্যাম্পু, চকোলেট, টুথপেস্ট, সাবান, জুস, নুডুলস, তেল, সস, বিস্কুট, লজেন্স, ২/৮/২০০৫ তারিখে মৌলভিবাজারে বিদেশি গুঁড়োদুধ, ১৯/৯/২০০৫ তারিখে মিরপুরে বিদেশি চিনি। ১৫/৯/২০০৫ তারিখে কাওরানবাজারে অনুমোদনবিহীন পামওয়েল, ভেজিটেবল ওয়েল ইত্যাদি বিএসটিআই-এর গুণগত মান পরীক্ষিত না হওয়ায় ও লাইসেন্স না থাকায় শাস্তি দেয়া হয়।

১৪. সুপার স্টোর

৪/৪/২০০৫ তারিখে শান্তিনগর, ৬/৭/২০০৫ তারিখে গুলশান-১, গুলশান-২, ৩/৯/২০০৫ তারিখে ধানমন্ডি, ৫/৯/২০০৫ তারিখে ধানমন্ডি, ৬/৯/২০০৫ তারিখে উত্তরায়, ১৬/১১/২০০৫ তারিখে গুলশানে এবং ২৬/১২/২০০৫ তারিখে কুড়িল প্রগতি সরণিতে মোট ৯ সুপার স্টোরে অভিযান করে পাওয়া যায় পচা মাছ, মেয়াদবিহীন চিনি, আটা, ময়দা, চানাচুর, বিস্কুট, সয়াবিন তেল, সরিষার তেল, চিপস, ব্রেড, গুঁড়ো দুধ, ডেক্সট্রোজ, আইসক্রিম, লজেন্স, জুস ইত্যাদি। আরো পাওয়া যায় মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদেশি জুসফ্লেবার। অধিকাংশ বিদেশি কসমেটিক মেয়াদবিহীন। হলুদ মরিচের প্যাকেটে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখবিহীন।

১৫. ঘি-এর কারখানায় কোনো দুধ নেই

৩১/৭/২০০৫ তারিখে রমাকান্ত নন্দী লেন পাটুয়াটুলী এলাকায় ১৭টি ঘি-এর কারখানায় অভিযান করে কোনো দুধ পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছে whey powder (যা দুধের ফেনা হতে প্রস্তুত করা হয় এবং যাতে দুধের কোনো গুণাগুণ নেই)। বনস্পতি (ডালডা), কেমিক্যাল, রঙদানা ইত্যাদি যার সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয় কথিত ঘি। জানা যায়, আলু ও কেমিক্যাল দিয়েও ঘি বানানো হয়। ১৮/৯/২০০৫ তারিখে আউটার সার্কুলার রোড সিদ্ধেশ্বরী গিয়ে কথিত একটা ঘি-এর কারখানায় কোনো দুধ পাওয়া যায়নি। ফলে ২ জনকে কারাদণ্ড দেয়া হয়।

১৬. মেয়াদ-উত্তীর্ণের তারিখ না দেওয়ার জন্য জরিমানা

২৯/৫/২০০৫ তারিখে কুলপি আইসক্রিম, ১২/৬/২০০৫ তারিখে কোকোলা ফুড প্রডাক্টস (দ্বিতীয়বার ১৫/৯/২০০৫), ২৫/৬/২০০৫ তারিখে বনফুল এন্ড কোং, ২৭/৬/২০০৫ তারিখে নাবিস্কো বিস্কুট এন্ড ব্রেড ফ্যাক্টরি (দ্বিতীয়বার ২৭/৯/২০০৫), ২৭/৬/২০০৫ তারিখে হক ব্রাদার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (দ্বিতীয়বার ২৯/৯/২০০৫), ২৮/৬/২০০৫ তারিখে সিটি গ্রুপের তীর আটা, ময়দা, সরিষার তেল, ইউসুফ ফ্লাওয়ার মিলস, মারিয়া ব্রেড এন্ড বিস্কুট, ৬/৭/২০০৫ তারিখে সুইট ম্যাক্স, ১৪/৭/২০০৫ তারিখে ফু-ওয়াং ফুডস (দ্বিতীয়বার ১৩/৯/২০০৫), ২১/৭/২০০৫ তারিখে স্যাভয় আইসক্রিম, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস, স্বাদ আটা, পোলার আইসক্রিম, ২৫/৭/২০০৫ তারিখে ঈগলু আইসক্রিম, ৪/৯/২০০৫ তারিখে মিল্কওয়ে এন্টারপ্রাইজ (প্রেসিডেন্ট আটা ময়দা), ১৫/৯/২০০৫ তারিখে সোনালী ট্রেডার্স, হাজী এন্ড সন্স, লাকসাম জেনারেল স্টোর (ময়দা), ১৯/৯/২০০৫ তারিখে মিল্ক ভিটা, তারেক স্টোর, বেঙ্গল ট্রেডার্স, শাহীন ট্রেডার্স, বেঙ্গল বিস্কুট ইত্যাদি কোম্পানির উৎপাদন সামগ্রীর প্যাকেটে মেয়াদ-উত্তীর্ণের তারিখ না থাকায় ১০ হাজার হতে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়। মেয়াদ-উত্তীর্ণের তারিখ না থাকায় ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। মোবাইল কোর্ট সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে মেয়াদ উল্লেখের বিষয়ে। এক্ষেত্রে কোনো কোনোটায় ৫০%, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮০%, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৯৯% সাফল্য এসেছে। তাছাড়া মেয়াদ-উত্তীর্ণ (২০০৪) বিদেশি বিস্কুট বিক্রির জন্য মিরপুর ১০-এর

একটা কনফেকশনারির মালিককে শাস্তি দেয়া হয়। অবৈধভাবে বিএসটিআই-এর সিল ব্যবহারের জন্য ২৯/৫/২০০৫ খ্রি. তারিখে মনছুরাবাদ মোহাম্মদপুরে, ২৫/৬/২০০৫ তারিখে রোকেয়া সরণিতে, ২/৮/২০০৫ তারিখে চকবাজারে অভিযান চালিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠানকে শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

১৭. ভেজাল গুঁড়োদুধ

মৌলভিবাজারে পাওয়া যায় বিএসটিআই-এর অনুমোদনবিহীন বহু গুঁড়োদুধ। গোডাউনে সংরক্ষিত ছিল ছেঁড়া ও জমাট-বাঁধা দুধের বস্তা। ৪/৯/২০০৫ তারিখে শহীদ ফারুক সড়কে পাওয়া যায় গুঁড়োদুধের প্রচুর ছেঁড়া ও নষ্ট প্যাকেট। একজন ভদ্রমহিলা অভিযোগ করেন যে, একটা বিখ্যাত ব্রান্ডের দুধ খাওয়ানোর সাথে সাথে তার বাচ্চার ডায়রিয়া হয়। হয়তো দুধে মেয়াদ ছিল না অথবা নকল।

১৮. চাল ও মুড়িতে ইউরিয়া সার ব্যবহার

এই বিষয়ে প্রচুর অভিযোগ আছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, ধান তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবার জন্য এবং চালকে ধবধবে সাদা করার জন্য ধানের চাতালে ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়। বিষয়টি ঢাকার বাইরে হওয়ায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে ১১ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সভায় তৎকালীন মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে বিষয়টি আমি জানিয়েছি। ঢাকার বাইরে মুড়ি ভাজার সময় ইউরিয়া সার ব্যবহারের অভিযোগ আছে। তবে মিরপুর এলাকায় কয়েকটা মুড়ির ফ্যাক্টরিতে আকস্মিক অভিযান চালিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও আমি কোন ইউরিয়া সার পাইনি।

১৯. মিটফোর্ড অভিযান (২১/৮/২০০৫)

আমি বিভিন্ন বেকারিতে অভিযানের সময় নামবিহীন লেবেলবিহীন কেমিক্যাল উদ্ধার করার সময় জানতে পারি যে, এর উৎসস্থল মিটফোর্ড। তখন হতে আমি মিটফোর্ডে অভিযান (মোবাইল কোর্ট) করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করি। কিন্তু কোনো সুরাহা পাচ্ছিলাম না। কারণ মিটফোর্ডের ব্যবসায়ীরা বললেন যে, তারা কেমিক্যালের কাজের জন্য কেমিক্যাল বিক্রি করেন, খাদ্যসামগ্রীতে ব্যবহারের জন্য বিক্রি করেন না। এক পর্যায়ে মনে হল তাদের বিক্রির রসিদবই চেক করলে বিষয়টি ধরা সম্ভব হবে। সেই সূত্রে আমি ২১/৮/২০০৫ তারিখে মিটফোর্ডে অভিযান করি। ৫টি দোকানে নামবিহীন কেমিক্যাল দেখি এবং বিক্রির রসিদবই দেখাতে বলি। কিন্তু কোথাও ক্রেতার নাম-পরিচয় নেই। আমি যেসব কেমিক্যাল বিভিন্ন বেকারিতে ধরেছি সেগুলো সম্পর্কে তারা জানান যে গোলাপ জল ও আগরবাতি বানানোর জন্য তারা বিক্রি করেন। না বুঝে না জেনে অজ্ঞতাবশত এইসব ব্যবহার হচ্ছে বেকারিগুলোতে।

২০. অনুমোদনবিহীন ভেজাল ঔষধ ও স্যালাইন

ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদনবিহীন ভেজাল ঔষধ ও স্যালাইনের বিষয়ে আমি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করি। টিকাটুলি, ওয়ারি, টিপু সুলতান রোড, গ্রীন রোড, বংশাল, দেবীদাস রোড,

লালবাগ, আর কে মিশন রোড ও ডেমরা এলাকায় বেশ কিছু অনুমোদনবিহীন ঔষধ ও স্যালাইন আটক করা হয় এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২১. নকল জুস

ধোলাইখালে ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম সম্পূর্ণ কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি জুসের কারখানায় অভিযান পরিচালনা করেন এবং আটক করেন। আরো কিছু ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে কৃত্রিমভাবে জুস প্রস্তুতের কারখানার কথা জানা যাচ্ছে। এগুলোর অবস্থান জানার চেষ্টা চলছে। আগামীতে সঠিক তথ্য পাওয়া গেলে অভিযান পরিচালনা করা হবে। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম আবদুল ফাত্তাহ, সৈয়দ মুজিবুল হক, মিজানুর রহমান, ভেজালবিরোধী অভিযানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

২২. সোডিয়াম সাইক্লামেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট, এমোনিয়া বাই কার্বোনেট-এর অতিমাত্রায় ব্যবহার অভিযানের প্রথম দিকে দেখা যায় ছোট ছোট আইসক্রিম হতে বড় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, ছোট বড় বিস্কুটের ফ্যাক্টরি, মিষ্টির কারখানায় সোডিয়াম সাইক্লামেট বস্তায় বস্তায় ব্যবহার করা হচ্ছিল, কোনো চিনির কারবার ছিল না। ছোট ছোট বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে অতিমাত্রায় সোডিয়াম বাই কার্বোনেট, এমোনিয়া বাই কার্বোনেট ব্যবহার হচ্ছিল অশিক্ষিত শ্রমিকের দ্বারা। তবে মোবাইল কোর্টের পর বর্তমানে এসবের ব্যবহার বিশেষত সোডিয়াম সাইক্লামেট-এর ব্যবহার কমে আসছে।

২৩. অন্যান্য

২১/৭/২০০৫ তারিখে মহাখালী বাজারে ভেড়ার মাংসকে খাসির মাংস হিসেবে বিক্রির দায়ে একজনকে শাস্তি দেয়া হয়। সাধনা ঔষধালয়কে পচা গুড় ও নোংরা পরিবেশের জন্য জরিমানা করা হয়েছে (২৮/৯/২০০৫)। এছাড়া প্রচুর কসমেটিক নকল হবার অভিযোগ আছে। গুলশান এলাকায় বেশ কিছু অনুমোদনবিহীন কসমেটিক পাওয়া যায়। তাঁতীবাজারে নকল কসমেটিক কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়। নকল কসমেটিক উদ্ধার করা হয় এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে। এছাড়া বোরিক পাউডারের সাথে চক পাউডার মেশানোর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহিষ, গরু, ভেড়া, ছাগল প্রতারণা

ঢাকা শহরে প্রতিদিন শত শত মহিষ জবাই করা হলেও কোথাও মহিষের মাংস পাওয়া যেত না। মহিষের মাংসকে গরুর মাংস বলে এবং ভেড়ার মাংসকে খাসির মাংস বলে বেশি দামে বিক্রি করার প্রতারণা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সেই প্রতারণা উন্মোচিত হয় ভেজালবিরোধী অভিযানে। ২৮/১০/২০০৫ তারিখে শেষ রাতে কাপ্তানবাজারে কসাইখানায় অভিযান করে পাওয়া যায় ৯০টি মহিষ আর মাত্র ১২টি গরু। অথচ জবাইয়ের পর প্রতিটা মহিষের মাংস গরুর মাংস বলে সিল মারা হচ্ছিল।

২৯/১০/২০০৫ তারিখে হাজারিবাগ কসাইখানায় গিয়ে একই চিত্র পাওয়া যায়। ফলে ২৮ জন কসাইয়ের বিরুদ্ধে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আইনে মামলা রুজু করা হয়। এছাড়া মহাখালী, কাপ্তানবাজারে, দেখা যায় ভেড়া জবাই করে খাসির মাংস হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে, যা ভেজাল না হলেও প্রতারণার সামিল।

শুভ লক্ষণ

ঢাকা শহরে এই ব্যাপক ভেজালবিরোধী অভিযানের পর সারা দেশে ভেজালবিরোধী অভিযান শুরু হয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতা এখনো চলছে। সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবারের ভেজালবিরোধী অভিযান এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত হয়েছে। এই ভেজালবিরোধী অভিযানে পুরো জাতি একদিকে সচেতন হয়েছেন অন্যদিকে প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছে। প্রশাসনের চাকরিতে আমি বহু রকমের জনকল্যাণকর কাজ করেছি, চোরাচালানের মাল আটক, কারেন্টজাল পোড়ানো, জাটকা নিধন প্রতিরোধ, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠাগার স্থাপন, নারীকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করে দুস্থ মহিলাদের সাহায্য করাসহ বহুবিধ জনহিতকর কাজ আমি আমার চাকরিজীবনে করার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে ভেজালবিরোধী অভিযান আমার চাকরিজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম এবং পুরো জাতি এতে উপকৃত হয়েছেন। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছি, কারণ ভেজালবিরোধী অভিযানের আগে আমাদের চামড়ার রঙ, কাপড়ের রঙ, ক্ষতিকর কেমিক্যাল, ফরমালিন খাওয়ানোর কথা এত বেশি জানা ছিল না, যা জেনেছি ভেজালবিরোধী অভিযান করে। শুধু তাই নয়, ভেজালবিরোধী অভিযানের পূর্বে ঢাকা শহরে কোনো খাঁটি ঘি ছিল না। মহাখালীস্থ পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি এন্ড ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির তৎকালীন চিফ ডা. মোহাম্মদ জহুরুল ইসলামের মতে, ভেজালবিরোধী অভিযানের আগে ঢাকা শহরের ৩৭টি প্রতিষ্ঠানের ঘি পরীক্ষা করে দেখা যায় ৩৭টাই ভেজাল অর্থাৎ ঢাকা শহরের ১০০% ঘি ভেজাল ছিল (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ২৭/১/২০০৬)। কিন্তু ভেজালবিরোধী অভিযানের পর কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। গত ৮/১/২০০৬ তারিখে মালিবাগস্থ নিউ বাঘাবাড়ি ঘি জব্দ করে আমরা পরীক্ষার জন্য মহাখালীস্থ পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করি। পরীক্ষা শেষে এটাকে খাঁটি ঘি হিসেবে কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন প্রেরণ করেন (স্মারক নং ডা. বু.ইন./পিএইচএল খাদ্য-৬৯১, তারিখ ১৪/২/২০০৬ মাহফুজুর রহমান, পাবলিক এনালিস্ট, পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা)। এরূপ আশাতীত সাফল্য সরকার ও পুরো জাতির জন্য অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলে আমরা মনে করি।

তথ্যনির্দেশ:

১। The Columbika Encyclopedia- পৃ. ৭০০
২। Encyclopedia Americanna- ভল্যুম-২, পৃ. ৬০২
৩। New Age Encyclopedia- ভল্যুম-২, পৃ. ২৫৫
৪। Compton's Encyclopedia and Fact Index- ভল্যুম-১০, পৃ. ৩৪৮
৫। The New Encyclopedia Britannica- ভল্যুম-৪, পৃ. ৮৮৩
৬। Merit students Encyclopedia- ভল্যুম-৭, পৃ. ২৩৫
৭। Compton's Encyclopedia- ভল্যুম-১০, পৃ. ৩৪৮
৮। New Age Encyclopedia- ভল্যুম-২, পৃ. ২৫৫
৯। Merit students Encyclopedia- ভল্যুম-৭, পৃ. ২৩৫
১০। Compton's Encyclopedia- ভল্যুম-১০, পৃ. ৩৪৮
১১। General, Organic and Biological chemestry-Jhon R. Amend, Bredford D. Mundy, Meltrin T. Arnold- পৃ. ৫২২
১২। Encyclopedia Americanna- ভল্যুম-২, পৃ. ৬০২
১৩। New Age Encyclopedia- ভল্যুম-২, পৃ. ২৫৫
১৪। The New Encyclopedia Britannica- ভল্যুম-৪, পৃ. ৮৮৩
১৫। New Age Encyclopedia- ভল্যুম-২, পৃ. ২৫৫
১৬। Encyclopedia Americanna- ভল্যুম-২, পৃ. ৬০২
১৭। New Age Encyclopedia- ভল্যুম-২, পৃ. ২৫৫
১৮। The New Encyclopedia Britannica- ভল্যুম-৪, পৃ. ৮৮৩
১৯। Lexican Universal Encyclopedia- ভল্যুম-৮, পৃ. ২৩৪
২০। General, Organic and Biological chemestry op cit,- পৃ. ৫২২
২১। Merit student's Encyclopedia- ভল্যুম-৭, পৃ. ২৩৫
২২। New Age Encyclopedia- ভল্যুম-২, পৃ. ২৫৫
২৩। Merit student's Encyclopedia- ভল্যুম-৭, পৃ. ২৩৫
২৪। Compton's Encyclopedia and Fact Index- ভল্যুম-১০, পৃ. ৩৪৮
২৫। New Age Encyclopedia- ভল্যুম-২, পৃ. ২৫৫
২৬। General, Organic and Biological chemestry op cit,- পৃ. ৫২২
২৭। Compton's Encyclopedia and Fact Index- ভল্যুম-১০, পৃ. ৩৪৮
২৮। General, Encyclopedia chemestry-Jhon R. Amend, Bredford D. Encyclopedia and Fact Index- পৃ. ৫২২
২৯। Compton's Encyclopedia and Fact Index- ভল্যুম-১০, পৃ. ৩৪৮
৩০। দৈনিক প্রথম আলো, ২২ মার্চ, ২০০৭, পৃ. ০৮
৩১। The Bangladesh Pure food Amendment Act 2005-এর 6(A) এবং ৪৪-এর ৬(এ) ধারা।
৩২। থাইল্যান্ড সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সরকারি কাগজপত্র। Act No. 151 (B.E. 2536)
৩৩। The Columbia Encyclopedia- পৃ.-৭০০
৩৪। Encyclopedia International-ভল্যুম-৭, পৃ.-২৭৯
৩৫। দৈনিক প্রথম আলো ১৪ জুন, ২০০৭, পৃ.-৩
৩৬। দৈনিক সংবাদ ৬ মার্চ, ২০০৭, পৃ.-১৩

৩৭। দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ১লা মার্চ, ২০০৭, পৃ.-৪
৩৮। দৈনিক আমার দেশ ৭ মার্চ, ২০০৭, পৃ.-৬
৩৯। দৈনিক যুগান্তর ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, পৃ.-১০

[লেখকঃ মো. রোকন উদ-দৌলাঃ ম্যাজিস্ট্রেট (উপসচিব), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।]

খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যে নীরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী

এ এ ই চ এ ম আ নো য়া র পা শা

মানহীন খাবার পানির কারখানা

কিছুকাল আগেও সাধারণ মানুষের মাঝে পানি কিনে খাওয়ার ধারণাটি অমূলক ছিল। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে রাজধানী ঢাকাসহ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে বোতলজাত ও জারজাত পানির একটি বড় বাজার সৃষ্টি হয়েছে। দূষিত পানি ব্যবহারে আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েট, জন্ডিসসহ নানা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই অফিস কিম্বা বাইরে কোথাও বের হলে দশ টাকায় এক বোতল পানি কিনতে অনেকেই আমরা দ্বিধা করি না। প্রতিনিয়ত যাদের বাইরের পানি খেতে হয় তারা একটু সাশ্রয়ী হতে নীল জারের এক গ্লাস পানি ১/২ টাকায় কিনে খান। কিন্তু' পয়সা খরচ করে পানি কিনে খেয়েও আমরা কতটা নিরাপদ? র‍্যাবের ধারাবাহিক অভিযানে বেড়িয়ে এসেছে নীরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী। এমনই কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরা হল যার সময় ও চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও মূল ঘটনা বাস্তব থেকে নেয়া।

কেইস স্টাডি-১

বিশুদ্ধ খাবারপানি জারে বাজারজাতকরণে যারা পাইওনিয়ার ছিলেন তাদের অন্যতম মোস্তাক সাহেব–শিক্ষিত, মার্জিত, বিনয়ী। শিল্পপতি বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসায়ে ধস নামে। ধানমণ্ডির পৈত্রিক বাড়ি বিক্রয় করে গাজীপুরে অত্যাধুনিক খাবার পানি তৈরির প্ল্যান্ট স্থাপন করেন। তার হাত ধরেই এদেশে আরও বেশ কিছু মানসম্মত প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে এবং এ সেক্টরে বাজার সৃষ্টি হয়েছে। আজ বুকের ব্যথা নিয়ে ইউনাইটেড

হাসপাতালে গিয়েছিলেন চেকআপ করতে। খবর পেলেন র‍্যাব তার বনানীর বাড়িটি ঘিরে রেখেছে। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে ছুটে এলেন বনানীতে। ম্যাজিস্ট্রেট ও র‍্যাব কর্মকর্তাগণ তাকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। আবিষ্কার হল একটি অবৈধ খাবার পানি তৈরির কারখানা। অসংখ্য উইপোকা বাসা বেঁধেছে দেয়ালে। অপরিচ্ছন্ন দেয়ালগুলোতে কত-না জীবাণুর ছড়াছড়ি। একজন সচেতন মানুষ হয়েও গাজীপুরে একটি অত্যাধুনিক প্ল্যান্ট থাকা সত্ত্বেও নোংরা পরিবেশে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কেন তিনি এমন অপরাধ করছেন জানতে চাইলে তিনি আবেগী হয়ে উঠে বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি অপরাধী, আমি চোর, আমার শাস্তি হওয়া উচিত; কিন্তু কেন আমি অপরাধ করেছি তা-ও জানতে হবে; মানুষকে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে আমি একটি বাড়ি বিক্রি করেছি; গাজীপুরের প্ল্যান্ট কেমিস্ট এবং কর্মচারীদের বেতন দিয়ে প্রতিজার পানি উৎপাদন খরচ পড়ে চল্লিশ টাকা; পরিবহন খরচ যোগ করলে ষাট টাকার কমে পানি বিক্রি করলে লাভ থাকে না; কিন্তু' এখন পঁচিশ টাকার কমে সর্বত্রে পানি পাওয়া যাওয়ায় আমার পানি বাজারে টিকে থাকতে পারছে না; তাই দুই গাড়ি পানি গাজীপুর থেকে এনে কিছু নির্দিষ্ট কাস্টমারকে দেই আর বাকি আট গাড়ি পানি এখান থেকেই যায়; দেনার দায়ে গাজীপুরের প্লান্ট বিক্রির ব্যবস্থা নিচ্ছি।" তার পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাড়ির ছাদের ট্যাংকে পাইপ লাগিয়ে সরাসরি ভরছেন জারগুলো।

কেইস স্টাডি: ২

হাসান লেখাপড়া বেশিদূর করতে পারেনি বলে নিজেই কিছু একটা করার চেষ্টা করছিল। বিশ হাজার টাকা সুদে নিয়ে পঁচিশটি নীল জার এবং একটি পুরনো ভ্যানগাড়ি কিনে একটি বিশুদ্ধ খাবার পানি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ডিলার হয়েছে। নির্ধারিত এলাকায় হোটেল, রেস্টুরেন্ট, অফিস আদালতে জার প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকায় পানি সরবরাহ করে। কিনে আনে পাঁচ টাকায়। অকান্ত পরিশ্রম করে সে তার ব্যবসা বাড়িয়েছে। এখন তার জারের সংখ্যা পঞ্চাশ, প্রতিটির গায়ে নিজের নামে স্টিকার লাগানো আছে। তার একমাত্র কর্মচারী ভ্যানচালক ফরিদকে নিয়ে আজ সকাল সকাল কারখানায় এসে খালি জারগুলো ভরছিল। আচমকা হাজির হল মোবাইল কোর্ট। কারখানার মালিকের সাথে হাসানকেও ধরা হল, তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল– সে মেহনতী মানুষ, তার কী অপরাধ ? মালিক স্বীকার করেছে সে খরচ কমাতে রিফিল করার পূর্বে ডিলারদের জার জীবানুনাশক দিয়ে ধোয় না। ডিলারগণ নির্ধারিত ব্র্যান্ড ছাড়াও নিজেদের নামে পানি বাজারে ছাড়ে যেখানে কারখানার ঠিকানা, মেয়াদকাল ইত্যাদি তথ্য থাকে না। হাসান এসব বুঝতে চায় না। খেয়ে না খেয়ে অতি কষ্টে জমানো টাকায় কেনা জারগুলো জব্দ করা হয়েছে। চোখে জল নিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।

কেইস স্ট্যাডি: ৩

চল্লিশোর্ধ রনি এক সময় এলাকার ত্রাস ছিল। মাদক আর চাঁদাবাজি মামলায় জেল খেটে ওসব ছেড়ে দিয়েছে। বাবার বাড়ির নিচতলার গ্যারেজ আর সিঁড়িঘর নিয়ে একটি পানি তৈরির কারখানা দিয়েছে। তার পানি ছাড়া এলাকায় অন্য কোনো কারখানার পানি সে ঢুকতে দেয় না। সে একটা কিছু করে খাচ্ছে ভেবে এলাকাবাসী তাতেই খুশি। পানিতে

লাভ বেশি বলে রনির মতো অনেকেই বিভিন্ন এলাকায় আধিপত্য বজায় রেখে এ ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যেখানে ৪০ টাকায় পানি বিক্রি করেও লাভ গুনতে হিমসিম খেতে হয় সেখানে প্রতিজার পানি মাত্র ৫ টাকায় বিক্রি করে কিভাবে এত লাভ করছে তারা?

কেইস স্টাডিঃ ৪

মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে এলাকাতেই নানা ব্যবসা শুরু করে রতন। এক পর্যায়ে দেনায় জর্জরিত হয়ে পাড়ি জমায় ঢাকায় । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে পানি মার্কেটিং করা শুরু করেন। এক পর্যায়ে নিজেই কারখানার মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। বাজারের মুরগি আড়তের পাশে দু'টি দোকান ভাড়া নিয়ে স্থানীয় আর দু'জনের সহযোগিতায় একটি পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করেন। বেসরকারি একটি ব্যাংকও মোটা অংকের লোন দেয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় বিএসটিআই লাইসেন্স প্রদান করেনি। তবু কাজ চালিয়ে যায়। ব্যবসা মোটামুটি ভালোই চলছিল। বছরখানেক এভাবে চললে দাঁড়িয়ে যাবে সে। কিন্তু কোনো এক সকালে হাজির হয় মোবাইল কোর্ট। রেললাইন ঘেঁষে মুরগির আড়তের পাশে খোলা ঘরে খাবার পানি তৈরির দৃশ্য দেখে কে না হতবাক হয়? তাকে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। জরিমানা পরিশোধ করলে দুঃসহ দেনায় জর্জরিত হতে হবে ভেবে কারাদণ্ডটিই তাকে মেনে নিতে হয়। একজন শিক্ষিত, সুদর্শন, পরিশ্রমী ব্যক্তিকে এভাবে জেলে যেতে দেখে ভেতরটা কেমন কেঁপে উঠে। তার ছোট্ট শিশুটি গাড়ি ধরে বাবা, বাবা বলে কাঁদছিল।

নীরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী

কেইস স্টাডি গুলোর বিষয় ছিল– বিশুদ্ধ পানি তৈরির কারখানা। রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশে বৈধ/অবৈধ প্রায় তিনশতটি খাবার পানি তৈরির কারখানা রয়েছে। অধিকাংশ কারখানার বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। সেগুলোতে প্রায় ক্ষেত্রেই যে সমস্যা দেখা যায় তা নিম্নরূপ:

নীল রঙের ১৯ লিটার জারে পানি সরবরাহ করা হয়। রিফিল করার পূর্বে এগুলো জীবাণুমুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। জীবাণুনাশক (যেমন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড) দিয়ে এগুলোকে জীবাণুমুক্ত করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা করা হয় না। কারণ তাতে জার প্রতি খরচ হয় ২/৩ টাকা। শুধু পানি দিয়ে ঝাঁকিয়ে দৃশ্যমান ময়লা পরিষ্কার করা হয় কিন্তু কলেরা, আমাশয়, জন্ডিস, টাইফয়েড প্রভৃতি পানিবাহিত জীবাণু ধ্বংস হয় না। জারগুলো যে প্রতিষ্ঠান, হোটেল রেস্টুরেন্টে সরবরাহ করা হয় খালি হওয়ার পর তা অত্যন্ত অনাদরে ফেলে রাখা হয় অনেক সময় স্থানাভাবে বাথরুম বা টয়লেটের ভেতরেও রাখতে দেখা যায়। আবার ফেরত আনার সময় এগুলোর মুখ বন্ধ থাকে না বলে পাখির মল, ধুলা, বালি, জীবাণু খুব সহজেই এগুলোর ভেতর ঢুকে যেতে পারে।

তাই জীবাণুনাশক দিয়ে জার ধোয়া জরুরি। জার ধোয়ার জন্য ওয়াসিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু তা না করে হাতে ধোয়া হয়।

জারে পানি রিফিল করার সময় ফিলিং মেশিন ব্যবহার করা উচিত এবং ফিলিং মেশিনের সাথে আল্ট্রাভায়োলেট-রে থাকা উচিত। ফিল্টারের মাধ্যমে পানির ময়লা ছাঁকা হলেও জীবাণু ছাঁকা যায় না। এই রে-এর মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করা হয়। একটি প্রমাণ সাইজের রে-এর বাল্বের মূল্য পনর হাজার টাকা। একবার এ বাল্ব নষ্ট হলে তা পরিবর্তন করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আল্ট্রাভায়োলেট রে মেশিনটিই থাকে না।

পানি উৎপাদন করে প্রতি ব্যাচ পানি একজন কেমিস্ট কর্তৃক পরীক্ষার পর তা বাজারজাত করা উচিত। কিন্তু ২/১ টি ছাড়া কোথাও কেমিস্ট পাওয়া যায় না। একটি ল্যাবরেটরি থাকা বাধ্যতামূলক হলেও কিছু কারখানায় ল্যাব পাওয়া গেলেও তা ব্যবহার হয় না, ধুলার স্তর জমে থাকতে দেখা যায়। প্রায় কোনো কারখানায় পানি পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া যায় না।

ফিল্টারের ভেসেলের কেমিক্যাল ও কার্টিজ সময়মতো পরিবর্তন করা হয় না। অনেক সমায় শূন্য ভেসেল পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে পানি ভরার সময় ছাঁকনি ধরা হয়।
"ভাঙা নোংরা ঘরে, সিঁড়ির নিচে, মুরগির আড়তের ভেতর, রেললাইনের পাশে খোলা ঘরেও খাবার পানি তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়।
এক জার পানি বাজারজাত করতে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা খরচ হলেও কারখানা মালিক তা বিক্রি করে ৫ থেকে ১০ টাকায়। ফলে মান ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না এবং ভালো কারখানাগুলো বাজার হারাচ্ছে। ঢাকার বাইরের বড় এবং অত্যাধুনিক কারখানাগুলোও পরিবহন খরচ দিয়ে পোষাচ্ছে না বলে কিছু পানি মূল প্ল্যান্ট থেকে আনলেও বাকি পানি ঢাকার ভেতরেই নোংরা পরিবেশে রিফিল করে বাজারজাত করার প্রমাণ পাওয়া গেছে।
"খাবার পানি ব্যবসায় ডিলার নামে মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। এরা কারখানা হতে ৫/৬ টাকায় পানি ভরে এনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২৫/৩০ টাকায় পানি সরবরাহ করছে । ডিলারগণ ৪০/৫০ টি জার এবং একটি ভ্যানগাড়ি নিয়ে নিজেদের নামে ইচ্ছামতো পানি বাজারজাত করছে। এরা নিজেরাই জারে পানি ভরে ভ্যানে করে নিয়ে যেয়ে বিভিন্ন স্থানে পানি সরবরাহ করে। পানি মার্কেটিং এবং জার পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে পানি উৎপাদক কারখানার মালিককে কিছু ভাবতে হয় না, মালিক শুধু কল খুলে রাখে।
"অনেক প্রতিষ্ঠানের বিএসটিআই-এর লাইসেন্স মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং ওয়াসার ছাড়পত্র নেই। কিছু প্রতিষ্ঠান এগুলোর তোয়াক্কাই করে না, শুধু ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে পানি জারে ভরছে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যাদের সিস্টেম এত সুন্দর যে পানি বিশুদ্ধ না

হবার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু' এ প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে হুমকির মুখে। এগুলো বন্ধ হলে ক্ষতি হবে আমাদেরই। হয়তো একদিন সিঙ্গাপুর থেকে পানি এনে খেতে হবে।

দুই

অবৈধ ব্লাড ব্যাংক: নীরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী

পটভূমি

মুমূর্ষু রুগীর জীবন বাঁচাতে তাৎক্ষণিকভাবে রক্তের প্রয়োজন হলে ব্লাড ব্যাংকের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়মিত রক্ত দানের বিষয়ে ভীতি আর কুসংস্কার বিরাজ করায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি সফল হচ্ছে না। এ সুযোগটিই নিচ্ছে রক্তসন্ত্রাসীরা। এদের বিরুদ্ধে র‍্যাবের ধারাবাহিক অভিযানে বেরিয়ে এসেছে নীরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী, আর নগরবাসী– সুশীল সমাজ রীতিমতো আঁতকে উঠেছে। কিন্তু তাতে কি থেমে গেছে রক্তসন্ত্রাসীরা? রক্ত আর জীবন যেখানে সমার্থক, সারা বিশ্ব এইডস নিয়ে তোলপাড় করছে, সচেতনতায় ব্যয় করছে মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার– সেখানে আমরা কী করছি? আমাদের অবস্থান কোথায়? কোক-ফানটার মতো রক্তকে পণ্য ভাবছি! মুদির দোকানে একই ফ্রিজে একসাথে রাখা হয়। এ-যে মারাত্মক অপরাধ তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন। এদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে র‍্যাব কার্যকর ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমনই কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরা হল যার সময় ও চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও মূল ঘটনা বাস্তব থেকে নেয়া।

কেইস স্টাডি: ১

স্থান– মহাখালী ফ্লাইওভারের নিচে। স্বামী-স্ত্রী আর পাঁচ বছরের এক সন্তান। তাদের হাতে বেশ কয়েকটি ব্যাগ ও পুটলি। ময়মনসিংহগামী কোনো বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ভদ্রলোককে বিচলিত মনে হল। হাতের ব্যাগ মাটিতে রেখে প্যান্ট ও শার্টের পকেট অতিদ্রুত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আর দরদর করে ঘামছেন। ভিড় ঠেলে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী তার দিকে এগিয়ে এল। খুব দরাজ গলায় জানতে চাইল 'কিছু হারাইছে ভাই?'। ভদ্রলোক তার স্ত্রী-সন্তানদের দিকে তাকিয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, "ময়মনসিংহ যামু, মানিব্যাগটা ..." শুভাকাঙ্ক্ষীর দরদ আরও উথলে উঠল, "ভাই আমারও তো একই অবস্থা। এই জায়গাটা খুব খারাপ, মানিব্যাগ থাকে না, আরও কয়েকজনের নিছে। বাসভাড়া পামু কই, তাই ঐ দোতলায় এক ব্যাগ রক্ত দিয়া আইলাম, বেশ কিছু টাকাও পাইলাম। তাছাড়া রক্ত দেওন সওয়াবের কাম"। কিছুক্ষণ পর অসহায় ভদ্রলোক শুভাকাঙ্ক্ষীর হাত ধরে উঠলেন পাশের দোতলায়। একটা কাচের দেয়ালে বড় করে লেখা "২৪ ঘণ্টা রক্ত পাওয়া যায়, রক্ত জীবন বাঁচায়।" একটি ভালো কাজ করছেন এই ভেবে নিজেকে মনে মনে সান্ত্বনা দিলেন; স্ত্রী-সন্তানকে বারান্দায় রেখে ঢুকলেন ভিতরে। তাকে শোয়ানো হল একটি উঁচু বেডে। দাঁতে দাত

চেপে, চোখ বুজে অপেক্ষা করলেন ৫/৬ মিনিট। খয়েরি রক্তে ভরে গেল ব্লাড ব্যাগ। সুঁই ফোটানোর স্থানে সেভলন দেয়া তুলো সেঁটে হাত ভাঁজ করে দিল লোকটি। পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে ভদ্রলোকটির দিকে এগিয়ে ধরে সেই লোকটা বলল, "বউ-বাচ্চা নিয়ে বিপদে পড়ছেন তাই বিশ টাকা বেশি দিলাম, যান তাড়াতাড়ি কাইটা পড়েন, আরও প্যাশেন্ট আছে।" ভদ্রলোক খুব অবাক হলেন তার রক্তের মূল্য মাত্র আশি টাকা। একশত টাকার নোটটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন ভদ্রলোক। লাল কালি দিয়ে আড়াআড়ি একটা দাগ। এ রকম একটা নোট তার মানিব্যাগে ছিল বলে মনে পড়ছে। এই প্রথম লোকটির দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালেন ভদ্রলোক। খুব কালো করে লোকটিকে আগেও কোথাও দেখেছেন তিনি। কিছুক্ষণ আগে মানিব্যাগ হারানোর সময় ভিড়ের মাঝে এই লোকটিই কি তাকে ধাক্কা মেরেছিল?

কেইস স্টাডি: ২

চোখের জল গাল বেয়ে নামছে কাজল-এর। সুদর্শনা তন্বী তার প্রিয় মানুষের গল্প বলছিল। রাসেল সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। একটি টিভি চ্যানেলের উপস্থাপক হিসেবে খুব নাম করেছিল। নেশার কালো থাবায় তার সুন্দর জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। তার সাথীরা কয়েকবার বিভিন্ন নিরাময় কেন্দ্র হতে ফিরে আবারও আগের চক্রে ফিরে আসে। প্রতিদিন এক সাথে নেশা করে, একই সুঁই ফুটে সবার শরীরে। এখন এরা কেউই চাকরি বা বাড়ি থেকে নেশার টাকা পায় না। কেউ কেউ ছিনতাই চাঁদাবাজি করে টাকা সংগ্রহ করে। রাসেল এসব পারে না। প্রতিদিন আড্ডায় দু'একজন নতুন লোককে ভুলিয়ে নিয়ে এসে তার টাকায় বাকিরা নেশা করে। মাস তিনেক আগে নজরুল নামের এক দালালের সাথে পরিচয় হয়। যেদিন টাকা সংগ্রহের কোনো উপায় থাকে না সেদিন নজরুলই ভরসা। দল বেঁধে রক্ত বিক্রি করে। অনেকেই মাসে একাধিকবারও রক্ত দেয়। তবুও নেশা তাদের চাই-ই।

কেইস স্টাডি: ৩

স্বপন সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়। মাগুরা হাসপাতাল থেকে দ্রুত তাকে আনা হয় ঢাকার একটি হাসপাতালে। সাথে আসা দুই ভাই রাত জেগে সেবা করে। সকালে নার্স জানায় আজ দুপুরেই অপারেশন। বিভিন্ন ঔষধ ছাড়াও প্রয়োজন ছিল দু ব্যাগ রক্তের। ঢাকায় তাদের কোনো আত্মীয় বা পরিচিত ছিল না। কোথায় পাবে ডোনার ? রক্তের জন্য এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করেও কোনো লাভ হল না। সামনের ঔষধের দোকানি তাদের আশ্বাস দেয়– প্রতিব্যাগের জন্য দু' হাজার টাকা দিলে সময়মতো পৌঁছে যাবে। উপায়ান্তর না দেখে রাজি হয়ে যায় তারা। কোনো ব্লাড ব্যাংক থেকে এসেছিল রক্তগুলো? এসব রক্তের টেস্ট রিপোর্টে কি সত্যিই কোনো ডাক্তার আর দক্ষ টেকনিশিয়ানের স্বাক্ষর ছিল?

কেইস স্টাডি: ৪

২৯ অক্টোবর, ২০০৯ ভোর ৬ টা। যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক রোড। র‍্যাবের একদল চৌকস গোয়েন্দা একটি দ্বিতল বাড়ির আশেপাশে নানা বেশে ঘোরাফেরা করছে। এ বাড়ির সামনে একটি চায়ের দোকানে মাঝবয়সী রোগা-পাতলা একটি লোক বসে আছে। তার নাম নজরুল । অষ্টম শ্রেণী পাশ, তবে অত্যন্ত ধূর্ত। গত ৫/৬ বছর যাবৎ হিরোইনের নেশা করে আর রক্তের দালালি করে। প্রতিদিনের মতো আজও এলাকার হিরোইনসেবীরা তার কাছে আসতে থাকে। তাদের চা খাওয়ায় এবং সুযোগমতো সামনের দোতলা বাড়িতে দু'একজন করে নিয়ে যায় এবং ১০ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে। মাদকাসক্ত কাজল এ মাসেই একবার এখানে এসেছিল, আজ আবারও এসেছে। তাকে নিয়ে নজরুল দোতলায় ঢোকার সাথে সাথে র‍্যাব ঘিরে ফেলে বাড়িটি। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থি'তিতে কাচের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে কাজলকে পাওয়া গেল রুগীর বিছানায়, নজরুল নিজে সুঁই ফুটিয়ে কাজলের শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করছে। ৩/৪ মিনিটে ব্যাগ ভরে উঠে ঈষৎ উষ্ণ রক্তে। রোজকারমতো এবাড়ির সামনে আজ আর হেরোইনসেবীদের ভোরের হাট জমতে পারেনি। কিন্তু ঢাকাসহ প্রায় প্রতিটি জেলায় এমন হাট অনেক বসেছিল।

কেইস স্টাডি: ৫

রক্তের ফেরিওয়ালা : র‍্যাবের অভিযানে শাহিন খুবই বিরক্ত। আগে একটা মুদির দোকানের ফ্রিজে রক্ত রাখত। এখন কোনো দোকানি রক্ত রাখতে রাজি হয় না। তার দু'জন দালাল আছে যারা মাদকসেবীদের সংগ্রহ করে। এদের নিয়ে সে এখন ব্যবসার ধরন বদলিয়েছে। এখন সে রক্তের ফেরিওয়ালা। মোবাইল কোর্টের চোখ ফাঁকি দিতে তার এ মোবাইল রক্তব্যবসা। তার কোনো নির্দিষ্ট দোকান বা অফিস নেই। রক্ত মজুদের জন্য কোনো ফ্রিজেরও প্রয়োজন হয় না। তার মোবাইল ফোনের নাম্বার বিভিন্ন ক্লিনিকে দেয়া আছে। কারও রক্তের প্রয়োজন হলে বেজে ওঠে তার ফোন। কী গ্রুপের রক্ত, কত ব্যাগ, কোথায় পৌঁছে দিতে হবে শুধু এতটুকু জানা চাই। বিভিন্ন হাসপাতালের আশেপাশের পার্কে বা নীরব স্থানে তার নিয়োজিত দালাল সবসময় বেশ কিছু মাদকসেবী বসিয়ে রাখে। এরা নিয়মিত রক্তদাতা, তাই তাদের রক্তের গ্রুপ তার মুখস্ত। যারা নতুন মুখ তাদের গ্রুপ সে বিনামূল্যে পরীক্ষা করে দেয়। শাহীন এদের কাছে খুব জনপ্রিয় হওয়ার আরেকটা কারণ সে রক্তের বিনিময়ে শুধু যে টাকা দেয় তাই না, ২/১ পুরিয়া মাদকও দেয়। খোলা আকাশের নিচে এ পার্কেরই এক কোণে একটু নিরিবিলি জায়গা আছে। এখানেই সে এদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। এরপর গন্তব্যে ছুটে যায় রক্তের ফেরিওয়ালা।

এ সমস্ত কেইস স্টাডির বিষয় ছিল একটাই– অবৈধ ব্লাড ব্যাংক। সারা দেশের হাসপাতালগুলোর আশেপাশে গড়ে ওঠে এসব ব্লাড ব্যাংক। প্রয়োজনের সাথে সাথে

চাহিদা মতো রক্ত এরা সরবরাহ করে ঠিক ; কিন্তু রক্তের মাধ্যমে সংক্রামিত রোগের বিষয়ে এদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এ যেন এক অবাক পৃথিবী ।

নীরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী : মাদকসেবীরা এক ব্যাগ রক্ত বিক্রি করে মাত্র ৯০ থেকে ১২০ টাকায়। যে দালাল এদের অবৈধ ব্লাড ব্যাংকে নিয়ে আসে তারা পায় ৩০ থেকে ৫০ টাকা। ব্লাড ব্যাংকের মালিক বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে প্রতি ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করে ৫০০ থেকে ১২০০ টাকায়। ক্লিনিক মালিক রুগীদের কাছ থেকে নেয় ১৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা। সঠিকভাবে পরীক্ষা করলে স্লাইড, সিরিঞ্জ, খালি ব্যাগ, পরীক্ষার কিট ইত্যাদি বাবদ এক ব্যাগ রক্তের জন্য খরচ প্রায় সাতশত টাকা (রক্তের মূল্য না ধরে)। অথচ ক্লিনিক মালিকগণ পাঁচশত টাকার বেশি দিতে চায় না। মূলত ব্যবসা করছে কিছু অসাধু ক্লিনিক মালিক। রক্তের প্রয়োজন হলে ঝামেলা এড়াতে রুগীর আত্মীয়স্বজন দায়িত্বটি তাদেরই দিয়ে দেয়। তখন তারা অবৈধ ব্লাড ব্যাংকের মালিকদের ফোন করে দরদাম ঠিক করে রক্তের অর্ডার দেয়। ব্লাড ব্যাংকের মালিক যথাসময়ে লোক পাঠিয়ে রক্ত সরবরাহ করে। প্রতিদিন ভোর থেকে অবৈধ ব্লাড ব্যাংকের সামনে মাদকসেবীদের হাট বসে। রক্ত সংগ্রহ চলে সকাল ৭টা-৮টা পর্যন্ত। ভরে যায় ব্লাড ব্যাংকের ফ্রিজগুলো। এরপর রক্তগুলো সরিয়ে ফেলা হয় নিরাপদ স্থানে। দালালদের কাজ শুধু মাদকসেবীদের সংগ্রহ এবং ব্লাড গ্রুপ নিশ্চিত করা । মাদকসেবীরা যখন এখানে আসে তখন তারা নিজেদের সাংকেতিক নামে পরিচয় দেয়। যেমন : তাদের রক্তের গ্রুপ বি হলে বলে চশমা প্লাস বা চশমা মাইনাস (চশমার ফ্রেম দেখতে ই-এর মতো), গ্রুপ অ হলে বলে এঙ্গেল প্লাস/মাইনাস, গ্রুপ 'ও' হলে বলে আলু প্লাস/মাইনাস, গ্রুপ এবি হলে ডাবল প্লাস/মাইনাস। তখন অবৈধ ব্লাড ব্যাংক মালিকরা বলে ৯০ বা ১০০ টাকা। রাজি হলেই তারা রক্ত টেনে নেয়। মাদকসেবীরা টাকা নিয়ে চলে যায় মাদক কিনতে। অনেক অসাধু ব্লাড ব্যবসায়ী তাদের কাজ সহজ করতে টাকার পরিবর্তে মাদকও সরবরাহ করে। নিয়মিত রক্তদাতা মাদকসেবীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, যখন নেশা ওঠে তখন চুরি, ছিনতাই বা যে কোনো কাজের বিনিময়ে এরা টাকা সংগ্রহ করে। যখন কোনো উপায় থাকে না তখন ব্লাড ব্যাংকই শেষ ভরসা। মাসে একাধিকবার রক্ত দেয়ার কথাও তারা স্বীকার করেছে। এদের রক্তে প্রয়োজনীয় রক্তকণিকা থাকে না। নিয়মানুযায়ী চার মাস অন্তর একজন রক্তদাতা যখন রক্ত প্রদানে আগ্রহী হয় তখন তার শারীরিক সুস্থতা পরীক্ষা করতে হয় । অতপর তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয় রক্তের উপাদানসমূহ পরিমাণ মতো রয়েছে কিনা। এছাড়া পাঁচটি সংক্রামক রোগের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। যেমন : এইডস, হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, ম্যালেরিয়া এবং সিফিলিস। শুধু রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা এবং ক্রসম্যাচিং করে রুগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয় অনিরীক্ষিত রক্ত। অবৈধ ব্লাড ব্যাংকগুলো রক্ত সরবরাহের সময় রক্তের ব্যাগের গায়ে ডোনারের নাম, নম্বর, সংগ্রহের তারিখ ইত্যাদি ইচ্ছামতো বসিয়ে দেয় এবং এর সাথে ব্লাড স্ক্রিনিং-এর একটি মনগড়া রিপোর্ট দেয়, যেখানে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সিল থাকে কিন্তু

নিজেরাই তাতে স্বাক্ষর করে। প্রতিটি ব্লাড ব্যাংকে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, সার্বক্ষণিক ডিউটি ডাক্তার, দক্ষ টেকনিশিয়ান থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অবৈধ ব্লাড ব্যাংকের মালিক কয়েকজন দালাল, একজন মার্কেটিং ম্যানেজার এবং অফিস কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে এসমস্ত অদক্ষ ব্যক্তিদের দিয়েই সমস্ত কার্য সম্পাদন করে থাকে। রক্ত পরিসঞ্চালনের সময় নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ, জীবনরক্ষাকারী ঔষধ এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক হলেও অবৈধ ব্লাড ব্যাংকগুলো গড়ে ওঠে অপরিচ্ছন্ন ছোট একটি কুঠুরিতে; যেখানে রক্ত সংগ্রহের জন্য একটি বেড, রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার সামান্য যন্ত্রপাতি এবং একটি ফ্রিজ থাকে। ইদানিং এদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার হওয়ায় সংগ্রহের পরপরই রক্ত অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। বাসা-বাড়ি, মুদির দোকান অথবা কোনো বস্তির ভিতর ফ্রিজে রাখা হয় অনিরীক্ষিত রক্ত। অবৈধ ব্লাড ব্যাংকের মালিকরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে বিভিন্ন হাসপাতাল আর ক্লিনিকের অসাধু কর্মচারীদের সাথে। এরাই এ-ধরনের রক্ত বিপণনের মূল হোতা। ঢাকার বাইরে হাসপাতালগুলোতে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রায় ক্ষেত্রেই থাকে না, ফলে সংশ্লিষ্ট অসাধু টেকনিশিয়ানদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অবৈধ ব্যবসা। রক্তের উপাদান পৃথক করে তা পাচার করা হয়। রক্তের উপাদান (প্লাজমা) পৃথককরণের বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি না থাকলেও বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে এসব পাচার হওয়া রক্ত উপাদান পাওয়া যায়। একস্থ'ান হতে অন্য স্থানে রক্ত পরিবহনের সময় কোল্ড চেইন মেনটেইন বাধ্যতামূলক হলেও অবৈধ রক্ত ব্যবসায়ীরা তা মানে না। ফলে সংগৃহীত রক্তের মান নষ্ট হতে থাকে। দেশে যে পরিমাণ রক্তের চাহিদা তার সামান্য অংশই বৈধভাবে মিটে থাকে। বাকি সব রক্তই আসে অবৈধ ব্লাড ব্যাংক থেকে। দেশে মাত্র ২৬টি বেসরকারি বৈধ ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। এগুলোতেও মাদকসেবীদের রক্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ছাড়াই বিক্রয় করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডোনার রেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখা গেছে মনগড়া নাম দিয়ে রেজিস্টার ভরে রেখেছে, পরপর ১২টি নাম 'র' দিয়ে, এরপর 'ক' দিয়ে পরপর কতগুলো নাম। তাদের ডাক্তারি পরীক্ষার সনদে দেখা গেছে শূন্য ফরমে ডাক্তার স্বাক্ষর করে রেখেছেন। এরা মূলত প্রফেসনাল ডোনার। সন্ধানী, বন্ধন-এর মতো কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করছে। তারা স্বেচ্ছায় রক্তদানে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। একজন সুস্থ দেহের মানুষ প্রতি চার মাস পরপর এক ব্যাগ রক্ত দান করলে কোনো ক্ষতি নেই বরং রক্ত দান না করলে রক্তকণিকা নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে নষ্ট হয়ে যায়। তাই রক্ত দান করাই শ্রেয়। একজন মাদকসেবী মাসে কয়েকবার রক্ত দিতে পারলে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে একবার করে রক্ত দিতে আমরা সবাই কেন পারি না ? কিন্তু এ জীবনে আমিই-বা ক'বার রক্ত দান করেছি ? আর আপনি ??

তিন.

ভেজাল কসমেটিক্স: নীরব সন্ত্রাসের অজানা কাহিনী

পেন্টিন, হেডএন্ড সোল্ডার, ক্লিয়ার, সানসিল্ক, এক্স, ব্রুট নিখুঁত নকল হয় ভাবতেই কষ্ট হয়। চকবাজারের কিছু অসৎ পাইকারি দোকানে নকল সামগ্রী পাওয়া যায়। কিন্ত যারা এগুলো তৈরি করে তাদেরকে ধরা অত সহজ নয়। নামীদামী ব্রান্ডের শ্যাম্পু, লোশন, ক্রিম,পাউডার বডিস্প্রে ব্যবহারের পর খালি কন্টেইনারটি আমরা ফেলে দেই। নানা হাত ঘুরে এটি রিফিল হয়ে আবার চলে আসে আমাদের হাতে। এর পিছনে রয়েছে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র। এদের একটি গ্রুপ খালি কন্টেইনার সংগ্রহ করে, একটি গ্রুপ নিখুঁতভাবে নকল সামগ্রী প্রস্তুত করে রিফিল করে এবং আরেকটি গ্রুপ রাজধানীর বিভিন্ন দোকান, সুপারশপ এবং সারা বাংলাদেশে ডিলার নিয়োগ করে বাজারজাত করে থাকে। এ চক্রটি সম্পর্কে র‍্যাব-৪ দীর্ঘদিন ধরে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সিরিজ অপারেশন চালিয়ে উদ্ঘাটন করে এ অপরাধ চক্রের কর্মকাণ্ড।

অভিযান: ১

গত ২৩/০৪/২০১০ তারিখ বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় র‍্যাব-৪ এর মোবাইল কোর্ট নকল সামগ্রী বানানোর উপকরণসহ আশিক ইসলামকে গ্রেফতার করে মিরপুর-১ এর বাসা থেকে। ফেয়ার প্লাজায় তার শোরুম এবং গোডাউন। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল কসমেটিক্স, হলোগ্রাম, নামী ব্র্যান্ডসমূহের স্টিকার। র‍্যাব একই সময়ে স্থান তিনটি ঘিরে ফেলে। বাড়ি নং-২৫, রোড-৪, ব্লক-এফ মিরপুর-১-এর নিচতলার বাসায় তাকে পাওয়া যায়। বাসা থেকে তার তৈরি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু লোশন, বডিস্প্রে পাওয়া যায়। সে সাথে পাওয়া যায় এগুলো তৈরির উপকরণ, স্পিরিট, সেন্ট, মেয়াদ লেখার সিল, বিশেষ ধরনের কালি, বেশ কিছু খালি শ্যাম্পুর বোতল ইত্যাদি। এরপর তাকে নিয়ে মিরপুর-১ এর ফেয়ার প্লাজার ২য় তলা এবং ৩য় তলায় তার শোরুম এবং গোডাউনে গিয়ে দেখা যায় থরে থরে কসমেটিক্স সাজিয়ে রেখেছে। সে স্বীকার করেছে ২/১ টি ছাড়া সব নকল। পেন্টিন, হেডএন্ড সোল্ডার, সানসিল্ক, ক্লিয়ার, এক্স, ব্রুট, জনসন লোশন, পাউডার সব নকল সামগ্রী সে বিভিন্ন ডিলারের কাছে হোলসেল বিক্রয় করে। তার কাছে পাওয়া যায় পিএন্ডজি, ইউনিলিভারসহ সব নামীদামী কোম্পানির হলোগ্রাম, স্টিকার। এগুলো সে চকবাজার থেকে সংগ্রহ করেছে বলে স্বীকার করেছে। মার্কেটের আশেপাশের দোকানিরা জানায় খুব অল্প সময়ের জন্য সে দোকান খুলত এবং কার্টুনভর্তি মাল ডেলিভারি দিয়ে দোকান ও গোডাউন বন্ধ করে আশে পাশে ঘোরাঘুরি করত। সে স্বীকার করেছে ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন পার্টির সাথে সে যোগাযোগ করত। পার্টির চাহিদামতো নকল সামগ্রী কিছু তৈরি করত এবং বাকি নকল মালামাল চকবাজার থেকে সংগ্রহ করে পার্টিকে ডেলিভারি দিত। তার মতে বহু লোক এ ব্যবসা করছে এবং চকবাজারের বহু দোকানে এ ভেজাল সামগ্রী পাওয়া যায়। সে গত ৭/৮ বছর এ কাজ করে আসছে। তাকে এক বছরের কারাদণ্ড এবং তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান: ২

গত ২১/০৪/২০১০ মধ্যরাতে র‍্যাব-৪ এর ভেজালবিরোধী টিম হানা দেয় নারায়ণগঞ্জের নন্দিপাড়ায়। নকল শ্যাম্পু ও বডি স্প্রে তৈরির সময় হাতেনাতে ধরে ফেলা হয় সেলিমকে (বয়স ২৪)। যারা নিখুঁতভাবে নকল সামগ্রী বানায় তাদের মধ্যে সে অন্যতম। সে স্বীকার করেছে পেন্টিন, হেডএন্ড সোল্ডার, সানসিল্ক, ক্লিয়ার সামগ্রী এবং পনের-ষোল রকম বডি স্প্রে হুবহু নকল তৈরি করে দিতে পারে। এ লাইনে তাকে ওস্তাদ কারিগর হিসেবে সবাই চেনে। কিভাবে এগুলো বানাতে হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা করে এবং বানিয়ে দেখায় । ভাঙারি দোকান থেকে সে খালি কন্টেইনার সংগ্রহ করে। অনেক পণ্যের গায়ে মেয়াদ দুই বা তিন বছর দেয়া থাকে। কিন্তু ভোক্তা সাধারণত এক-দু'মাসের মধ্যে ব্যবহার করে খালি কন্টেইনারটি ফেলে দেয়। যেগুলোতে মেয়াদ থাকে সেরকম একটি খালি বোতল সে ৪০ টাকায় কিনে নেয়। মিটফোর্ডের একটি কেমিক্যাল-এর দোকান থেকে সে সংগ্রহ করে কাঁচামাল। ঐ দোকানে যে কোনো প্রসাধন সামগ্রী তৈরি করার সব ধরনের উপকরণ পাওয়া যায়। কাপড় কারখানায় ব্যবহার হয় শ্যাম্পুর মতো লিকুইড সোপ। সাদা ও পানি কালারের এ নিম্নমানের শ্যাম্পু, কাপড়ের রং, সেন্ট, স্পিরিট এখান থেকে সংগ্রহ করে। সব ব্র্যান্ডের বডিস্প্রে'র ঘ্রাণের কাছাকাছি সেন্ট পাওয়া যায়। চাহিদামতো ছোট ছোট শিশিতে ভরে তাকে দেয়া হয়। প্রথমেই খালি বোতল পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলে। সানসিল্ক ব্ল্যাক শ্যাম্পু বানাতে পানি কালারের লিকুইড সোপ-এর সাথে কালো রং ও সেন্ট পরিমাণমতো মিশিয়ে নেয়। ক্লিয়ার শ্যাম্পু বানায় সাদা লিকুইড সোপ দিয়ে। বডিস্প্রে বানাতে সে ব্যবহার করে স্পিরিট, নির্দিষ্ট সেন্ট এবং গ্যাস। বডিস্প্রে'র খালি কন্টেইনারের মুখ খুললে একটি সরু নল দেখা যায়। ৫০ মিলি সিরিঞ্জের সূঁচ ফেলে দিলে নলটির ভিতর বডি স্প্রের সরু নলটি আঁটসাঁট ভাবে লেগে যায়। সিরিঞ্জে স্পিরিট আর নির্দিষ্ট সেন্ট মিশিয়ে চাপদিয়ে খালি কন্টেইনারে ঢুকিয়ে দেয়। গ্যাস লাইটারে যেভাবে গ্যাস ভরা হয় সেভাবে এক ধরনের গন্ধহীন গ্যাস ভরে দিলে আসল না নকল তা সাধারণভাবে বুঝার উপায় থাকে না। তার কাছে বিভিন্ন কোম্পানির অরিজিনাল হলোগ্রামও পাওয়া গেছে। এগুলো সে মিটফোর্ড থেকে কিনে বলে জানায়। হলোগ্রাম লাগানোর পর কারও সন্দেহ হয় না যে এটি নকল। আট বছর আগে সেলিম তার মামার ভাঙারি দোকানে কাজ করত। সেখানেই তার এ কাজের হাতেখড়ি। বিকালে মিটফোর্ড থেকে কাঁচামাল আর খালি বোতল সংগ্রহ করে। রাতে রিফিল করে সকালে ব্যাগে ভরে নকল সামগ্রী ঢাকার নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটরকে পৌঁছে দেয়। এ পারদর্শী কারিগরকে ভেজালের অপরাধে এক বছরের কারাদণ্ড এবং দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। ৩৬০ টাকা মূল্যের একটি পেন্টিন শ্যাম্পুর ভালো খালি কন্টেইনার ভাঙারি দোকান থেকে কিনে নেয় ৪০ টাকায়। রিফিল করতে যে উপাদান প্রয়োজন তার দাম পড়ে ৪০ টাকা। একটি হলোগ্রাম কিনতে ২ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। সেলিম জানায় পিএন্ডজি'র হলোগ্রাম কম পাওয়া যায়, দাম চড়া। ইউনিলিভারের হলোগ্রাম সে ২ টাকা করে কিনে। তবে হলোগ্রামগুলো নকল নয়– আসল। কোথা থেকে আসে এগুলো ?

অভিযানঃ ৩

রাসেল একটি প্রসাধন বিপণন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত। কিছুদিন আগে সে বিয়ে করে। এর পর অধিক উপার্জনের তাগিদে নিজেই প্রসাধন পণ্যের ব্যবসা শুরু করে। বিজ্ঞাপন দিয়ে মার্কেটিং-এর লোক নিয়োগ দেয় ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে। সেলিম তাকে চাহিদামতো মালের যোগান দেয়। গত ০৮/০৪/২০১০ রাত এগারটায় তার বাসায় র‍্যাব-৪ এর ভেজালবিরোধী টিম হাজির হয়ে নকল সামগ্রীসহ তাকে ধরে ফেলে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু, লোশন, পাউডার, সাবান, বডিস্প্রে ছাড়াও তার কাছে অলিভ অয়েল পাওয়া যায়। ওলিভ অয়েলের অনেক খালি বোতল এবং স্টিকার পাওয়া যাওয়ায় তাকে প্রশ্ন করলে সে স্বীকার করে এগুলো সে বাসায় বানায়। সোয়াবিন তেল ঢেলে ওলিভ অয়েল হিসেবে বিক্রি করে। ওলিভ অয়েল এবং সয়াবিন তেলের রং ও গন্ধের বিশেষ পার্থক্য না থাকায় সে এ কাজ করত বলে স্বীকার করেছে। ভালো পরিবারের ছেলে এবং পরিবার থেকে সৎভাবে জীবনযাপনের আশ্বাস দেয়ায় তাকে জেলে প্রেরণ না করে শুধুমাত্র অর্থদণ্ড (এক লক্ষ টাকা) প্রদান করা হয়। গত ২১/০৪/২০১০ তারিখ যখন সেলিমকে ধরা হয় তখন সেলিমের পকেট থেকে মালের অর্ডারের একটি কাগজ পাওয়া যায়। সেলিম জানায় রাসেল এ মালের অর্ডার দিয়েছে। রাসেল সেলিমকে বলেছে এখন ভেজাল মাল আর ঘরে রাখব না, সাথে সাথে ডেলিভারি দিয়ে দিবে। অর্থাৎ রাসেল আবারও একই কাজ শুরু করেছে। জেলে পাঠালে কি রাসেল সংশোধিত হত ? সেলিম কি জেল থেকে বের হয়ে এসে আবারও এই পেশায় ফিরে আসবে ?? এসব ভেজাল কসমেটিক্স কিনে ভোক্তারা যে শুধু প্রতারিতই হচ্ছেন তা নয় এগুলোর ব্যবহার মানবস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এগুলো তৈরিতে যে উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয় তা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেডের। ফলে এগুলোর ব্যবহারে বিভিন্ন চর্মরোগ, চুলপড়া, ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। সুপারশপগুলোতে কোয়ালিটি কন্ট্রোলার থাকা উচিত। নামী-দামী কোম্পানি থেকে সরাসরি প্রসাধন সামগ্রী নিলে ঝুঁকি কম থাকে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে নগদ টাকায় কিনতে হয় বলে কিছু সুপারশপ ভিন্ন মাধ্যম থেকে বাকিতে ক্রয় করে। সে সুযোগে ঢুকে যায় নকল পণ্য, যা দোকানিরাও বুঝতে পারে না। আসল বডিস্প্রে চেনার উপায় হল কাঁচের উপর স্প্রে করলে খুব দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু নকলটি দীর্ঘক্ষণ পানিযুক্ত থেকে যায়। এছাড়া মেয়াদের তারিখের উপর বডিস্প্রে দিয়ে স্প্রে করলে লিখা মুছে যায়। অনেক নকল সামগ্রীর কন্টেইনারে তারিখ ঘষা-মাজা থাকে এবং স্টিকার দিয়ে তারিখ দেয়া থাকে। ব্যবহারের পর খালি কন্টেইনারটি ফুটো করে বা কেটে ফেলা উচিত। নয়তো এটি কিছুদিন পর হয়তো আবার আপনার হতেই রিফিল হয়ে ফিরে আসবে !!

[লেখকঃ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, র‍্যাব।]

খাদ্যদূষণ: একটি বহুমাত্রিক জটিল সমস্যা ও তার সমাধান

মো. মা হ বু ব র র হ মা ন

খাদ্যনিরাপত্তা সহস্রাব্দ উন্নয়নের ১০টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অন্যতম একটি। খাদ্যনিরাপত্তা বলতে নিরাপদ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সকল মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করাকে বুঝায়। নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হলে সকল ধরনের খাদ্যকে অবশ্যই সর্বপ্রকার দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সে প্রেক্ষিতে খাদ্যদূষণ সম্পর্কে নিজে জানা এবং অন্যকে জানানো অতীব জরুরি।

খাদ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর অনুজীব, বিষাক্ত পদার্থ, এডেটিভস ইত্যাদি উপস্থিত থাকার কারণে খাদ্য বিনষ্ট বা বিকৃত হয়ে যায় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়, তেমন খাদ্যকে দূষিত খাদ্য বলা হয় এবং খাদ্য দূষিত হওয়ার সামগ্রিক প্রক্রিয়া হল খাদ্যদূষণ। অনেক সময় খাদ্য-ভেজালকেও খাদ্যদূষণ হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। তবে সহজ ভাষায় যে খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এর জন্য উক্ত খাদ্যস্থিত যে উপাদান দায়ী, সে উপাদান যে কোনো উৎস থেকেই আসুক তাই উক্ত খাদ্যের দূষণের জন্য প্রকৃত অর্থে দায়ী। সুতরাং ভেজাল খাদ্য বলতে যেহেতু প্রকৃত খাদ্যের সাথে নিম্নমানের ও দামের খাদ্য বা অনুরূপ অন্য দ্রব্যের মিশ্রণকে বুঝায় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেহেতু ভেজাল খাদ্যকেও এক অর্থে দূষিত খাদ্য বলা যায়। তবে এটিকে খাদ্যদূষণের একটি প্রক্রিয়া বললে বোধকরি আরও সঠিক হয়। যাহোক দূষিত খাদ্য খেলে নানান জটিল রোগের সৃষ্টি হয় বা খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য তো সাধিত হয়ই না বরং স্বাস্থ্যহানি ঘটে। দূষিত খাদ্য খাওয়ার ফলে যে সকল জটিল রোগের সৃষ্টি হয় তাদেরকে খাদ্য-বাহিত রোগ বলা হয়। এরূপ অসংখ্য রোগ আছে। খাদ্য দূষণের কারণে সংক্রামক রোগ (খাদ্য-বাহিত অনুজীব ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসেস এবং প্যারাসাইটস দ্বারা) এবং বিষক্রিয়া (অনুজীব নিসৃঃত ক্ষতিকর বিষ বা টক্সিন এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা) সংঘটিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন লক্ষণ প্রতিফলিত হয়, সুতরাং কোনো একটি বিশেষ "সিনড্রোম বা লক্ষণ" সকলকে বোঝানো যাবে না। অনুজীব বা টক্সিন গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল নালীর মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এবং সেখানেই সাধারণত প্রথম লক্ষণ যেমন শ্বাসকষ্ট, বমি, এবডোমিন্যাল

ক্র্যাম্প বা খিঁচুনি এবং ডাইরিয়া দেখা দেয়। অনেক রাসায়নিক বিষ (যেমন দীর্ঘস্থায়ী জৈব বালাইনাশক বা অরগানোক্লোরিন কীটনাশক, ভারী ধাতব পদার্থ, অনেক ফুড এডিটিভ্স) খাদ্যের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে শরীরে প্রবেশ করে জমা হলে দীর্ঘ মেয়াদে ক্যান্সার, হাইপারএকটিভিটি, এ্যাজমা, ডায়াবেটিস, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট, প্রজননক্ষমতা কমানো, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ইত্যাদি রোগ ঘটায়।

উপরোল্লিখিত প্রেক্ষিতে খাদ্যদূষণ বিশ্বব্যাপী একটি অতীব জটিল সমস্যা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর জটিলতা আরও প্রকট এবং দূষিত খাদ্য যত্রতত্র বেচা-কেনা হয়। দূষিত পরিবেশ এবং পরিবেশ দূষণ, শিল্পবর্জ্য এবং অনিয়মিত বা অনিয়ন্ত্রিত কৃষি উপকরণ ব্যবহার, অনিয়মিতভাবে খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতিতে নানাবিধ নিষিদ্ধ অথবা ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহার, এমনকি অজ্ঞাতসারে অথবা অসাবধানতাবশত অপরিচ্ছন্ন হাতে খাদ্যদ্রব্য নাড়াচাড়া করা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে খাদ্যদূষণ ঘটে থাকে। খাদ্যদূষণ একটি অতি পরিব্যাপ্ত বিষয় যা একটি প্রবন্ধে বা লেখায় বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করা মোটেই সম্ভব নয়। যাহোক তবুও বিষয়টির গুরুত্ব, এর কারণ বা উৎস, ক্ষতিকর দিক এবং প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে একই সাথে ধারাবাহিকভাবে এ প্রবন্ধে কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস নেয়া হল।

খাদ্যদূষণের কারণ বা উৎসসমূহ:

খাদ্য দূষণের অসংখ্য কারণকে সামগ্রিক বিবেচনায় নিম্নলিখিত কয়েকটি বৃহৎ শ্রেণীর আওতায় লিপিবদ্ধ করা যায়:

(ক) কৃষিজ দূষণ:
(খ) মাংস প্রক্রিয়াকালীন দূষণ
(গ) হাতে নাড়াচাড়াকালীন দূষণ
(ঘ) নিষিদ্ধ উপকরণ ব্যবহারজনিত দূষণ
(ঙ) দূষিত পরিবেশজনিত দূষণ
(চ) ভেজালজনিত দূষণ
(ছ) এডেটিভ্সজনিত দূষণ

খাদ্যদূষণের উল্লিখিত উৎস বা কারণসমূহের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তদসংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার নিম্নে প্রদান করা হল:

(ক) কৃষিজ দূষণ:

উৎপাদন মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস। বিশেষ করে ফল-মূল, শাক-সবজি, তেল-ডাল ইত্যাদি সরাসরি কৃষি উৎপাদন থেকে আসে যেগুলোর কিছু কিছু যেমন সকল ফল, কিছু সবজি সালাদ হিসেবে সরাসরি খাওয়া যায়। অন্যগুলো খাওয়ার উপযোগী করার জন্য কিছু প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়। যেভাবেই ব্যবহার করা হোক, উৎপাদনকালে বা

ফসল উত্তোলন ও সংরক্ষণকালে এগুলো দূষিত হওয়ার বা দূষিত করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। যে সকল কারণে উৎপাদনকালে বা ফসল উত্তোলন ও সংরক্ষণকালে এসকল খাদ্য দূষিত হতে পারে তন্মধ্যে কৃষি রাসায়নিক পদার্থ যেমন বালাইনাশক (কীটনাশক ও অন্যান্য বালাইনাশক), রাসায়নিক সার, ফল পাকানোর রাসায়নিক পদার্থ, ফল ও শাক-সবজি তাজা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি অন্যতম। উল্লিখিত দ্রব্যগুলো ব্যবহার করলেই যে উৎপাদিত/উত্তোলিত/সংরক্ষিত খাদ্য-ফসল দূষিত হবে তা সঠিক নয়। এগুলোর অনিয়মিত যথেচ্ছ ব্যবহার খাদ্য-ফসলকে দূষিত করে। যেমন প্রতিটি বালাইনাশক ব্যবহারের সুপারিশকৃত মাত্রা এবং অপেক্ষাকাল থাকে। কিন্ত অনেক কৃষকই সুপারিশকৃত মাত্রা এবং অপেক্ষাকাল অনুসরণ করে না, অতিরিক্ত মাত্রা ব্যবহার করে এবং সুপারিশকৃত অপেক্ষাকাল (যেমন প্রয়োগের কমপক্ষে ১০-১৫ দিন যা ফসল এবং বালাইনাশকভেদে সুপারিশকৃত) অনুসরণ না করে প্রয়োগের অব্যবহিত পরই (এমনকি একদিনও অপেক্ষা না করে) ফসল উত্তোলন করে বিশেষ করে শাক-সবজি ও ফল-মূলের ক্ষেত্রে। অথচ শাক-সবজি ও ফল-মূলের ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত অপেক্ষাকাল অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। এছাড়াও, একেকটি ফসলের জন্য নির্দিষ্ট বালাইনাশক তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদির জন্য সুপারিশ করা থাকে যেগুলো তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণে সুপারিশকৃত অপেক্ষাকালের মধ্যে ক্ষতিকর বিষক্রিয়ার মাত্রার নিচে চলে যায় ফলে উত্তোলিত শাক-সবজি, ফল-মূল বিষের দ্বারা দূষিত থাকে না। কিন্ত বাস্তবে অনেকেই এ সকল সুপারিশের তোয়াক্কা করে না এবং এগুলো অবলোকনেরও কার্যত তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে বালাইনাশক দ্বারা দূষিত শাক-সবজি, ফল-মূল উত্তোলিত করে বাজারে বিক্রির অনেক তথ্য/প্রতিবেদন পাওয়া যায়। এমনকি দীর্ঘস্থায়ী জৈব রাসায়নিক বালাইনাশক যেগুলো চরম ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যেমন ডিডিটি, হেপ্টাক্লোর, এলড্রিন, ডাই-এলড্রিন, ক্লোরডেন ইত্যাদিরও ব্যবহারের তথ্য/প্রতিবেদনও পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে ফসল দ্রুত পাকানোর জন্য কিছু রাসায়নিক হরমোনাল পদার্থ রয়েছে যেমন ইথোপন, ইথরেল ইত্যাদি, এগুলো সুনির্দিষ্ট মাত্রায় সঠিক সময়ে ব্যবহার করলে ক্ষতিকর প্রভাব থাকবে না এবং উত্তোলিত খাদ্য-ফসল দূষিত হবে না। কিন্ত বাস্তবতা হল অনেক কৃষকই এগুলোর তোয়াক্কা না করে এগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় অসময়ে ব্যবহার করে, এমনকি ক্যালসিয়াম কার্বাইড, তুঁত ইত্যাদিও অতিরিক্ত মাত্রায় অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করে খাদ্য-ফসলকে দূষিত করে। রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রেও সুপারিশকৃত প্রয়োজনীয় সারসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বিত মাত্রা ব্যাবহার না করে অসম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করে। ফলে খাদ্য-ফসল মাটি হতে অসম পুষ্টি গ্রহণ করে দূষিত হয়। শুধু রাসায়নিক সারই নয়, এমনকি জৈব গোবর সার উপযুক্তভাবে না পচিঁয়ে ব্যবহার করার ফলেও অনেক সময় খাদ্য-ফসল দূষিত হয়। জমিতে প্রয়োগকৃত অতিরিক্ত বালাইনাশক, অসম সার ইত্যাদি সেচের

পানি বা বৃষ্টির পানির দ্বারা বাহিত হয়ে নদী, জলাশয়ে গিয়ে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীকে দূষিত করে যা প্রকারান্তরে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।
এ ছাড়াও মাঠে উৎপাদিত অনেক ফসল উত্তোলনের পর সুষ্ঠুভাবে শুকিয়ে ভালোভাবে সংরক্ষণ না করার ফলে নানাবিধ অনুজীব নিঃসৃত বিষ যেমন আফ্লাটক্সিন তৈরি হয় এবং উক্ত পণ্য দূষিত হয় যা খেলে বিষক্রিয়া ঘটে।

(খ) মাংস প্রক্রিয়াকালীণ দূষণ

গরু, খাসি, মুরগি সঠিকভাবে এবং পরিচ্ছন্ন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকরণের স্থানে জবাই এবং প্রক্রিয়াকরণ না করলে মাংস বিভিন্ন দূষণে বিশেষ করে বিভিন্ন অনুজীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট, ভাইরাস ইত্যাদির দ্বারা দূষিত হয়। এ সকল প্রাণীর খাদ্যনালীতে ব্যাকটেরিয়া থাকে। জবাই করার সময় প্রাণীর বিষ্ঠার সাথে এগুলো বের হয়ে আসে এবং সতর্কতা অবলম্বন না করলে এই বিষ্ঠার মাধ্যমে ঐসব ব্যাকটেরিয়া মাংসের সাথে মিশে যেতে পারে। এসব অনুজীব দ্বারা দূষিত মাংস বহনকালে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি এমন দূষিত মাংস রান্না করার পরও খেলে মানুষের অনুজীব-সংক্রান্ত নানান রোগ হতে পারে।

(গ) হাতে নাড়াচাড়াকালীন দূষণ

যে কোনো খাদ্যদ্রব্য– প্রক্রিয়াজাতকৃত অথবা কাঁচা অবস্থায় অপরিষ্কার এবং খালি হাতে নাড়াচাড়া করলে অতি সহজে দূষিত হতে পারে। এ-জাতীয় দূষণ সাধারণত অনুজীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট, ভাইরাস, কৃমি ইত্যাদির দ্বারাই হয়ে থাকে। কাঁচা মাংস, শাক-সবজি, বানানো ফাস্ট ফুড, দুধ, দুধ-জাত খাদ্য ইত্যাদি অপরিষ্কার হাতে সরাসরি ধরলে/নাড়াচাড়া করলে এ-জাতীয় দূষণ সহজেই ঘটে। অতএব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাতে এবং পারতপক্ষে হাতে হাত বন্ধন বা ফর্ক দ্বারা এগুলো নাড়াচাড়া করতে হবে। এছাড়া, বালাইনাশক বা সার প্রয়োগ করে সঠিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হয়ে ঐ হাতে বা শরীরে ঐ মাঠের তো বটেই এমনকি অন্য মাঠেরও ফল-মূল, শাক-সবজি উত্তোলন এবং বাজারজাত করলে উক্ত খাদ্য-ফসল বালাইনাশক বা সার দ্বারা দূষিত হতে পারে। সুতরাং বালাইনাশক বা সার প্রয়োগ করার পর সঠিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পরই কেবল ফল-মূল এবং শাক-সবজি বা অন্য খাদ্যদ্রব্য হাতে নাড়া-চাড়া করা উচিত।

(ঘ) নিষিদ্ধ উপকরণ ব্যবহারজনিত দূষণ

এ-জাতীয় দূষণ কৃষিপণ্যেও হতে পারে, নিত্যদিন দোকানে বা রেস্তোঁরায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য সামগ্রী, এমনকি প্রক্রিয়াজাতকৃত সুন্দর মোড়কে বাজারজাত খাদ্যপণ্যেও হতে পারে। অনেক ব্যবসায়ী অতি মুনাফার লোভে বাতিলকৃত/নিষিদ্ধ উপকরণ যেমন কীটনাশক ডিডিটি, পুরনো গন্ধযুক্ত/র‍্যানসিডেটেড তেল, বাতিলকৃত কৃত্রিম এডেটিভ্স,

রং, সুগন্ধি, পুষ্টি উপাদান ইত্যাদি কম দামে কিনে বিভিন্ন খাদ্য পণ্য-সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করে। এভাবে খাদ্যপণ্য দূষিত হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত পিসিবি ওয়েল দিয়ে সমুসা, জিলাপি, পুরি, ইত্যাদি ভাজা, মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (এমএসজি), টেস্টিং সল্ট ইত্যাদি দিয়ে সুপ তৈরি করা ইত্যাদি কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ। মাছ এবং অন্যান্য পচনশীল খাদ্য-সামগ্রী সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার এভাবে খাদ্যদূষণের একটি অন্যতম উদাহরণ।

(ঙ) দূষিত পরিবেশজনিত দূষণ

মানুষের চারপাশে যা কিছুই আছে– জড় এবং জীব, তা নিয়েই মানুষের পরিবেশ। এই পরিবেশ থেকেই মানুষ তার বাঁচার জন্য অনেক কিছু গ্রহণ করে থাকে। বলা বাহুল্য বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে নির্মল বাতাস এবং বিশুদ্ধ পানি সুস্বাস্থ্যের জন্য পূর্বশর্ত। শিল্প কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য যা মারকারি, লিড সহ অন্যান্য ভারী ধাতব পদার্থ-সম্বলিত সেগুলো যথাযথভাবে পরিশোধিত না হয়ে পরিবেশে বিশেষ করে মাটি ও পানিতে যোগ হলে তা প্রকারান্তরে নানাভাবে মানুষের উৎপাদিত খাদ্যে, মাছে, সামুদ্রিক মাছে এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীতে চলে আসে এবং খাদ্যকে দূষিত করে। এ ছাড়াও খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণের স্থান এবং কারখানা পরিচ্ছন্ন ও সুপরিবেশ-সম্মত না হলে সেখানে প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যপণ্য বিভিন্ন অনুজীব, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, ইত্যাদির দ্বারা দূষিত হতে পারে। সুতরাং প্রতিটি শিল্পকারখানা অবশ্যই সঠিক বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট (Effluent treatment plant) সমৃদ্ধ হতে হবে। খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণের স্থান এবং কারখানা পরিচ্ছন্ন ও সুপরিবেশ-সম্মত রাখতে হবে।

(চ) ভেজালজনিত দূষণ

অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফালাভের জন্য প্রকৃত মানের খাদ্যপণ্যের সাথে স্বল্প মূল্যের নিকৃষ্ট মানের একই অথবা অনুরূপ খাদ্যপণ্য মিশ্রণ করে বাজারজাত করে। ফলে প্রকৃত খাদ্যের মান বিনষ্ট হয়, স্বাদ এবং গুণগত মান অনেক কমে যায়, মিশ্রণের ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়াও যুক্ত হতে পারে। চালের সাথে সূক্ষ্ম পাথরদানা বা খুদে চাল বা কুঁড়ো মেশানো, দুধের সাথে পানি মেশানো, সয়াবিন তেলের সাথে পামওয়েল বা পামওয়েলের সাথে সয়াবিন তেল মেশানো, ভালো আটার সাথে নিম্নমানের আটা মেশানো ইত্যাদি এ-জাতীয় দূষণের অন্যতম উদাহরণ। এ-জাতীয় দূষিত খাদ্য নানাবিধ পেটের পীড়ার সৃষ্টি করে, পুষ্টিহীনতার কারণ হিসেবে দেখা দেয়।

(ছ) এডেটিভ্সজনিত দূষণ

প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়ন, স্বাদ বৃদ্ধি, সুগন্ধ বর্ধন, রং আকর্ষণীয়করণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের এডেটিভস ঐসব খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণকালে অতি সুক্ষ্মভাবে যোগ করা হয়। এসকল এডেটিভ্স-এর অধিকাংশই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

এবং হাইপারএকটিভিটি, এ্যাজমা এবং ক্যান্সারের কারণ বিধায় অনেক দেশে এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ সুপারস্টোরগুলোতে চমকপ্রদ মোড়কে নানান ধরনের খাদ্য-পণ্য সামগ্রী যেমন কারি মশলা, চিপস, মেয়নেজ, আইসক্রিম, চকোলেট ইত্যাদি প্রচুর বিক্রি হয়। উদাহরণস্বরূপ ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অনেকগুলো এমন এ্যাডিটিভ্স যেমন রং বৃদ্ধির জন্য ক্যারামেল, সানসেট ইয়েলো, টারট্রাজাইন, চকোলেট ব্রাউন, এ্যামারান্থ, প্রিজারভেটিভ হিসেবে এলুমিনিয়াম, বেনজয়িক এসিড, ডাইফিনাইল, বাইফিনাইল, পটাশিয়াম নাইট্রেট, সুইটনার হিসেবে সাইক্লামেট, সাইক্লোমিক এসিড, স্যাকারিন, এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে প্রোপাইল গ্যালেট, ফ্লেভার হিসেবে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (এমএসজি), পটাশিয়াম এসিসালফেন কয়েকটির উল্লেখ করা হল। তবে আরও অনেক কয়েকটি এমন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এডিটিভ্স রয়েছে। যেহেতু এডেটিভ্স অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং অনেকগুলোই নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে জন্য খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে বা তৈরিতে এগুলো ব্যবহার করা হলে অবশ্যই মোড়কে সুস্পষ্ট জায়গায় বড় হরফে লিখতে হবে। কিন্ত অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় না বরং ছোট্ট হরফে পুষ্টি উপাদানের সাথে মোড়কের লেবেলে লেখা থাকে। নিষিদ্ধ ক্যান্সার, হাইপারএকটিভিটি এবং এ্যজমা সৃষ্টিকারী এমন এডিটিভ্স-এর লম্বা তালিকা রয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে খাদ্যপণ্য তৈরি করা হলে সে খাদ্য দূষিত বলে পরিগণিত হবে কারণ সেগুলো খেলে ক্যান্সার, হাইপারএকটিভিটি, এ্যাজমা ইত্যাদি জটিল রোগের সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে খাদ্যউৎপাদন, উত্তোলন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, নাড়াচাড়া এবং বাজারজাতকরণে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলে খাদ্যদূষণ অনেক কমে যাবে এবং খাদ্যদূষণজনিত রোগ-বালাই হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

[লেখক: অধ্যাপক, কীটতত্ত্ব বিভাগ, কৃষি অনুষদ। ডীন, মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ এবং পরিচালক (প. ও উ.), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।]

খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া: নিরাপত্তা রক্ষায় করণীয়

খুরশীদ জাহান

Food security বা খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে মানুষ ভাবতে শিখেছিল আদিকাল থেকেই, যখন তারা তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, এবং ঔষধের জন্য একান্তভাবেই নির্ভরশীল ছিল প্রকৃতির ওপর। আমাদের Prehistoric পূর্বপুরুষেরা খাদ্যের অন্বেষণে এতই ব্যস্ত থাকত যে, কোন খাবারটি নিরাপদ আর কোনটি নিরাপদ নয় সেগুলো নিয়ে ভাবার তাদের কোনো সুযোগ ছিল না। পরবর্তীকালে Trial & error মাধ্যমেই হয়তো এ সম্পর্কে তারা নিরাপদ খাবারকে বেছে নিতে পেরেছিল অনেকাংশেই।

আবার Safe food বা নিরাপদ খাবার সম্পর্কে খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ সালে মিশরের কিছু তথ্য থেকে জানা যায় এবং খ্রিস্টপূর্ব ২৯০০ সালে চীনের রেকর্ড থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়। অনিরাপদ খাবার বা Unsafe food এবং এগুলোর কারণে ভোক্তাগণের স্বাস্থ্যবিষয়ক অসুবিধাগুলো কোনো নতুন ব্যাপার নয়।

আমাদের ইতিহাস থেকেই জানা যায় Food poisoning বা খাদ্যজনিত বিষক্রিয়া পৃথিবীতে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বরাবরই জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি হুমকিস্বরূপ ছিল। সেই সাথে ট্রেড এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। নিঃসন্দেহে এগুলো ঘটত poor handling, preparation, storage and transportation-এর সময় কোনো একটি point-এ bacterial বা কেমিক্যাল contamination এর কারণে।

কোনো একটি দেশ নিরাপদ খাবার এবং খাবারের গুণগত মানকে তখনই বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেয় যখন সেদেশের বেশিরভাগ জনগণের তুলনামূলকভাবে পর্যাপ্ত খাবারের সংস্থান থাকে। একবিংশ শতাব্দীর দোড়গোড়ায় এসে যদিও পৃথিবীতে remarkbale উন্নতি হয়েছে খাদ্য এবং কৃষিতে, প্রযুক্তিতে, Biotechnologyতে, Information & communication-এ space technology-তে মেডিসিনে কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারটি এখনও পৃথিবীর বহু দেশের জনগণের জন্য একটি অমীমাংসিত সমস্যা হিসেবেই রয়েছে। তিন বিলিয়নেরও অধিক লোক কোনো রকমে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে মাথাপিছু প্রতিদিন ২ মার্কিন ডলারেরও কম আয়ে। পৃথিবীর বহু দেশেই খাদ্যসমস্যা, নিরাপদ খাবারের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। যেমন Southern Africa, Ethiopia, Afganistan এসব দেশে এমনও রিপোর্ট আছে যেখানে ক্ষুধা মেটাতে কয়েক বস্তা গমের বদলে মা-বাবারা তাদের শিশুদেরকে বিক্রি করে দিচ্ছে, সে গমগুলোও আদৌ খাবারের উপযুক্ত কিনা সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো সুযোগ নেই তাদের ।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ১৯০০ সাল থেকে এ পর্যন্ড় পুষ্টিমানের দিক থেকে কিছুটা উন্নত হলেও Food safety-র ক্ষেত্রে সেটা বলা যাবে না। এ দেশগুলোর জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, এসব দেশে জনগণের নিরাপদ খাবারের অপ্রতুলতা খাদ্যনিরাপত্তার একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। আমরা জানি যে, Malnutrition & infection is a viscious cycle. এ সব দেশে খাদ্যবাহিত অসুস্থতার হার অনেক বেশি। খাবারে এবং পানিতে microbiological contamination ডায়েরিয়াল ডিজিজসহ অন্যান্য খাদ্য ও পানিবাহিত অসুস্থতা এবং উচ্চ মৃত্যুহারের অন্যতম প্রধান কারণ।

মানুষের অসুস্থতার জন্য contributing যে factor গুলো identify করা হয়েছে তার মধ্যে অনিরাপদ খাদ্য এবং পানি, কৃষিকাজে এবং Food processing-এ অনিয়ন্ত্রিত Pesticides এবং chemicals-এর ব্যবহার, খাদ্য উৎপাদনকারী এবং consumers-দের এ বিষয়ে শিক্ষা এবং সচেতনতার অভাব। দ্রুত নগরায়ণের ফলে প্রচুর পরিমাণে অনিরাপদ street food তৈরি হওয়াতে বাংলাদেশে Food safety সমস্যাকে আরও বেশি সমস্যাবহুল করে তুলছে।

যদিও এদেশে নিরাপদ খাবারের জন্য আইন তৈরি হয়েছে কিন্তু Infrastructure এবং অভিজ্ঞ জনগণের অপ্রতুলতার কারণে এদেশে খাবার মনিটর করার জন্য regulatory framework খুবই দুর্বল।

১৯৪৩ সালে জাতিসংঘের Food and Agricultural-এর ওপর একটি conference হয়েছিল যেটাতে Food quality & safety-র মাধ্যমে consumer-দের health protection এবং economic interest-এর ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই conference-এ মূল যে বক্তব্য ছিল সেটা হল একমাত্র consumer protection-এর মাধ্যমেই একটি দেশের উন্নততর আর্থিক এবং সামাজিক গুরুত্ব তৈরি করা সম্ভব। সেই সময় থেকে FAO বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করেছিল উন্নত খাদ্যমান এবং নিরাপদ খাবারের ওপর বিভিন্ন program নিতে খাদ্যের ওপর বিভিন্ন আইন, নিয়ম খাদ্যের Inspection, Food analysis এবং compliance কর্মতৎপরতার মাধ্যমে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীজগতে খাদ্য একান্ড়ভাবেই অপরিহার্য কিন্তু কখনও কখনও এই খাবারটি মানুষের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যখন এটা বিভিন্ন কারণে দূষিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল প্রথম World Health day পালিত হয়েছিল এবং WHO-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অনিরাপদ খাবার থেকে জনস্বাস্থ্যের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। অসুখের ইতিহাসে দেখা যায় small pox বা অন্যান্য vaccine preventable অসুখকে নির্মূল করা যত সহজ, খাদ্যবাহিত অসুখকে সেভাবে কখনই নির্মূল করা সম্ভব নয়। হয়তো-বা সেটার Incidenc-কে কমিয়ে আনা সম্ভব সমস্ড় sector-এর এবং সর্বোপরি মানুষেরই ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং যারা 'জমি থেকে খাবার টেবিল' পর্যন্ড় সম্পৃক্ত তাঁদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে, একান্ড়ভাবেই সদিচ্ছার দ্বারা নিরাপদ খাবার একবিংশ শতাব্দীর জন্য একটি বিরাট challenge.

নিরাপদ খাবার বলতে আমরা সেই খাবারকেই বুঝি যেটা কোনো জীবাণু এবং পরিবারদুষ্ট নয়, যেটার মাঝে নেই কোনো ক্ষতিকারক কেমিক্যালস এবং যেটা প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি বিষ থেকে মুক্ত। অবশ্যই সে খাবারটি হতে হবে প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ।

যে কারণগুলো দায়ী সেগুলো হল–

1. Microbiological hazards
2. Pesticide residues
3. Other chemical contaminants including Naturally occurring toxins
4. Misuse of food additives

Foodborme illness-এর outbreaks গুলোর জন্য প্রধানত দায়ী কিন্তু রোগ জীবাণুগুলোই। শস্য জন্মানো, post harvest handling of crops, processing, packaging, food distribution, storage & preparation prior to consumption, during serving এই সমস্ত process-এর মধ্যে food quality এবং safety-কে নিশ্চিত করতে হবে। যে মুহূর্ত থেকে খাদ্যের edible raw material গুলো তৈরি করা হয় বা প্রাণীজবাই এবং process করা হয় সেই মুহূর্ত থেকেই এগুলোর quality-র অবনতি ঘটতে থাকে যদি না সে ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। Bacteria, yeast, mould, insects and rodents খাদ্যের মাধ্যমে বহু ধরনের রোগ মানুষের মাঝে ছড়ায়।

বেশিরভাগ foodborne disease গুলো microbial in origin. সাধারণভাবে দায়ী রোগজীবাণুগুলো হল E. coli স্টেফাইলো কক্কাস এবং সালমোনেলা ইত্যাদি দ্বারা সাধারণভাবে origin হতে পারে। এগুলোর উপসর্গগুলো ডায়েরিয়া, বমি, জ্বর ইত্যাদি দ্বারা শুরু হয়। ভাইরাস দূষিত হয়ে Hepatitis, jaundice ইত্যাদিও হতে পারে। এগুলোর কারণ food chain-এর একটি একক অংশ থেকে এবং সাধারণ অবস্থা থেকে মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে।

অনেক out break হতে পারে meat, sea food, ডিম poultry এগুলো থেকে। আমেরিকার Centre for Science in Public Interest or CSPI-এর analysis অনুযায়ী তাদের ৩৫০০ out break-এর মধ্যে বেশিরভাগই non meat item যেমন sea food, ফল, ডিম, সবজি ইত্যাদি থেকে অর্থাৎ widely suspected meat এবং poultry ছাড়াও অন্য উৎসগুলো থেকেও out break হতে পারে।

Food chain একটি single contaminat point থেকে একই সাথে কয়েকশত বা কয়েক হাজার লোককে একই সাথে অসুস্থ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৯৪ সালে আমেরিকাতে Schwann's ICE CREAM যেগুলো salmonella ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দূষিত হয়েছিল এবং ২০ লাখ লোককে একই সাথে মারাত্মকভাবে অসুস্থ করেছিল।

ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও খাবারে Mould Fungi গুলো mycotoxin তৈরি করে প্রতি বছরই বহু লোককে অসুস্থ এবং মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে এদের মধ্যে Aflatoxin B_1 মানুষের Liver cancer তৈরি করে। তাছাড়া কীটপতঙ্গ এবং rodents সব সসময় খাদ্য store এবং transportation-এর সময় খাদ্যদূষণ করে বিভিন্ন রোগ ছড়াতে পারে। তাছাড়া অন্যান্য biological and chemical contaminants গুলো খাবারকে অনেক সময়ই অনুপযুক্ত করে তুলে এবং মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে।

এই contaminants গুলো আসতে পারে environmental or Industrial pollution থেকেও যেমন Mercury, lead, arsenic ইত্যাদি থেকে, Agricultural technology থেকে যেমন Pesticide, synthetic fertilizer or veternary drug থেকে অথবা Food processing practice থেকে। এগুলোর মাধ্যমে যদি foodchain-এর যে কোনো অবস্থান অর্থাৎ জমি থেকে খাবার টেবিল-এ কোনো ক্ষতিকারক উপাদান বা বাহক প্রবেশ করতে পারে– সেখানেই খাদ্যদূষণ হতে পারে।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে দেশের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। মাত্রাতিরিক্ত এই জিনিসগুলো ব্যবহারের ফলে নদ-নদীর মাছসহ অত্যন্ড় উপকারী প্যারাসাইট, ব্যাঙ ও সাপের মতো উপকারী পতঙ্গভোজী প্রাণী ও সরীসৃপ প্রায় বিলুপ্তির পথে, তাতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। নাইট্রেটস, ফসফরাস এবং জিংক অক্সিসালফেট অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতাও নষ্ট হচ্ছে, জিংক অক্সিসালফেটে রয়েছে ক্যাডমিয়াম এবং সীসা।

এই সব ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থগুলো কোনো না কোনো ভাবে খাদ্যচক্র বা পানির মাধ্যমে আমাদের দেহে আসছে এবং মানুষ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের শিকার হচ্ছে। ১৯৯২-৯৩ সালে এদেশের একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, এদেশের অনেক জলাশয়ের পানিতে বিষাক্ত কীটনাশক ডাইএলড্রিনের ইপস্থিতি WHO-এর নির্ধারিত সহনীয় মাত্রার চেয়ে (০.১৯) মাইক্রোগ্রাম/লিটার) অনেক বেশি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলায়ের প্রাণীবিদ্যা অনুষদের বিজ্ঞানীদের মতে ডায়াজিন ফুরাডান-এর অবশেষ মাছে ক্ষতিকর মাত্রায় রয়েছে। এসব কারণে প্রাকৃতিক মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রজননক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে । ইদানিং মাছে, দুধে ফর্মালিন ভীতি সকল স্ড়রের মানুষকে একটি অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে। কাঁচাবাজার থেকে শুরু করে অভিজাত chain store, grossary, supermarket যেখানেই ক্রেতা-ভোক্তারা যাক-না যেন সন্দেহটি তাদের মনে থেকেই যাচ্ছে।

ঢাকা শহরের এক কোটিরও অধিক লোক প্রতিদিন প্রায় ৫০ মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি খায়। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৩০ মেট্রিক টনই বিষাক্ত কীটনাশক মেশানো। এগুলোতে WHO / FAO-এর নির্ধারিত সহনীয় মাত্রার অধিক ডিডিটি এবং লিনডেন নামক ক্ষতিকারক রাসায়নিক জিনিস রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধার না।

খাদ্যসামগ্রী গুদামজাত করতে বিভিন্ন কীটনাশক ব্যাবহার হয়। শুটকি মাছ প্রক্রিয়াজাত করতে ও গুদামজাত করতে ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। বলা হয়ে থাকে এর বিষাক্ত উপাদানগুলো গরম পানিতে ধোয়ার পরও প্রচুর

পরিমাণে থেকে যাচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে ডিডিটির ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে এর ব্যবহার এখনও রয়েছে।

শরীরের জন্য ক্ষতিকারক যে কোনো উপাদানেরই অনেকগুলোর short term এবং অনেকগুলোর long term effect আছে। Food poisoning-এর একটি out break হলে এক সাথে বেশ কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, কিছু লোক মারাও যেতে পারে। সেগুলোতে তাৎক্ষণিক কিছু Impact হয়, সংবাদপত্রে বিশাল খবর হয়ে আসে, কর্মকর্তাদের তৎপরতা বাড়ে সাময়িকভাবে হলেও।

ক্ষতিকারক যে কোনো agent-এর দীর্ঘমেয়াদি impact-এর ভয়াবহতা অনেক বেশি। অজ্ঞাতসারে সে ক্ষতি করে দিতে পারে একজন গর্ভস্থ শিশু থেকে শুরু করে যে কোনো section of population, একটি জেনারেশনকে, তার পরবর্তী জেনারেশনকেও।

গর্ভবতী মায়েরা যদি environmental hazards-এর শিকার হন সেটা খাদ্য, পানি যেটার মাধ্যমেই হোক না কেন মায়ের সাথে সাথে তার গর্ভস্থ সন্তান ও সেটার শিকার হতে পারে। Transplacental barrier ভেদ করে অনেক Toxic পদার্থ foetus-কে affect করতে পারে। অনেক রিপোর্ট আছে যেখানে দেখা গেছে মায়ের বুকের দুধে, মায়েদের খাবারে অনেক persistant contaminants আছে। Organo-chlorines গুলো হল dioxin, DDT, poly-chlorinated biphenyls. তাছাড়া heavymetals mercury, lead & cadmium. এগুলো অনেকগুলোই Industrial waste-এগুলো বিভিন্ন ভাবে food chain-এ আসে। সমস্ত পৃথিবী জুড়েই এগুলো আছে। যে পপুলেশন vulnerable তাদের শরীরে Food chain-এর মাধ্যমে বিশেষ করে চর্বিযুক্ত অংশে, এগুলো জমে সেখান থেকে আসে বুকের দুধ।

Dioxin-কে দায়ী করা হয়ে থাকে cancer hazard-এর জন্য । এটা Industrial process-এর by product হিসেবে আসে প্রায় প্রতি বৎসর পৃথিবীতে ৩০০০ কেজি। এটা পরিবেশ দূষণ করে, এটা আমাদের Invironment-এ ও আসে। Mercury in dental amalgum ও একটি public health concer কারণ এই dental amalgm থেকে mercury breast mild-এ আসে। একমাত্র heavy metal যেটা food chain এর মাধ্যমে breast milk এ আসে।

Recent UNICEF এবং অন্যান্য study থেকে দেখা গেছে whole breast milk এ industrial country গুলোতে poly chlorinated biphenolss and dioxin বেশি, Developing country গুলোতে DDT বেশি।

১৯৫৩ সালে জাপানে বহুসংখ্যক লোক Murcury দ্বারা দূষিত মাছ খেয়ে বধির, অন্ধ, ভারসাম্যহীন, বুদ্ধিমত্তাহীন হয়েছিল। বহু গর্ভস্থ শিশু অসুস্থ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। সিসা-দূষণের কারণে রক্তশূন্যতা Liver, Kidney damage, wrist drop, Neurological problems, coma, death গর্ভস্থ শিশুর abortion & still birth হয়েছিল।

আমাদের এই বাংলাদেশে বিভিন্ন survey থেকে দেখেছি জনগণের একটি বিরাট অংশ অপুষ্টির শিকার শিশুরা, মায়েরা বেশি অপুষ্টিতে ভুগছে। এদেশে জন্মকালীন কম ওজনের শিশু অনেক বেশি। প্রায় শতকরা দশজনই শারীরিক এবং মানসিক

প্রতিবন্ধী। এই মানসিক প্রতিবন্ধিতার হার ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে Neurological problems এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, Liver problem, kidney র জটিলতা। অপুষ্টির কারণে contaminants গুলো শরীরের ভেতরে ক্রমশ তাদের জায়গা করে নেয়, বিশেষ করে চর্বির কোষে। এক সময় শরীরে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করে।

১৯৬২-৬৪ সাল থেকে এ পর্যন্ড় যতগুলো জাতীয় পর্যায়ে পুষ্টি জরিপ হয়েছে দেখা গেছে আমাদের দেহে প্রায় সবগুলো Nutrients-এই ঘাটতি আছে। আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে রক্তশূন্যতা প্রায় শতকরা ৭০% জনেরই, ক্যালসিয়াম ঘাটতি প্রায় ৭৯% এবং ভিটামিন-সি এর ঘাটতি প্রায় ৪৮% লোকের মধ্যেই। আমাদের খাবারে যদি ক্যালসিয়াম ঘাটতি থাকে তাহলে আমাদের শরীরে বেশি সিসা জমবে এবং শোষিতও হবে। খাবারে লৌহের অভাব থাকলে বেশি সিসা শোষিত হবে। প্রসূতি মা এদের বুকের দুধে সেটা বেশি পরিমাণে আসবে এবং শিশুরা ক্ষতিকারক অবস্থার শিকার হবে। শরীরে সিসার মাত্রা বাড়ার সাথে জিংক ঘাটতিরও একটি সম্পর্ক আছে।

প্রাকৃতিকভাবেই অনেক Toxin খাবারে তৈরি হয়, যেমন খেসারি ডালে একটি Neurotoxin রয়েছে। যদিও ডাল আমাদের প্রাণীজ আমিষের একটি ভালো উৎস। কিন্তু এই Toxin টি আমাদের শরীরে যখন vitamin C-এর ঘাটতি থাকে তখন শরীরে accumulate করতে থাকে, যখন এটার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন overt syndrome of Neurolathyrism হয়। মানুষের শরীরে নিম্নের অংশ অবশ হয়ে যায় এবং অসুবিধাটা স্বাভাবিক অবস্থায় আর কখনই ফিরে আসে না। বেশিরভাগ প্রাণী যেমন গরু, ছাগল, মহিষ এরা এই ডাল খেলে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু মানুষের এবং অন্য primates যেমন বাঁদর এদের শরীরের নিচের অংশে spastic type of paralysis হয় যখন এদের শরীরে ভিটামিন সি-এর ঘাটতি থাকে এখানে উল্লেখ্য যে মানুষ এবং প্রাইমেটসরা তাদের শরীরে ভিটামিন সি তৈরি করতে পারে না, কিন্তু বেশিরভাগ প্রাণীই সেটা পারে। ভিটামিন সি-এর মতো আরও অনেক অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান আছে যেগুলো মানুষকে তার প্রতিদিনের খাবার থেকে পেতে হয়।

যাঁরা খাবার তৈরিতে সম্পৃক্ত বিশেষ করে Food company গুলো, সেটা baby food-ই হোক আর geriatric food-ই হোক, নিরাপদ খাবার তৈরিতে উপরে বর্ণিত এই issue গুলো তাদের জানতে হবে। Laboratory analysis-এর মাধ্যমে যেগুলো essential nutrients সেগুলো supplement করতে হবে নির্দিষ্ট মাত্রায়। Food label-এ এগুলোর উল্লেখ থাকতে হবে।

খাদ্যসমস্যার আরও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। যেমন Fast food, snacks, street food ইত্যাদি processed food আমাদের প্রতিদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এগুলোর বেশিরভাগই হয়তো সুষম নয়।

১৫ নভেম্বর, ২০০৯-এর 'ইত্তেফাকে'র একটি শিরোনাম ছিল "ভারত ডায়াবেটিসের রাজধানী"। তাঁদের বিজ্ঞানীদের মতে সেদেশে অল্পবয়সীদের মধ্যে ডায়াবেটিস রোগটি বাড়ছে। ভারতের International Diabetes federation-এর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে অল্পবয়সী ১১-১৯ বৎসরের কিশোর-কিশোরী যাদের খাদ্য তালিকায় জাংকফুড বা ফাস্টফুড থাকছে তারাই ডায়াবেটিসের শিকার হচ্ছে বেশি।

আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের লোভনীয় পিৎজা, পটেটো চিপস, বার্গার. প্যাস্ট্রি, নুডলস, কোল্ডড্রিংকস এবং কম আয়ের পরিবারের ছেলেমেয়েদের সিঙ্গারা, পুরি টিফিনে যুক্ত হওয়ায় এদের মধ্যে ডায়াবেটিসের সংখ্যা বাড়ছে। ভারতে বড় শহরগুলোতে ২০ শতাংশ বাচ্চা বেশি ওজনের হয়ে যাচ্ছে, যারা পরবর্তীকালে ডায়াবেটিস এবং হার্ট, কিডনি ইত্যাদির জটিল সমস্যার শিকার হয়।

আমরা কি কখনও ভাবি আমাদের দেশের শিশু-কিশোরদের কী অবস্থা, তাদের খাদ্যাভ্যাস কী রকম, তাদের খাবার সুস্থ শরীর এবং সুস্থ মনের জন্য কতটুকু নিরাপদ? নিঃসন্দেহে আমাদের বেশিরভাগ কিশোর-তরুণরাই ছুটছে Westernised food-এর দিকে। যদি কেউ লক্ষ করে থাকেন দেখবেন আমাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে, কত দ্রুত তারা খাদ্যব্যবসায় জায়গা করে নিয়েছে, কত দ্রুত fast food-এর দোকানগুলো গজিয়ে উঠেছে। প্রচুর চাহিদার কারণেই এগুলো তৈরি হচ্ছে। মা-বাবার আয়ের একটি বিরাট অংশ এই নতুন প্রজন্মের খাবারের পেছনে যাচ্ছে। যে শিশুদের মা-বাবার সঙ্গতি কম তারা কম দামের স্ট্রিটফুড বা পথখাবার খাচ্ছে। সবাই processed food-এর ওপরই মানসিকভাবে নির্ভরশীল।

আসলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কী খাচ্ছে, কতটা অনিরাপদ এবং ঝুঁকিপূর্ণ খাবার খাচ্ছে সেটা কিন্তু তাকিয়ে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপুষ্টির পাশাপাশি আমাদের দেশে বেশি ওজনের পপুলেশন এবং এর পড়হংবয়ঁবহপবং ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ইত্যাদি আমাদের জন্যও একটি emerging issue হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই খাবারগুলো fat dense এবং calorie dense খাবার, এগুলোর বেশিরভাগই হিমায়িত, কিছু canned এবং প্লাস্টিক মোড়কজাত খাবার। এই খাবারগুলোতে বেশির সময়ই থাকে অতিরিক্ত saturated fat, TFA বা Trans fatty acids. খাদ্য প্রস্তুতকারীগণ তরল তেল-কে semi solid form-এ নিয়ে যায় (যে পদ্ধতিতে এটা partially hydrogenated হয়), এই solid from টাই হল TFA এবং মচমচে করার জন্য commercially fried food বেকারি products crackers, cookis French fries pastry, donuts, cakes খাবারে এগুলোর ব্যবহার আছে। খাদ্য প্রস্তুতকারীগণ এসব চর্বি বা fat-কে commercially ব্যবহার করে থাকে কারণ যে যেসব খাবারে TFA থাকে বা saturated fat থাকে সেসব খাদ্যদ্রব্যের shelf life অনেক লম্বা থাকে। তাছাড়া এগুলো বেকারি, snacks product-এর texture সুন্দর করে, taste and flaver মজাদার করে যেমন pastry, অনেক জন্মদিনের special cake-এ এগুলো দেওয়া হয়। এই খাবারটি মুখে দিলে, এমন একটি feeling হয় "melt in your mouth". সেজন্য শিশু এবং কিশোররা এটা বেশি পছন্দ করে। কিন্তু TFA স্বাস্থ্যের দিক থেকে ক্ষতিকারক, হার্টের অসুস্থতার risk বাড়িয়ে দেয়। এটা খারাপ cholesterol-কে বাড়িয়ে দেয় (eg. LDL) এভাবেই Heart disease or coronary disease-এর risk-কে বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া processed food-এ requirement-এর তুলনায় অনেক বেশি লবণ থাকে। অধিক লবণ খাওয়াও Heart disease-এর জন্য ক্ষতিকারক।

London-এর Food Policy City University-র বিজ্ঞানীদের মতে সেদেশে stroke বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের হার কমাতে একমাত্র এবং দ্রুত ব্যবস্থা হল যে processed food গুলো তাদের জনগণ খায় সেগুলোর লবণের পরিমাণকে শুধুমাত্র অর্ধেকে কমিয়ে আনা। বাংলাদেশী processed food-এ এ-দুটোর মাত্রাই অত্যধিক।

University of Hawai এর ৭ বৎসরের Long term study থেকে দেখা গেছে যে, যারা processed meat যেমন Hot dog, সসেজ ইত্যাদি বেশি খায় তাদের মধ্যে pancreas এর ক্যান্সার রেট প্রায় ৬৭% বেশি, যারা সেগুলো খায় না তাদের থেকে। Canadian Expert-দের একটা study থেকে দেখা গেছে ৫০-৮০ বৎসর বয়স্ক লোকদের মধ্যে যারা প্রচুর পরিমাণে processed food যেমন মাংস, বিশেষ করে beef, pork বা এগুলোর organ, প্রচুর তেল এবং soft drink খায় তাদের মধ্যে significant level of higher risk of prostatic cancer আছে।

১৮০০ জন Mexican মহিলার ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যারা Refine CHO থেকে তাদের Energy পায় ৫৭% বা তারও অধিক তাদের মধ্যে যারা সুষম খাবার খায় তাদের থেকে Breast cancer-এর rate অনেক বেশি। Breast cancer-এর একটি অন্যতম risk factor হল highly dense fatty food.

খাবারের আর একটি দিক হল রং। এটা খাবারের কোনো মান বাড়ায় না, এটা শুধু ক্রেতা-ভোক্তাদের আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা খাবারকে কোনো অনিরাপদ এজেন্ট থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে না। তাছাড়া synthetic color যে grade-এরই হোক না বাদ দিতে পারলেই ভালো। ছোট বড় বেকারি, কনফেকশনারি street food vendors -রা যেসব রকমারি রং মেশায় সেগুলোর আসলেই কোনো ভালো দিক নেই বেশিরভাগই নিম্নমানের। যদি এই রং মেশানোর উদ্দেশ্য হয় খাদ্যের কোনো ত্রুটিকে ঢাকার জন্য, নিম্নমানকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সেগুলো মারাত্মক অপরাধ। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক এমন কিছু করা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। নিম্নমানের আইসক্রিম থেকে শুরু করে বিখ্যাত ব্র্যান্ডের বেকারি প্রডাক্ট-এ ক্ষতিকারক কোনো synthetic রং যদি মেশানো হয় consumer-রা কখনই সেটা ক্ষমার চোখে দেখবেন না কারণ এগুলোর শিকার হবে তারা, তাদের ছেলেমেয়েরাই। এমনও information আছে অনেক খাবার আছে যেখানে রং হিসেবে textile grade-এর রং ব্যবহার করা হয়। এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যধিক মারাত্মক, কাবসিনোজেনিকও বটে।

Food additives গুলোর মধ্যে বেশিরভাগে কোনো পুষ্টি-উপাদান নেই। এগুলো খাবারের মধ্যে সচরাচর ব্যবহার করা হয় খাবারের রং, texture, taste, flavor, consisteny, shelf life, antimicrobial activity– এগুলোর উন্নতির জন্য।

প্রাচীনকাল থেকেই মাংস এবং মাছ এবং অন্যান্য দ্রুত পচনশীল খাবার সংরক্ষণের জন্য লবণ এবং চিনি ব্যবহার করা হত। Canned food-এর হিমায়িত খাবার বিশেষ করে ফলজাতীয় খাবার, জ্যাম এবং জেলিতে চিনি preservative হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য additive যেমন potassium sorbate, sodium propionate এগুলো Baked food, cheese, পানীয়, Mayonaise, margarin ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

Antimicrobial agent হিসেবে nitrites ব্যবহার করা হয়। এটা clostridium botulinum নামক bacteria যেটা খুবই খারাপ ধরনের botulinum toxin তৈরি করে (বিশেষ করে মাংসজাতীয় খাবারে) মানুষকে মারাত্মকভাবে অসুস্থ করে ফেলে কিন্তু এটা নিয়ে অনেক মতামত এবং মতভেদ আছে। এটার chronic exposure কিছু লোকের জন্য সামান্য থেকে serious type of allergy তৈরি করতে পারে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞদের মতে এই nitrites-টি মানুষের পাকস্থলিতে পৌঁছানোর পর nitrosamine নামক একটি উপাদান তৈরি করে যেটা animal study-তে দেখা গেছে যে এটা শরীরে ক্যান্সার তৈরি করতে পারে।

প্রায় ২৭টি antioxidants-কে খাবারের preservative হিসেবে ব্যবহারের জন্য approved করা হয়েছে। Vitamin C এবং Vitamin E বা tocopherol তাদের মধ্যে আছে। Vitamin E যদি খাবারে দেওয়া হয় সেটা nitrites-এর nitrosamine formation-এর chance-কে প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনে। তবে মাত্রাতিরিক্ত কোনো additive-ই খাবারে ব্যবহার করা কখনই উচিত নয় সেটার Nutrient value থাকলেও।

আর-এক গ্রুপের preservative ব্যবহার করা হয়। এটা হল sulfites, এটা antioxidant peservative থেকে দামে সস্তা । processed খাবারের পচনশীলতা ব্যাহত করার জন্য এটা ব্যবহার করা হত। ঔষধেও এর ব্যবহার রয়েছে। Restaurant owner-দের কাছে সালাদ বারে জন্য এটা খুবই জনপ্রিয়। কারণ এই sulfites কাঁচা সবজি এবং ফলকে তাজা রাখতে সাহায্য করে। এটার খারাপ ধরনের allergic hazards-এর জন্য অনেক দেশেই এটা banned করে দেওয়া হচ্ছে। এটা খাবারের B-vitamin thiamin-কে অনেকটাই নষ্ট করে দেয়। এ ব্যাপারে Food Industry, রেস্টুরেন্ট-এর মালিকদের দৃষ্টি রাখতে হবে।

একটি ভীষণ জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত Flavoring agent হল Monosogium glutamate অথবা টেস্টিং সল্ট। জাপানের Ajino moto company-র তৈরি এই agent টি বাংলাদেশসহ সমস্ত Asian restaurant গুলো এমনকি বাসাবাড়িতে এটা ব্যবহার করে আসছে বহু বছর থেকে। সাধারণভাবে Adult food-এ এটার ব্যবহারে এখনও অনুমোদিত যদিও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার Chinese restaurant syndrome নামে অনেক Neurological problem develop করে যেমন burning sensation, facial flushing, throabing headache

এটা ছোট শিশুদের খাবারে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কারণ শিশুদের brain cell এটা নষ্ট করে দেয়। সেজন্য শিশুদের কোনো দুধ বা অন্যান্য বেবিফুডে এটা কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি সচেতন হতে শুরু করেছে। খাদ্যনিরাপত্তায় নিরাপদ খাবার, তার সঠিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা শেখালে সবার শ্লোগান হল একটি 'safe food from Firm to Fork' অর্থাৎ জমিতে খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাবারের টেবিল পর্যন্ত সবার জন্য চাই নিরাপদ খাবার। এই নিরাপদ খাবারকে ensure করতে গেলে দরকার সরকারের সংশ্লিষ্ট sector গুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং কোঅর্ডিনেশন, NGO-দের ভূমিকা সেই সাথে ক্রেতা-ভোক্তা ও খাদ্যব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ততা। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে Food scientist -দের সংশ্লিষ্টতা। এটা সবাইকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের লোকদের জন্য পৃথিবীর সব দেশের মতোই খাবার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য একটি অন্যতম contributory factor.

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Food quality এবং safety-র গুরুত্বপূর্ণ decision making-এ বিশেষ করে Food standard, খাদ্যের chemicals-এর ব্যবহার, policy এবং regulation তৈরিতে সরকারি sectors ও Industrialist এর সাথে সাথে consumer-দের সম্পৃক্ততা করে তাদের support system এবং খাদ্য বিষয়ক relevant information গুলো যাতে উন্নততর করা যায় এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই FAO / WHO-র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে FAO / WHO-র General Agreement on Tarriffs & Trade (GATT) Food Safety-তে consumer-দের ভূমিকা থাকার ব্যাপারে একই মতামত ছিল।

নিরাপদ খাবার সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি ও বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রেতা-ভোক্তাদের সংশ্লিষ্টতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১) সরকারি পর্যায়:

ক্রেতা-ভোক্তাদের জন্য continuing education and participatory program যেগুলোতে বিশেষভাবে থাকবে Food hygiene, Food contaminants, Food standards এবং Food labelling ইত্যাদি বিষয়গুলো।

২) বিশেষ Target group-কে identify করা এবং তাদের মধ্যে খাদ্য-সচেতনতা তৈরি করা। এই Target group গুলো হতে পারে:

ক) সাধারণ জনগণ

খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

গ) স্কুলটিচার এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ

ঘ) স্থানীয় ধর্মীয় নেতাগণ
ঙ) মা– বিশেষ করে বাড়িতে যারা খাবার তৈরি করেন এরা হতে পারেন
চ) রেস্তোঁরা, বেকারি ও ফাস্টফুডের দোকানের মালিক ও Food handlers পরিবেশনকারীরা হতে পারেন
ছ) খাদ্য প্রস্তুতকারীগণ
জ) Food inspector গণ
ঝ) পলিসি এবং ডিসিশন তৈরিকারকগণ
ঞ) মিডিয়া যেমন টেলিভিশন, রেডিও, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩) সেমিনার, ডায়ালগ এগুলোও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী-অবিভাবক এই রিলে সিসটেমটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

৪) প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা:
খাদ্যনিরাপত্তায় বিভিন্ন সংগঠন বা Association-এর ভূমিকা সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ Consumers Association-এর সচেতনতা তৈরিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

৫) এন.জি.ও.দের ভূমিকা থাকতে পারে

৬) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ট্রেইনং এবং টেকনিক্যাল সহায়তা দিতে পারে।

শিশুখাদ্যের বিশেষ নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। Infant ফর্মুলায় টেস্টিং সল্ট বা Monosodium glutamate ব্যবহার করা যাবে না– এটি শিশুদের নিউরোলিজিক্যাল সিস্টেমে অসুবিধা তৈরি করতে পারে। বাজারে মোড়কজাত খাবার যেগুলো ছোট শিশুরা খায় সেগুলোতে টেস্টিং এর সল্ট এবং সিনথেটিক রং পুরোপুরিই নিষিদ্ধ করা উচিত। ম্যালামাইনসহ যে কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ এখানে কোনো ভাবেই থাকা উচিত নয়। যাদের দুধে এলার্জি আছে এবং দুধের বিকল্প খাবার দেওয়া তাদের খাবারে Essential amino acid গুলোর সবগুলোই যুক্ত করতে হবে।

স্কুল কর্তৃপক্ষে মাধ্যমে স্কুল লাঞ্চ প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে। এই প্রোগ্রামের আওতায় যে খাবারটি তৈরি হবে সেটাতে অবশ্যই
ক) Trans fatty acid (TTA) থাকবে না
খ) র‌্যানসিড তেলে ভাজা হবে না
গ) বাসি-পচা খাবার হবে না
ঘ) ক্ষতিকারক কেমিক্যালস বা রং থাকবে না
ঙ) ব্যাকটেরিয়া বা প্যারাসাইট দ্বারা দূষণ হবে না
চ) Food handler-দের হাতে তৈরি বা পরিবেশিত হবে না
ছ) খাবারটি অবশ্যই পুষ্টিসমৃদ্ধ সুষম খাবার হবে

নিরাপদ খাবারে সুপার মার্কেট ও রেস্টুরেন্টের ভূমিকা:

বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল সুপার মার্কেট -এর প্রতিনিধিত্ব করেন। বাংলাদেশে নিরাপদ খাবারের জন্য জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে তাঁদের একটি বিশাল ভূমিকা অবশ্যই থাকতে হবে।

এই সুপার মার্কেট বা খাবারের চেইন মার্কেটগুলোর যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে সেগুলো হলো:

১) ফুড স্যানিটেশন বা Food handling-এর ওপর খুব কম সংখ্যকই trained person আছে। Food store এবং wirehouse গুলোর hygienic condition সঠিক তাপমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। কোনো রকম মাছি-কীট-পতঙ্গ যেন সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। কোনো রকম দুর্গন্ধ যেন সেখানে না থাকে।

২) খাবার মার্কেটে রিসিভ করার সময়ে প্রতিটি খাদ্যের physical outlook, labeling, মেয়াদকাল এগুলো চেক করতে হবে। মেয়াদকাল থাকলেও খাবারটির মেয়াদকাল যদি উত্তীর্ণের কাছাকাছি সময়ের হয় সেটা গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

মেয়াদকাল থাকলেও খালি চোখে সেগুলো যদি নষ্ট মনে হয় বা খাবারের অনুপযুক্ত মনে হয় সেগুলো সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

৩) সরবরাহকারী উৎসগুলোর নিরাপদ সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যেমন– হিমায়িত খাবার, সামুদ্রিক খাবার, কাঁচা মাংস, মুরগি ইত্যাদি।

৪) গুদামঘরের শস্য, বাদাম, কোল্ড স্টোরেজে রাখা খাদ্য এগুলোর safety সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

৫) শুটকি মাছ এবং অন্যান্য খাবারের সংরক্ষণ ও প্রসেসিং-এর সকল ধরনের safety সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

৬) সকল সুপার মার্কেটের নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত, পরিচ্ছন্ন slaughter house থাকতে হবে।

৭) সেলফে রাখা খাবারগুলো যেন অবশ্যই মানসম্মত, বিষমুক্ত, ঠিকমতো লেবেলিংযুক্ত থাকে।

৮) রেস্টুরেন্ট এবং ফাস্টফুডের দোকানগুলোর অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বিক্রি করতে হবে।

স্ট্রিট ফুড বা পথ খাবার

দ্রুত নগরায়ণের ফলে এই ধরনের খাবারের দোকানগুলোর সংখ্যা বাড়ছে। এই খাবারের ক্রেতাদের সংখ্যা অনেক বেশি। বিশেষ করে স্বল্পআয়ের লোকেরাই এই খাবার খাচ্ছে। এই ধরনের খাবার খাদ্য ও পানিবাহিত রোগের উৎস। এসব খাবারের ব্যাপারে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত সেগুলো হল:

ক) সরকারের পক্ষ থেকে কতগুলো Model street food vending shop করতে হবে যেখানে স্বাস্থ্যসম্মত এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার বিক্রি হবে।
খ) ভেন্ডারস এবং ভোক্তাদের খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
গ) এই খাবারের মান এবং নিরাপদের জন্য বিশেষ Inspection team থাকতে হবে।

কখনই যেন পচা খাবার বা আগের দিনের খাবার মেশানো না হয়, অনিরাপদ রং যেন

মেশানো না হয়।

ঘ) খাবার পানি এবং অন্যান্য পানীয় যেন নিরাপদ হয়।
ঙ) খাবারর উপর যেন ঢাকনা থাকে। মশা-মাছি, ধুলা-বালি যেন এগুলোতে না পড়ে।
চ) গরম খাবার পরিবেশন করতে হবে। এই সমস্ড় দোকানগুলো আইনের আওতায় আনতে হবে।

পশুখাদ্য এবং পোল্ট্রি ফিড:

এগুলো অবশ্যই নিরাপদ হতে হবে। পশুপাখির নিরাপত্তা ও খাদ্যের উৎস হিসেবে মানুষের নিরাপত্তা এখানে অবশ্য থাকতে হবে।

কৃষকের ও কৃষিক্ষেত্রের নিরাপত্তা:

রাসায়নিক ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং এগুলোর কারণে মানুষের ও পরিবেশের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন করতে হবে।

বাংলাদেশে BSTI ছাড়াও উন্নতমানের একটি Central Food Technological Laboratory তৈরি করতে হবে সেটা বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের / এক্সপার্টদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। যেখানে সকল প্রকার microbiology থেকে শুরু করে যে কোনো ধরনের toxic substance analysis করা সম্ভব হবে।

এদেশে নিরাপদ খাবারের জন্য দায়বদ্ধতা তখনই পুরোপুরি হবে যদি সততা ও সদিচ্ছা আমাদের সব দায়িত্বশীল লোকের মাঝে থাকে। সমস্ত সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলোর এ ব্যাপারে active coordination এবং support থাকতে হবে।

[লেখক: অধ্যাপক, ড. খুরশীদ জাহান পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া: আমাদের কত টাকা প্রয়োজন!

মো. আ ব্দু ল আ উ য়া ল

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু আমাদের কর্ম কি তার প্রমাণ দেয়! মানুষের মধ্যে দু'টি দিক আছে; একটি মনুষত্ব অপরটি পশুত্ব। সেদিক থেকে আমাদের মধ্যে পশুত্বের দিকটিই বেশি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষ যা কিছু খেয়ে জীবনধারণ করে সেটিকে আমরা মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি, আমরা মানুষেরা সেই খাদ্যেই হরহামেশা প্রকাশ্য দিবালোকে ভেজাল ও বিষ মেশাচ্ছি। কিন্তু আমাদের খাদ্যে আমরা এই ভেজাল ও বিষ মেশাচ্ছি কেন? অবশ্য এর জবাব খুব সোজা; সেটা হল আমাদের মধ্যকার মনুষত্বটা পশুত্বের কাছে পরাজিত হয়ে আছে কিংবা পরাজিত হচ্ছে বলে।

এখন নিজেদেরকেই প্রশ্ন করি মানুষ যেখানে সৃষ্টির সেরা জীব সেই মানুষের অর্থাৎ আমাদের পরিস্থিতি ও পরিণতি এমনটি হলো কেন? আমি বলব, এমন অধপতন আমাদের হয়েছে শুধু মাত্র স্বার্থের কারণে। আমরা আজ এমন একটি অবক্ষয়ের মধ্যে পড়ে আছি, যেখান থেকে নিজের স্বার্থ ছাড়া যেন আর কিছুই আমরা বুঝতে চাচ্ছি না। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর মতে, 'পরতে পরতে আত্মপরতা'– একথার একটি-ই অর্থ দাঁড়ায়, সেটা হল, আমি আমারটা ছাড়া অন্য কারও স্বার্থই বুঝিনা। খাদ্য বা যে-কোনো পণ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়ার মূল কারণ হল দ্রুত অর্থ উপার্জন করা এবং অতিমাত্রায় অর্থ উপার্জন করা। পুরো জাতি আজ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, টাকা ছাড়া যেন আমাদের আর কিছুই দরকার নেই; যে-কোনো মূল্যে টাকা, দ্রুত এবং অতিরিক্ত টাকা উপার্জনই যেন আমাদের একমাত্র নেশা। আমাদের টাকা প্রয়োজন– একথা না-হয় মেনে নিলাম। কিন্তু কত টাকা প্রয়োজন সেটা আমরা যেন জানি না; আবার সেই টাকা দিয়ে কী কাজ করব; কী প্রয়োজনে এত টাকা টাকা করা হচ্ছে; তাও আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ এই চাহিদার তো একটা শেষ থাকতে হবে; একটা জায়গায় গিয়ে আমাদের চাহিদার সমাপ্তি টানতে হবে; কিন্তু আমাদের চাহিদা সেখানে এতটাই বল্গাহীন হয়ে উঠেছে; সে-কারণেই আমরা এত টাকা টাকা করছি এবং সেই অকারণ প্রয়োজন মেটানোর জন্যই খাদ্যের মত দ্রব্যে আমরা ভেজাল ও বিষ মেশাচ্ছি।

আমি ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি: এবার শীতের শুরুতে ব্যক্তিগতভাবে আমি সরাসরি কম্বলের বাজারে গিয়েছিলাম কিছু কম্বল কিনে কিছুসংখ্যক মানুষের মধ্যে বিতরণ করার জন্য। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, শীতের শুরুতে কম্বলের যে-দাম ছিল কয়েক দিন পরে যখন শীতের প্রকোপ বেড়ে গেল তখন আরও কিছু কম্বল ক্রয়ের জন্য যখন বাজারে যাই তখন কম্বলের দাম পূর্বের দামের প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়; সারা দেশ যখন প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ শীতের প্রকোপে প্রায় মারা যাচ্ছে তখন আরেক দল মানুষ কম্বলের দাম বাড়িয়ে দিয়ে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই মানসিকতা কেন? এর সমাপ্তি ঘটবে কীভাবে? সত্যি কথা বলতে কি আমি তো জাতিগতভাবে ইতিবাচক সম্ভাবনার কোনো পথ খোলা দেখি না। কেননা আমরা মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছি; যেখান থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের সবার আগে মানুষ হতে হবে।

এই মানুষগুলো নিয়েই তো তৈরি হয়েছে আমাদের সমাজ; কিন্তু কেন এরকম একটি পচনশীল সমাজ তৈরি হলো! তবে কি এরকম পচনশীল একটি সমাজ তৈরির পেছনে মূল কারণ আমাদের পশ্চাৎপদ ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা! অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর একটি বইয়ের প্রসঙ্গে আবারও আসতে চাই; বইটির নাম হল, 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক'। আমাদের এই সমাজ কীভাবে এতটা পচনশীল অবস্থায় এল, তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা তিনি এই বইতে উল্লেখ করেছেন; যে-সব কারণে সমাজের এই অধপতন, সে-সবের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধহীন অপূর্ণ একটি শিক্ষাব্যবস্থা অন্যতম কারণ!

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি ছেলে বা মেয়ে ধরা যাক প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে শিক্ষাজীবনের সর্বশেষ পর্যায় অর্থাৎ মাস্টার্স পর্যন্ত পৌঁছলো– এই সময়ের মধ্যে আদর্শের প্রতি কোথাও কারও অনুরক্তি সৃষ্টি হবে এমন সিলেবাস বা শিক্ষা-প্রণালী আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নেই বললেই চলে। আমাদের ছোট বেলায় আমরা তো 'আদর্শলিপি' নামে একটি বই পড়েছিলাম। কিন্তু সেই "আদর্শলিপি" এখন আর নেই। কেন নেই? আমাদের জীবনে আদর্শের প্রয়োজন হয়ত আর নেই বলেই এটি হারিয়ে গেছে! এবং এই অধপতন শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়, নৈতিক শিক্ষার অভাবে গুটিকয়েক দেশ বাদে পৃথিবীর প্রায় সবখানেই এই আদর্শের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলব, যে-শিক্ষা দুর্নীতিগ্রস্থ হতে শেখায়, খাদ্য বা

পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশাতে শেখায়; আমার মনে হয় সেই শিক্ষায় শিক্ষিত না-হওয়াই ভালো।

দুই.

আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র কীভাবে চলবে, শিক্ষা-ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, কৃষি ও বাজার-ব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে– এগুলো ঠিক করবে রাজনীতি। একটি দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাজার ইত্যাদির মধ্যে গলদ থাকলে বুঝতে হবে রাজনীতিটাই আসলে ঠিক নেই। যে আদর্শ তৈরি হবে শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কি-না – এই বিষয়টি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। কাজেই রাজনীতি যদি সঠিক পথে চালিত না-হয়; তাহলে রাজনীতিকে ঠিক করবে কে? আসলে রাজনীতিবিদদেরই দায়িত্ব রাজনীতিকে ঠিক করার। সুতরাং আজ দেশের মধ্যে প্রত্যেকটি দ্রব্যে অর্থাৎ চাল, ডাল, মাছ, তারকারী, ঔষধ– এক কথায় প্রায় সব কিছুর মধ্যেই যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া দেখা যাচ্ছে সেটা ওই ভুল রাজনীতি বা মানহীন রাজনীতির কারণেই।

আমার জানা মতে প্রতি বছর বিদেশ থেকে বিশাল পরিমাণে কেমিক্যাল আমদানী করা হয়। সেই কেমিক্যাল যারাই আমদানি করুক, সেটা যে সরকারের দায়িত্বশীল পদস্থ ব্যক্তিবর্গ জানেন না এমন না। আমার প্রশ্ন হল, এই যে বিশাল পরিমানে কেমিক্যাল আমদানি হচ্ছে; এই আমদানি বন্ধ হোক এটা কি আমরা চাই নাকি চাই না! এই যে চাই নাকি চাই না কিংবা কতটা আমদানী করা প্রয়োজন তারচেয়ে বেশি আমদানী করা হচ্ছে কি-না এবং সেক্ষেত্রে করণীয়টা কী– এই সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু সরকারকেই নিতে হবে এবং সেটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

কাজেই আমাদের এই ভেজাল সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই; এটাকে আমাদের রাজনীতি এবং শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে; আমার ধারণা এভাবে দেখা সম্ভব হলেই সমস্যার মূলে আমরা পৌঁছতে পারব এবং সমস্যা সমাধানের পথ এতে তরান্বিত হবে।

[লেখক: পুরকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়র)। প্রবন্ধ/ নিবন্ধকার। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়রস লি.। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব।]

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়ার পরিণতি: উত্তরণের উপায়

মো. ক দ র আ হ ম দ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে, বাড়ছে উৎপাদন এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খাদ্যে ভেজাল ও স্বাস্থ্যহানিকর রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণ। খাবার না খেলে জীবন বাঁচে না, সেই খাবার অনিরাপদ হলে রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসা নিতে হয় নতুবা ধুঁকে ধুঁকে মরণ অবধারিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত খাদ্য একক আয়তনে বেশি উৎপাদন করতে গ্রোথ হরমোন, গ্রোথ প্রমোটার এবং রোগবালাই দমনে কীটনাশক ও বিভিন্ন ধরনের ঔষধ বা ড্রাগ ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ব্যবহৃত প্রতিটি কীটনাশক ও ড্রাগের নির্ধারিত (১০/১৫ দিনের ?) উইথড্রল পিরিয়ড আমলে না এনে ঐ শাক-সবজি বা প্রাণী (হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল) বাজারজাত করা হয়। আপাময় ভোক্তা কীটনাশক ও ড্রাগের অবশিষ্টাংশ প্রতিনিয়ত খাবারের সাথে খাচ্ছে। খাচ্ছে ফল পাকানোর জন্য কার্বাইড, দুধ ফেটে যাওয়া ও মাছ পচে যাওয়া রোধে ফরমালিন, মিষ্টিজাত খাবার আকর্ষণীয় করতে ক্ষতিকর রং এবং ফল পচে যাওয়া হতে রক্ষায় ফাঙ্গিসাইড আরও কত কী গুণে শেষ করা যাবে না। আধুনিক বিক্রেতাদের খাবার বা খাদ্যজাত পণ্য বিক্রয় করতে কথা বলতে হয় না কারণ খাবার, ফল-মূল বা শাক-সবজিতে এমন আকর্ষণীয় কৃত্রিম রং, ফ্লেভার, আস্বাদ যোগ করেন যা ক্রেতা বিনা বাক্য ব্যয়ে কিনে নেন। এ যেন একপ্রকার সম্মোহন, স্বরাজিতে বিষ কেনা। এই অনিরাপদ খাবার খেয়ে ভোক্তার স্বাস্থ্যঝুঁকি বা বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। তাতে বাংলাদেশের ক্লিনিকগুলোতে সাধারণ ভোক্তাদের রোগ সনাক্তকরণের সারি হচ্ছে দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর। হাসপাতালগুলোতে আবালবৃদ্ধবনিতার কাতরানিতে প্রতিনিয়ত ভারী হচ্ছে চারপাশের বাতাস। কেউ সিটে, কেউ মেঝেতে আবার কেউ বারান্দায়– এ এক এলাহি কাণ্ড।

একপেশে কিছু লোক আছে যারা কেবল চাষি, বিপণনকারী ও খাদ্য প্রক্রিয়াকারীদের অনিরাপদ খাবারের দোষ দিয়ে আত্মতৃপ্ত হন। বাজারের শুঁটকি ও বেগুনে পোকা নেই; মাছের বাজারে মাছি নেই; ফলবিক্রেতার দোকানে ফাঙ্গাসজনিত পচন নেই। তার মানে পোকা, মাছি ও পচনের উপস্থিতিই প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত? এমনটা হলে আমরা খুশি। উন্নত বিশ্বে পোকা, মাছি ও পচনের উপস্থিতি নেই তারপরও তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত। কারণ সে সব দেশে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা রয়েছে। সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার প্রশ্ন ফুটবল মাঠে প্রতিপক্ষের উপস্থিতি থাকলে কি সহজে গোল দেয়া যায়? উত্তরে অবশ্যই বলবেন, সহজে গোল

দেয়া যায় না। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় ব্রাজিল বনাম প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের কোনো গ্রামের একাদশ তা হলে অবস্থা হবে ভিন্ন।

উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত খাদ্যদ্রব্যের চাষাবাদ, আহরণ, সরবরাহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলা এবং সকল ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বাস্ড়বায়নের জন্য চাষি, আড়তদার, সরবরাহকারী, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান আশু প্রয়োজন। একই সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারীদের নতুন নতুন স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিবারণের কলাকৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ এবং প্রদেয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুযোগসুবিধা প্রদান করা অত্যাবশ্যক। এ দুয়ের সমন্বয় না হলে অনিরাপদ খাদ্যজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো কখনোই সম্ভব হবে না।

নিরাপদ খাদ্য-ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত খাদ্যদ্রব্যের চাষাবাদ, আহরণ, সরবরাহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে মাননিয়ন্ত্রণের কাজে ১৫টি মন্ত্রণালয় জড়িত। তন্মধ্যে ১০টি মন্ত্রণালয় খাদ্য দ্রব্যের নিরাপদ অবস্থা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণে সরাসরি জড়িত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরগুলোর পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণে দায়দায়িত্বের পরিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। চাষাবাদ, আহরণ, সরবরাহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন হতে ভোক্তার খাবার টেবিল পর্যন্ড় দীর্ঘ সরবরাহ-ব্যবস্থায় কার দায়িত্ব কতটুকু তা স্পষ্ট নয়। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী অধিদপ্তরসমূহের কাজের পরিধি বণ্টন এবং সম্পাদিত কাজের সমন্বয় সাধন করতে পারলে খাদ্যের নিরাপদ অবস্থার উন্নয়ন সময়ের ব্যাপার। কথায় আছে– এক হলে পারি, একা হলে হারি।

এই অস্পষ্টতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে উৎপাদনকারী, পাইকার, আড়তদার, সরবরাহকারী, বিপণনকারী, প্রক্রিয়াকারী ও খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যার যার অবস্থানে থেকে পোকার আক্রমণ রোধে কীটনাশক, রোগবালাই দমনে নিষিদ্ধ ঘোষিত এ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ড্রাগ, কম সময়ে বেশি উৎপাদনে বিভিন্ন গ্রোথ প্রমোটার ও হরমোন ব্যবহার, খাবার ও খাদ্যদ্রব্য আকর্ষণীয় করতে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রং ব্যবহার, আস্বাদ ও সুগন্ধি করার জন্য অননুমোদিত ফ্লেভার, পচন রোধের জন্য ফরমালিন ও ফাঙ্গিসাইড, ফল পাকানোর জন্য কার্বাইড ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে। শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে সব ধরনের খাদ্যে স্বাস্থ্যের ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয় কেবল হীন ব্যক্তির স্বার্থে অধিক মুনাফা অর্জনে যা প্রতিদিনের দৈনিক পত্রিকাতে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় এবং বিশেষ খবর আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। ভেজাল ও অনিরাপদ খাবারের ক্ষতিকারক প্রভাব সরকারি-বেসরকারি বা ধনী-গরিবভেদে ভিন্ন হয় না। গরিব ও নিম্ন আয়ের মানুষ সস্তা দামের অনিরাপদ খাবার খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে 'দারিদ্রের দুষ্টচক্রকে করছে আরও দীর্ঘতর'। বিভিন্ন সময়ে বেসরকারি ভোক্তা সংগঠন, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের মতামত ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান হতে খাবারে ভেজাল সংগোপনে মেশানোর যে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠছে, তা রীতিমতো আতঙ্কজনক।

এই ধীর গতির বিষক্রিয়ায় (Slow Poisoning) জনস্বাস্থ্য দিন দিন বিরাট হুমকির দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিকলাঙ্গ, অটিস্ট ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা বর্তমানে যা আছে বিগত ১০-১৫ বৎসর পূর্বে এমনটা ছিল না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা

ক্ষতিকর রসায়নের দূষণে দুষ্ট ফল-মূল, শাক-সবজি ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার ফলে অচিরেই বাংলাদেশে বুদ্ধিমান মানুষের অভাব দেখা দেবে। অনেক কষ্টে উপার্জিত টাকা দিয়ে ভেজাল ও অনিরাপদ খাবার কিনে কেউ নিজের বা আদরের সন্তানদের নির্ঘাত বিপদে ঠেলে দিতে কেহ চায় না। 'টইটম্বুর' মাসিক পত্রিকার অক্টোবর ২০১০ সংখ্যায় মিসেস ফয়জুন্নেসা মনি আশংকা করেন– আগামী ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মরণব্যাধি ক্যান্সার মহামারী আকার ধারণ করবে! প্রতি বছর হাবাগোবা ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হবে !! তাঁর মতে এ ভয়াবহতার অন্যতম কারণ অনিরাপদ ও ভেজাল খাদ্যসামগ্রী।

খাদ্যে অনুজীবঘটিত স্বাস্থ্যঝুঁকি

জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমীক্ষা হতে জানা যায় বাংলাদেশের মোট রোগব্যাধির ৭০% ভাগই পানি ও খাদ্যবাহিত। শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য আমাদের সকলেরই ভালো করে জানতে হবে অনুজীব বা রোগজীবাণু কী ভাবে খাদ্যে বা পানিতে সংক্রমিত হয়। একই সাথে কী কী নিয়মকানুন মেনে চললে আমরা অনায়াসে খাদ্য ও পানিবাহিত রোগজীবাণু জনিত পেট-পীড়ার ঝুঁকি হতে রক্ষা পেতে পারি।

উন্নত ও অনুন্নত দেশের অধিকাংশ জনগণের খাদ্যের বিষক্রিয়াজনিত ডায়রিয়ার দুঃসহনীয় নাটকীয়তার অভিজ্ঞতা আছে। ডায়রিয়াজনিত ঘন ঘন ছোটঘরে গমনাগমনের সাথে প্রায়শই বমিজাতীয় উদ্‌গীরণও হয়ে থাকে। আমরা কোনো খাদ্যে অস্বাভাবিক মাত্রায় অনুজীব বা অনুজীবঘটিত বিষ ভক্ষণ করি, পাকস্থলি সেই খাদ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অগ্রহণযোগ্য করে বমি হিসেবে উদ্‌গীরণ করে। এই উদ্‌গীরণ দ্বারা নিখুঁতভাবে সব অনুজীব পাকস্থলি হতে নিঃসরণ হয়ে উঠে না তাই থেকে যাওয়া অনুজীব দ্বারা ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা আরম্ভ হয়। এই উদ্ভূত অবস্থায় ভোক্তা সহসাই অনুমান করতে পারেন কোথায়, কখন এবং কী খাদ্য বা পানীয় ভক্ষণ করেছেন। এ দিকে রান্না করা খাদ্যদ্রব্য ভোক্তার স্বাস্থ্যনিরাপত্তা ঝুঁকির পিছনে লক্ষণীয় কিছু কারণ রয়েছে। কারণগুলো হল (১) ভোগ্য খাবার যথাযথভাবে সিদ্ধ হয়নি অর্থাৎ রান্না করা পণ্যের তাপমাত্রা রোগজীবানু ধ্বংস করার তাপমাত্রায় পৌঁছায়নি, (২) খাদ্য তৈরির পাচক স্বাস্থ্যবিধি না জানার কারণে অজ্ঞানতাবশত তার হাত, ব্যবহৃত তৈজসপত্র ইত্যাদি হতে পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত খাবারে রোগজীবাণু সংক্রমিত, (৩) খাদ্য তৈরির কাঁচা উপাদান ও তৈরি খাবারের মধ্যে আড় সংক্রমণ, (৪) মাছ-মাংস, ফল-মূল ও শাক-সবজি পৃথক না রাখা জনিত সংক্রমণ এবং (৫) সর্বোপরি তৈরি খাদ্য স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৩/৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণে রোগজীবাণু অদৃশ্যভাবে বেড়ে স্বাস্থ্যহানিকর মাত্রায় উন্নীত হয়।

হোটেল-রেস্তোঁরার খাবার

ডায়রিয়া ও অন্যান্য পেট-পীড়ার স্বাস্থ্যঝুঁকির ঝামেলা সাধারণত ছুটির দিনে একটু বিনোদনের জন্য কোথাও বেড়ানো বা দাপ্তরিক কাজে অন্যত্র বাধ্য হয়ে হোটেল বা রেস্তোরাতে মধ্যাহ্নভোজ বা রাত্রির আহার গ্রহণের পর অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে হরহামেশা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের আপাময় ভোক্তাসাধারণ পেট-পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ভঙ্গুর

স্বাস্থ্য, কর্মে অনুপস্থিতি, কর্মক্ষমতা লোপ, উৎপাদনশীলতা হ্রাস এ যেন এক জাতীয় সমস্যা যা দারিদ্রের দুষ্টচক্রকে আরও দৃঢ়তর করেছে।

খাদ্যে 'বিষক্রিয়া' একটি অশুদ্ধ নামকরণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুজীবের এক বিরাট গোষ্ঠী যথা– ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, প্রটোজোয়া খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটায়। এই বিষ ক্রিয়া ঘটানোর মূলত দু'টি পর্যায় রয়েছে। এদের প্রথম পর্যায় হল রোগজীবাণু সংক্রমিত খাদ্য ভোক্তার খাদ্যনালীতে তাদের সংখ্যা স্বাস্থ্যহানিকর মাত্রায় পৌঁছে পেটের পীড়া ও অন্যান্য বিপত্তি ঘটায়। দ্বিতীয় পর্যায় হল সংক্রমিত খাদ্য স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৩/৪ ঘণ্টার বেশি সময় সংরক্ষণে রোগজীবাণু অদৃশ্যভাবে স্বাস্থ্যহানিকর মাত্রায় উন্নীত হয়ে একপ্রকার জারক রস (বিষ) খাদ্যে অবমুক্ত করে। এই বিষযুক্ত খাবার খেলে ভোক্তা তাৎক্ষণিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই দুই অবস্থাকে যথাক্রমে ইনফেকশন ও ইনটক্সিকেশন বলে।

আমাদের দেশে হাতে গোনা কিছু হোটেল ও রেস্তোঁরা ছাড়া অধিকাংশ হোটেল ও রেস্তোঁরাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবহেলিত। এ ছাড়া খাদ্য তৈরির কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় তাদের অপরিষ্কার হাত ও ব্যবহৃত তৈজসপত্র হতে রোগজীবাণু খাবারে অদৃশ্যভাবে সংক্রমিত হয়ে প্রতিনিয়ত বিপুল ভোক্তা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পতিত হচ্ছে। হোটেল ও রেস্তোঁরা মালিক বাড়তি জ্বালানি খরচ সাশ্রয় এবং স্বাস্থ্যবিধি না-জানা লোকবল দিয়ে দুপুরের খাবার সকাল ১০/১১ ঘটিকা হতে অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করেন এবং এই খাবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে ৩-৫ ঘণ্টাব্যাপী পরিবেশন অব্যাহত রাখেন। খাদ্য তৈরির ২ ঘণ্টার মধ্যে পরিবেশিত খাবারে স্বাস্থ্যহানির ঝুঁকি অত্যন্ত কম কিন্তু ২ ঘণ্টার বেশি যত সময় অতিবাহিত হবে স্বাস্থ্যহানির ঝুঁকি তত বাড়ে। এ ক্ষেত্রে ভোক্তার দায় দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়। হোটেল ও রেস্তোঁরাতে ভোক্তাদের খাবার চাওয়া উচিত দুপুর বা রাত্রের খাবার সময়ের ১/২ ঘণ্টার মধ্যে। বিকাল ৫টা পর্যন্ত দুপুরের এবং রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত রাত্রের খাবার চাওয়ার অর্থ হচ্ছে সারা দিন বা রাত্রের সংক্রমিত ও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অনুজীব পেটে পুরে পেট-পীড়া জাতীয় রোগবালাই সানন্দে গ্রহণ করা। যে সব জীবাণু খাদ্যে সংক্রমিত হয়ে পেট-পীড়া জাতীয় বিভিন্ন রোগ হয় তাদের মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ডায়রিয়া উল্লেখযোগ্য।

ভেজাল ও অনিরাপদ খাবারের ওপর পরিচালিত জরিপের তথ্যাদি

বাংলাদেশে ফল-মূল, শাক-সবজি, দুধ ও তরল পানীয়, বেকারি খাবার, ফাস্টফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার, রেস্টুরেন্ট খাবার ইত্যাদিতে কী কী ভেজাল বা স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে তার তথ্যগত উপাত্তের বেশ ঘাটতি রয়েছে। ভেজাল ও অননুমোদিত সকল স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্য পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশে তেমন পরীক্ষাগার নেই। হাতে গোনা যে ক'টি আছে সেগুলোর আর্থিক দৈন্যতা ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার জন্য খাদ্যের অনিরাপদ অবস্থার আসল চেহারা প্রায় অজানা রয়ে গেছে।

খাদ্যবাহিত রোগের মধ্যে পেট-পীড়া অন্যতম কিন্তু বর্তমানে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, লিভার সিরোসিস, হৃদরোগ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, কিডনি রোগ, হাঁপানি, বিভিন্ন ধরনের এলার্জি, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মসহ ইত্যাকার মরণব্যাধি কী ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে তা সহজে অনুমান করা যায় হাসপাতাল বা ক্লিনিকে অপেক্ষমান রোগীর দীর্ঘ সারির দিকে তাকালে ।

বিভিন্ন জরিপে উঠে আসা ভেজাল খাবারের উপাত্ত

জরিপ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান	জরিপ সাল	খাদ্যের নাম	মোট নমুনা সংখ্যা	শতকরা অনিরাপদ
আইপিএইচ	২০০৩	মিষ্টি	৪০০	৯৭
		আইসক্রিম	২০০	৫৯
		বিস্কুট	২৫০	৫৪
		পাউরুটি	৫০	২৪
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (জীবাণু দুষ্ট)	১৯৯৪	রাস্তার খাবার	-	১০০
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (জীবাণু দুষ্ট)	২০০৬	রাস্তার খাবার	-	৭৮
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (জীবাণু দুষ্ট)	২০০৭	রাস্তার খাবার		৫৯

বাংলাদেশে লাভজনক ব্যবসা কোনটি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে এক বাক্যে যে কেউ অবলীলায় বলবেন– ক্লিনিক, হাসপাতাল, ফার্মেসি এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসার কথা । এ ব্যবসার উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ পরোক্ষভাবে খাবার ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল এবং বিষক্রিয়ার ভয়াবহ পরিণতি হতে উত্তরণের আয়োজন মাত্র । কালবিলম্ব না করে অনিরাপদ ও ভেজাল খাদ্যের গতি রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস করার এখনই সময় । বাজারে অনিয়ন্ত্রিত ভেজাল ও অনিরাপদ খাবারের যে সয়লাব অবস্থা এবং অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ জনস্বাস্থ্য তা কোনো ভাবে কাম্য নয় । আমরা রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য উন্নত মানের ক্লিনিক, হাসপাতাল, ফার্মেসি এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসার কোনো ভাবে বিরোধী নই ।

ভেজাল খাবারের জন্য কে দায়ী ?

ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্য কেবল মুনাফালোভী মানুষ নামের লোকজনই করছে তা একক ভাবে দায়ী করা যাবে না কারণ অধিকাংশ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট চাষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও রোগ বালাই দমনের জন্য কীটনাশক বা ড্রাগ যা হাতের কাছে পাচ্ছেন বা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিনিধি যা ব্যবহার করতে বলছেন তাই ব্যবহার করছেন। জৈব প্রক্রিয়ায় এ বিষ বা ড্রাগের ক্রিয়া নিঃশেষ হওয়ার অনুমোদিত সময় রয়েছে যা ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা অজ্ঞতাবশত প্রতিপালন না করে প্রাণীজ ও উদ্ভিদজাত পণ্য প্রতিনিয়ত বাজারজাত করা হচ্ছে। এই কীটনাশক বা ড্রাগের অবশিষ্টাংশ প্রতিনিয়ত ভোক্তার স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে। এই বেআইনি, সমাজ ও ধর্মবিরোধী গর্হিত কাজ হতে বিরত থাকার জন্য প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের অভাব উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানোর জন্য সুশীল সমাজ ও ভোক্তাদের মধ্যে এখনও বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেনি। ফলশ্রুতিতে সরকারি পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। ভোক্তার শ্লোগান হতে পারে হাসপাতালের সিট বাড়ানোর বাজেট দিয়ে নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য তৈরি, সরবরাহ এবং বিপণন তদারকিতে ব্যবহার করা হউক। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন– ২০০৯ অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। কথায় আছে– রোগাক্রান্ত হয়ে আরোগ্য লাভের চেয়ে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাই উত্তম।

ভেজালযুক্ত খাবার নিয়ন্ত্রণের জনবল ও সুযোগ-সুবিধাদি

খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল রোধে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সমষ্টিগত জনবল প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক যা ইউরোপীয় যে কোনো দেশের খাদ্যদ্রব্যের মাননিশ্চিতকরণ জনবলের তুলনায় বেশি। বিভিন্ন অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারের সমষ্টিগত জনবল, যন্ত্রপাতি ও সুযোগসুবিধা অনুরূপভাবে উন্নত দেশের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। এই সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কেবল সমন্বয়, সহযোগিতা ও স্বচ্ছতার অভাবে আমাদের খাদ্যের ভয়াবহ

অবস্থা এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির এই ক্ষতিকর পরিণতি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের গঠনমূলক বিশদ আলোচনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন অসম্ভব কোনো বিষয় নয়।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় বিষয়াদি

১. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য কেবল সরকারি ব্যবস্থাকে দায়ী করা অমূলক। ভোক্তাদের সংগঠিত হয়ে জনমত তৈরি, নিরাপদ খাদ্যের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিদর্শন, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসি বা লবিং করা। এ ছাড়া

নিম্নের সুযোগ-সুবিধা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উদ্যোগে সম্পাদন করাই সমীচীন।

২. প্রচলিত ও মান্ধাতা আমলের বিশুদ্ধ খাদ্য আইন যুগোপযোগী করা।

৩. খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

৪. আমেরিকার ফুড এন্ড ড্রাগ (FDA)-এর আদলে খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী একক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৫. নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার, পুস্তিকা, পথনাট্য, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকণ জাতীয় জনসংযোগ জোরদার করা।

৬. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় উন্নতি ও নিরাপদ খাদ্য তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭. ভোক্তা, সিভিল সোসাইটি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নেটওয়ার্ক তৈরি করা। নতুন নেটওয়ার্ককে সরকারি এবং দাতা প্রতিষ্ঠান হতে পৃষ্ঠপোষণ করা।

৮. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের তদারকিতে নিয়োজিত সংস্থা বা অধিদপ্তরসমূহের জনবল ও সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন করা।

৯. খাদ্যের নিরাপদ অবস্থা তদারকি সংস্থাসমূহের জনবলের তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

১০. খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি সংস্থাসমূহের কাজের স্বচ্ছতা বিধান এবং এক দপ্তরের তথ্য অন্য দপ্তরের কাছে সহজলভ্য করা।

সর্বোপরি নতুন নতুন খাদ্যঝুঁকি বর্ধক অনুজীব, এ্যান্টিবায়োটিক, অননুমোদিত রাসায়নিক, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, ফুড এডিটিভস, সুইটেনারস, বিভিন্ন রং, সলভেন্টস ইত্যাদি পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার সুবিধা সৃষ্টি করা।

সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেলসমূহে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য অনিরাপদ ও ভেজাল না করার বিষয়ে সোচ্ছার জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

নাট্যকারদের হাসির নাটকের মধ্যে ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্যের পরিণতি বিষয়ক নাটক/নাটিকা তৈরি ইত্যাদি।

শহর এলাকার রেস্টুরেন্টগুলোতে নিরাপদ খাদ্য তৈরি ও পরিবেশন সহ স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বনের ওপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দানের জন্য জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানোর জন্য বেশ কিছু সংস্থার মধ্যে ইউরোপীয় কমিশনের অর্থায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) বিগত ২০০৯ সাল হতে প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে নিরাপদ খাদ্য প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্প ৪টি কমপনেন্টে কাজ করে যাচ্ছে। কমপনেন্টগুলো ...

১.জাতীয় খাদ্যনীতির কৌশল, আইন এবং পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয় সুসমন্বয়করণ।

২.ভোক্তা ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩.বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

৪.খাদ্যের নিরাপদ অবস্থা যাচাইকরণের জন্য আন্ড়র্জাতিক মানের পরীক্ষাগার স্থাপন ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধাদির উন্নয়ন।

এই প্রকল্পের চিহ্নিত কার্যক্রমসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার যথাযথ সহযোগিতা অব্যাহত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণনসহ ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানোর জন্য সহায়ক হবে। সুগঠিত ফ্রান্সের জন্য নেপোলিয়নের ঐতিহাসিক উক্তি 'একটি ভালো জাতি উপহার দেয়ার জন্য আমার ভালো মা প্রয়োজন'। আমাদের দেশের মতো তার দেশে অনিরাপদ খাবারের ছড়াছড়িতে একনায়ক নেপোলিয়ন হয়তো বলতেন 'স্বাস্থ্যসবল ও বুদ্ধিমান জাতি উপহার দেয়ার জন্য ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজন'।

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্যের সংকট মেটানোর জন্য বিশুদ্ধ খাদ্য আইনের আওতায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য এ্যাডভাইসরি কাউন্সিল (NFSAC) ভেজাল ও নিরাপদ খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা টেকসই এবং যুগোপযোগী করার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ভুক্তভোগী জনগণ অধীর আগ্রহে এই কাউন্সিলের সময়-উপযোগী ও সুসমন্বিত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কর্মকৌশল ভোক্তাবান্ধব নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্যতার দিকে তাকিয়ে আছে। খাদ্যের নিরাপদ অবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য উন্নত বিশ্ব তাদের দেশে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের সনাক্তকরণ ব্যবস্থা (Traceability) বাস্তবায়ন করেছে। এমনকি তাদের দেশে রপ্তানি করে এমন উৎপাদনকারী দেশের পণ্যের বেলায়ও উৎস সনাক্তকরণের ব্যবস্থা প্রতিপালনের বিষয় কঠোরভাবে প্রতিপালনের চাপ দিচ্ছে। ফলে

তাদের ভোক্তাসাধারণের স্বাস্থ্যাবস্থা অত্যন্ত সুগঠিত। মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, রপ্তানিজাত মৎস্য ও চিংড়িতে সনাক্তকরণ ব্যবস্থা (Traceability) বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে বি-সেইফ (b-SAFE) নামক একটি বেসরকারি সংস্থা নিরাপদ শাক-সবজি ও ফল-মূলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সনাক্তকরণ ব্যবস্থা বাস্ত বায়নের জন্য চুক্তিভিত্তিক কৃষিপণ্য চাষাবাদের (Contract Farming) উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সে সব খামারের উৎপাদিত পণ্য অরগানিক (Organic) হিসেবে ঢাকা শহরের উত্তরায় বাজারজাত করছে। এই হিতৈষী সংস্থার কর্মকাণ্ড সরকার পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই উদ্যোগ নিরাপদ খাদ্য **"খামার হতে ভোক্তার টেবিল"** (Farm to Fork) পর্যন্ত নিশ্চিতকরণের একটি মডেল হিসেবে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে। একই সাথে মোবাইল কোর্টের ভেজাল-বিরোধী অভিযান অব্যাহতভাবে পরিচালিত হলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি জনগণের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য এবং উজ্জ্বলতর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

[লেখক: প্রাক্তন মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।]

বিষক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ খাদ্যশস্যের বীজেই

আ দি ত্য চৌ ধু রী

মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার প্রধানটিই হল খাদ্য। এখন প্রশ্ন হল, এই খাদ্য কেন আমাদের প্রয়োজন! প্রোটিন, শর্করা, কার্বোহাইড্রেট, মিনারেল ইত্যাদি উপাদানগুলো মানুষের শরীরের প্রয়োজনমাফিক চাহিদা মেটায়। অর্থাৎ খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানের সম-উপস্থিতি না-থাকলে সেই খাদ্য আমাদের শরীর গঠনের জন্য সঠিকভাবে কার্যকরী হয় না। কাজেই শুধু খাদ্য হলেই হবে না, মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সুষম বণ্টন থাকতে হবে সেই খাদ্যে। মানুষ একসময় এই খাদ্য পুরোটাই প্রকৃতি থেকে আহরণ করত; চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলনের আগে মানুষ জানত না জমিতে ফসল কীভাবে ফলাতে হয়– তখন মানুষ প্রকৃতি থেকে একভাবে

খাদ্য সংগ্রহ করত; আবার কৃষি-পদ্ধতি প্রচলনের পর থেকে মানুষ আরও বেশি মাত্রায় খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করতে থাকল। অর্থাৎ কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে এবং পরে– এই উভয় সময়ই কিন্তু মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করত সরাসরি জমি থেকে।

কিন্তু মানুষ আজকের দুনিয়ায় কিন্তু শুধু প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে থাকছে না; বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্বজুড়েই "খাদ্য" একটি ব্যবসা। আর ব্যবসা মানেই হল যে কোনো মূল্যে মুনাফা! সুতরাং যে-খাদ্য আজ আমরা পাচ্ছি সেটা নির্ভেজাল ও দূষণমুক্ত বা বিষযুক্ত থাকবে– এটা আশা করা যায় না। ব্যবসা করতে গিয়ে বল্গাহীন অতি-মুনাফার লোভে মানুষ কী-না করছে! অন্য সকল পণ্যের মতো খাদ্য-দ্রব্যেও মানুষ ভেজাল দিচ্ছে, নানা রকম ক্যামিক্যাল ব্যবহার করছে। এখন প্রশ্ন হল ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভেজাল ও ক্যামিক্যাল দেয়ার তাগিদ দেখা দেয় কী কারণে? ব্যবসায়ীমহল ব্যবসা করে মুনাফার আশায় কিন্তু কত টাকা বিনিয়োগ করে কত টাকা সে মুনাফা করবে– সেই বাধ্যবাধকতার মধ্যে মানুষ কিন্তু থাকতে চায় না বা থাকে না। আরেকটি দিক হল ব্যবসায় লোকসান যাতে না-হয় সেই ঝুঁকির হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্যও ব্যবসায়ী খাদ্য ও অন্যান্য পচনশীল পণ্যে পচন-রোধক ক্যামিক্যাল মিশিয়ে থাকে। ব্যবসার সফলতার কোনো সীমা-পরিসীমা নির্দিষ্ট করা কোনো দেশের মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সে কারণে বিশেষ করে এই ক্যামিক্যালের ব্যবহার শুধু বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং পৃথিবীর উন্নত দেশ অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকার মতো দেশগুলোতেও ক্যামিক্যালের ব্যবহার থেমে নেই; কারণ এই সকল দেশে "ফুড-ইন্ডাস্ট্রি" নামক ব্যবসার যে বিশাল ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে সেখানে পচনরোধক ও সুস্বাদুকর করার জন্য খাদ্য-দ্রব্যে ক্যামিক্যাল মেশানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা থাকে না। তাদের ব্যস্ততম জীবনে সাধারণ মানুষদের পক্ষে নিজেদের খাদ্য নিজেদের রান্না করে খাওয়া সম্ভব হয় না; কাজেই "রেডি–ফুডের" ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। আর সেই রেডি ফুড তৈরি হয় কারখানা বা ইন্ডাস্ট্রিতে; সেই সব ইন্ডাস্ট্রি ক্যামিক্যাল ব্যবহার না করলে তাদের খাদ্য-দ্রব্য পচনের হাত থেকে রক্ষা করবে কীভাবে? কাজেই ব্যবসায়ী তার ব্যবসার প্রয়োজনে যা করা দরকার তা-ই তারা করে থাকে; অন্যদিকে সাধারণ মানুষের তাতে যে ক্যান্সার, চর্মরোগ, কিডনি ও হার্টের অসুখসহ বিভিন্ন ভয়াবহ রোগ দেখা দিচ্ছে সেটা ব্যবসায়িক জায়গা থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা সম্ভব হয় না; অন্যদিকে চিকিৎসাও বর্তমান বিশ্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসা। পৃথিবীতে ক্যান্সার, চর্মরোগ, কিডনি, বাল্ব বা হার্টের রোগ বেড়ে গেলে ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে সেটাও বাণিজ্যের এই দুনিয়ায় মানবীয় দৃষ্টিতে বিচার করার সুযোগ নেই। কারণ রোগ বেড়ে গেলে চিকিৎসা-ব্যবসায় অধিক মুনাফা আসে, তাতে ব্যক্তি-ব্যবসায়ী যেমন লাভবান হয়, অর্থের গতি বৃদ্ধি পায়, একইভাবে তাতে জাতীয় রাজস্বও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ব্যবসা ও মুনাফার দুনিয়ায় ভেজাল ও বিষক্রিয়া

যুক্তিসঙ্গতভাবেই বেড়ে চলছে; এই ক্রম-বৃদ্ধির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই।

সাধারণ মানুষ বা ভোক্তামহলের কাছে যে তৈরিকৃত প্যাকেটজাত খাবার তুলে দেয়া হচ্ছে, সেটা অনেকগুলো স্তর বা ধাপ পার হয়ে সাধারণ ভোক্তার কাছে আসে। এই প্রতিটি ধাপ কিন্তু একই ব্যক্তি দ্বারা বা একই কারখানায় সংঘটিত হয় না; ধরা যাক জমিতে বীজ থেকে যে-ফসল হয় সেটাকে কারখানায় ভাঙ্গিয়ে আটা বা ময়দা করা হয়; অন্যত্র আবার বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের মাধ্যমে এক ধরনের খাবারের রূপ দেয়া হয়; সেই খাবারকে প্রক্রিয়াজাত করে প্যাকেট করে খুচরা-বিক্রেতাদের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং সেখান থেকে খুচরা-ক্রেতারা তা কিনে খায়। এখন কথা হল এতগুলো ধাপ পার হয়ে আসতে হলে পচনসহ নানা রকম ঝুঁকি থাকে; কাজেই পচন রোধ করার জন্য, দেখতে মনকাড়া হওয়ার জন্য কিংবা খেতে সুস্বাদু হওয়ার জন্য নানা রকম ক্যামিক্যাল খাদ্যে মেশানো হয়। যার ভয়াবহ ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক রয়েছে। তাই সুন্দর এক পৃথিবীর আশা ছেড়ে আমাদের সমূহ ধ্বংসযজ্ঞের জন্যই অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

দুই

খাদ্য নিয়ে যতো কথাই বলা হোক না কেন, এই খাদ্যের মূল বিষয় কিন্তু বীজ; সেই বীজ নিয়ে আরও ভয়াবহ সব ঘটনা ঘটে চলছে বিশ্ব জুড়ে; সেই সংবাদ হয়তো সাধারণ ভোক্তা পর্যন্ত কখনোই পৌঁছায় না। খাদ্য প্রস্তুত করে ভোক্তার হাতে পৌঁছানো যেমন একটি বড় আয়তনের ব্যবসা একইভাবে বীজ নিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হচ্ছে। কাজেই বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার যে-পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে সেটা কিন্তু বীজ থেকেই শুরু হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে আমেরিকার মনসানো (MONSANO) কোম্পানির কথাই ধরা যাক; এই বিশাল কোম্পানিল্যাবে যখন কোনো বীজ উৎপাদন করে তখন ওই বীজের মধ্যে এমন এক টেকনোলজি প্রবেশ করিয়ে দেয়, যে-কারণে ওই বীজ বপন করার পর যে গাছ হয়, গাছে ফুল ও ফল হয়– সেই ফলের বীজ থেকে পুনরায় আর কোনো গাছ হয় না; ফলে বাধ্য হয়ে ওই মনসানো (MONSANO) কোম্পানির কাছ থেকে একই বীজ পুনরায় ক্রেতাকে ক্রয় করতে হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এইভাবে বিষয়টিকে নিয়ে কিন্তু ভাবা হচ্ছে না যে– মানুষ ফসল ফলাবে, ফুল-ফল হবে এবং সেখান থেকে চাষি নিজেই বীজ সংরক্ষণ করবে; বরং এভাবে ভাবা হচ্ছে– যাতে অন্য কেউ আর এ ধরনের বীজ তৈরি করতে না-পারে। এভাবে বীজের মধ্যে জেনেটিক-ইঞ্জিনিয়ারিং ঘটিয়ে বীজের মনোপলি ব্যবসাকে নিশ্চিত করা হচ্ছে। এটি গেল বীজ-ব্যবসার একটি দিক। আরেকটি দিক হল অধিক ফলনের ক্ষেত্রে হাইব্রিড পদ্ধতি; এই পদ্ধতিতে বীজের মধ্যে এমন একটি ব্যাপার ঘটিয়ে দেয়া হয়, দৃশ্যগতভাবে দেখানো হয়ে থাকে, আগে যেখানে দশ একর জমিতে যে-পরিমাণ ফসল ফলত– হাইব্রিড পদ্ধতির কারণে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ

করলে দুই থেকে তিন গুণ ফলন বেশি হবে বলে বলা হয়ে থাকে; দু'এক বছর তুলনামূলক অধিক ফলন হলেও তৃতীয় বছর হয়ত আর অধিক ফলন হয় না, যার কারণ নিহিত ওই বীজে। পুনরায় ওই সিড-কোম্পানির কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে বপন করলে হয়তো আবার অধিক ফলন হতে পারে। প্রশ্ন হল, এই যে ব্যবসার পৃথিবী– সেখানে এই সব করতে গিয়ে টেকনোলজি ও ক্যামিক্যালের হরহামেশাই ব্যবহার ঘটছে, যা থেকে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের বড় ধরনের ক্ষতির কারণ ঘটতে পারে। বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে, খাদ্যে খাদ্যগুণ সমানভাবে না-ও থাকতে পারে ইত্যাদি। এতে করে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময় থেকে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত একজন মানুষের নানা রকম রোগে আক্রান্ত ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনের অভাবে একটি জনগোষ্ঠী বুদ্ধিহীন, পঙ্গু এবং নানা দিক থেকে ক্যান্সারাক্রান্ত হতে পারে।

নেপোলিয়ন বলেছেন, "তোমরা আমাকে একজন সুস্থ মা দাও, আমি তোমাদের একটি সুস্থ জাতি দেব।" সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশ, জাতি এবং আমাদের এই পৃথিবী কোনপথে হেঁটে চলছে! সত্যি আমরা জেনেশুনে করে চলেছি বিষ এবং সেটা বিশ্বময়।

যা-হোক হাজারও হতাশাজনক সংবাদের মধ্যেও বিশ্বের দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে তালমিলিয়ে নয় বরং স্বাদেশিকভাবে আমরা যতটা নিজেদেরকে ভেজাল ও বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখতে পারি, সেটাই হওয়া প্রয়োজন আমাদের জাতীয় প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা।

[লেখকঃ বিষয়ভিত্তিক প্রাবন্ধিক। পেশাঃব্যবসায়।]

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়ার পরিণতি ও প্রতিকার

সো হে ল আ লী আ ফ জা ল

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজালের ইতিহাস অনেক পুরনো। ভেজাল কারবারীদের দমনের জন্য ১৮৬০ সালে বৃটেনে আইন পাশ করা হয় "Food and Drug Adulteration Act 1860. ভারতবর্ষে ১৯৫৪ সালে আইন পাশ করা হয় ভেজালের বিরুদ্ধে, PFA Act 1954. বাংলাদেশেও আইন আছে কিন্তু প্রয়োগ হচ্ছে না যথাযথভাবে। বর্তমানে ভেজাল বিরোধী অভিযানে যা ধরা পড়ছে তাতে ভেজাল-দৌরাত্ম্যের সামান্যই উন্মোচিত হচ্ছে।

প্রথমে আসি খাদ্যে ভেজালের ব্যাপারে। খাদ্যে ভেজাল দেয়া হয় আকর্ষক করার জন্য, বেশিদিন তাজা রাখার জন্য অর্থাৎ ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্যই ভেজাল এর-সূচনা। খাবারকে রঙীন করতে মেশানো হয় কৃত্রিম রং। যেমন, সর্বাধিক ব্যবহৃত রং হচ্ছে 'মেটানিল ইয়েলো'। বাজারে এটি 'কিশোরী রং' নামেও পরিচিত। এর ব্যাপক ব্যবহারের কারণ সহজে পানিতে গুলে যায়, দামেও সস্তা। মিহিদানা, বুন্দিয়া, লাড্ডু, হালুয়া, মুগডাল, হলুদগুঁড়া, বেসন, পান-মসলা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে 'মেটানিল ইয়েলো' ব্যবহার করা হয়, বাজারে সবুজ শাকসবজি আরও বেশি তাজা দেখানোর জন্য পটল, শশা, ঝিঙ্গা, করোলা, মটরশুটি ইত্যাদি চোবানো হয় 'কপার সালফেট' (তুঁতে) বা 'ম্যালাকাইট গ্রিন' দ্রবণে। উক্ত অ-অনুমোদিত রঙের ব্যবহারের ফলে মানদেহে দেখা দিতে পারে এলার্জি, দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারে হতে পারে ক্যান্সার। গর্ভবতী মায়েদের হতে পারে গর্ভপাতের মতো মারাত্মক ঘটনা। ফেব্রুয়ারি ২০১০ ইং প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় ঢাকায় বসবাসকারী ১ কোটি লোকের মাঝে দৈনিক ৫০ মেট্রিক টন সবজি খায় যার ৩০ মেট্রিক টন খাদ্য মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক যুক্ত। যার পরিণতিতে অন্ত্রের ক্যান্সার হবার আশংকা থাকে। মুড়িকে ফোলানো ও ধবধবে সাদা করার জন্য ব্যবহার করা হয় 'ইউরিয়া'। সাম্প্রতিক কালে চালকে আরো সাদা ও চকচকে করার জন্যও 'ইউরিয়া' ও 'মোম' পলিশ করা হচ্ছে। 'ইউরিয়া'-এর দীর্ঘ ব্যবহারে বাড়ছে মৃত্যু ঝুঁকি। বাজারে সবচেয়ে কাটতি 'টমেটো সস' যাতে টমেটো ব্যবহার করা হয় না। মূলত মিষ্টি কুমড়া, আলু, কাঁচা লংকা, তেঁতুল, এসিটিক এসিড এবং লাল রঙ আনার জন্য কঙ্গো রেড ব্যবহার করা হয়। এই রঙের দাম ২ টাকা প্রতি প্যাকেট যা দিয়ে বেশ কয়েক কেজি সস তৈরি করা যায়। পরিণতিতে হচ্ছে 'লিভার সিরোসিস' ও 'কিডনি ফেইলিউর'-এর মতো মারাত্মক রোগ। গুঁড়ো মশলাতে দেয়া হয় নানান ধরনের ভেজাল।

হলুদগুঁড়োতে 'রেড ক্রোমেট' মেশানো হয়, মরিচগুঁড়োতে মেশানো হয় 'ইটের গুঁড়ো', দারুচিনিতে মেশানো হয় অন্য গাছের ছাল, সরষের তেল তৈরির সময় সরষেবিচির সাথে মেশানো হয় 'শেয়ালকাঁটা'র বীজ ও 'কৃত্রিম ঝাঁঝ'। শেয়ালকাঁটার বীজের তেল ০.০১ শতাংশও অত্যন্ত বিষাক্ত। উক্ত ভেজালগুলো সরাসরি যকৃত ও বৃক্কের ক্ষতি করে।

চায়ে মোটামুটি তিন ধরনের ভেজাল মেশানো হয়, ব্যবহৃত শুকনো চা পাতা, চামড়ার গুঁড়ো, ওজন বাড়ানোর জন্য লোহার গুঁড়ো। মাছকে পচনের হাত থেকে বাঁচাতে 'ফরমালিন' ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে মানবদেহে নেমে আসতে পারে ভয়াবহ জটিলতা এমনকি মৃত্যুও বিচিত্র নয়।

মায়ের বুকের দুধের কোনো বিকল্প নেই শিশুজন্মের প্রথম ছয় মাস। এই শ্লোগান যতই আমরা দেই না কেন, আসলে শিশুরাই সর্বাধিক ভেজালের হুমকিতে আছে। শিশুখাদ্যে ভেজালের ছড়াছড়ি। মেয়াদউত্তীর্ণ দুধ, বস্তাবন্দি দুধ, চটকদার 'প্লাস্টিক'-এর প্যাকেটে ছড়িয়ে রয়েছে দেশব্যাপী। দুধ খাওয়ানোও হচ্ছে 'প্লাস্টিক'-এর বোতলে। যে প্লাস্টিক-এ থাকে (Endocrine disrupters) 'অন্তঃস্রাবী বিচ্ছিন্নতাকারী' যা স্বাভাবিক হরমোন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এর ফলে দেখা দেয় জিনগত ক্ষতি, বিশেষ করে (fetus) প্রভ্রূণ ও শিশুর বিকাশে তা বিশেষভাবে বিপর্যয় ডেকে আনে। এ ছাড়াও যৌন বিকাশে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে, জননতন্ত্রের কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে। যার ফলশ্রুতিতে হরমোন-সংশ্লিষ্ট ক্যান্সার উদ্ভব হয়।

বাংলাদেশে প্রতি ১২ জন লোকের মাঝে ১ জন হেপাটাইটিস বি পজেটিভ। হেপাটাইটিস 'বি' এবং 'সি' সংক্রমণের প্রধান কারণ একই সিরিঞ্জ একাধিক লোক ব্যবহার করা। যদিও ধরে নেয়া হয় নেশাগ্রস্তরাই এর প্রধান শিকার কিন্তু একথাও চরম সত্য যে হাসপাতালসমূহে অদক্ষ সেবিকা, চিকিৎসকরা যেমন একই সিরিঞ্জ দিয়ে বিভিন্ন রোগীকে ঔষধ দিচ্ছেন ঠিক তেমনি একবার ব্যবহার করার 'ডিসপোসেবল সিরিঞ্জ' আসলেই সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত না করেই পুনঃ প্যাকেটজাত করে বিক্রয় করা হচ্ছে। আর এর ফলে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, পরিণতিতে লিভার ফেইলিউর হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে।

গত বছরে ঘটে যাওয়া 'প্যারাসিটামল সিরাপ ট্রাজেডি' এখনও স্মৃতিতে দগদগে ক্ষত হয়ে আছে। ফার্মাসিটিক্যাল্‌স কোম্পানিগুলো ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে মানছেন না নীতিমালা। সিপ্রোফ্লক্সাসিন বড়িতে ৫০০ মি. গ্রা. সিপ্রোফ্লক্সাসিন ঔষধ থাকার কথা থাকলেও পরীক্ষায় পাওয়া যাচ্ছে ৩০০-৩৫০ মি. গ্রা. ঔষধ, যে কারণে জীবনরক্ষাকারী এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করেও রোগীকে করা যাচ্ছে না রোগমুক্ত। নামসর্বস্ব ঔষধ তৈরির কারখানায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে দূষিত পানি ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি ঔষধ বাজারজাত হচ্ছে। রোগীরা উক্ত ঔষধ সেবন করে আরো নতুন অসুখ শরীরে প্রবেশ করাচ্ছেন। বাড়ছে মৃত্যুঝুঁকি।

এখনই উপযুক্ত সময় ভেজালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সেই সাথে নিজে এবং জাতিকে সচেতন করার। ভেজালের প্রতিকার ব্যক্তিপর্যায় হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের যা করণীয় তা হল:

১. খাদ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

২. ভেজালরোধে সচেতন সৃষ্টি করা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষে।
৩. ক্রেতার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। এক্ষেত্রে 'CAB' কনজুমারস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।
৪. বি.এস.টি.আই.-এর যথাযথভাবে তাদের কাজ সম্পাদন করা, সারা বছর বাজারে নজরদারি রাখা।
৫. সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি, জেলা প্রশাসন প্রতিস্তরে যার যার কাজ নিয়মিত করা।
৬. সাময়িকভাবে নয় বরং বছর জুড়ে ভেজালবিরোধী অভিযান দক্ষ লোকের (ম্যাজিস্ট্রেট) মাধ্যমে পরিচালনা করা।
৭. সকল ব্যবসায়ীকে নিজ নিজ অবস্থানে সৎ হতে হবে যেমন আমদানিকারক মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য বা পণ্য আমদানি করবেন না। ভেজালযুক্ত খাদ্য আমদানি না করা। মজুদদারদের খাদ্য ও পণ্য মজুদের ব্যাপারে হিসেবি হওয়া। সর্বোপরি বিক্রেতাকে মাথায় রাখতে হবে তিনি নিজেও ক্রেতা কতক ক্ষেত্রে। আর তাই ভেজালদ্রব্য বিক্রয় করব না এই নীতি গ্রহণ করলেই নিজেও ভেজাল ক্রয়ের সম্ভাবনা কমে আসবে।

আসুন সকলেই নিজে এবং পরিবারে গ্রহণ করা খাদ্য ও পণ্য সম্পর্কে সচেতন হই। ভেজাল খাদ্য ও পণ্য সম্পর্কে নিজে সচেতন হই, অন্যকে সচেতন করি। গড়ে তুলি ভেজালমুক্ত পরিশুদ্ধ বাংলাদেশ।

[লেখক: ডা. সোহেল আলী আফজাল, এম. বি. বি. এস./ ডি. কার্ড, রেজিস্ট্রার কার্ডিওলজি, গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ।]

ভেজালে বসবাস

ফে র দৌ সী সু ল তা না

খাবার টেবিলে বসলে এমনিতেই মন ভালো হয়ে যায় সবার। গরম ভাতের ভাপ, সবজির সোঁদা গন্ধ অথবা মাছের ঝোল বা গোশতের সৌরভ সাথে সালাদ, ভর্তা,

ভাজি– এই তো খাবার। ঠিকমতো পরিবেশনে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেই যে কেউ। বাঙালি মাত্রই ভোজন রসিক– কে না-জানে সেটি?

কিন্তু আজকাল খেতে বসলেই অজানা ভয়ে মনটি সিঁটিয়ে থাকে। ছেলের প্লেটে ভাজা মাছটি তুলে দিতে দিতে ভাবি, মাছটিতে ফরমালিন দেয়া ছিল কিনা? কোনো সমস্যা হবে না তো? ডালের চামচটি হাতে নিয়ে ভাবি– এই ডাল সংরক্ষণে এমন কোনো রাসায়নিক কি ছিল যা শরীরের কোনো অঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে! কিংবা এই সবজি উৎপাদনে কি ব্যবহার করা হয়েছে এমন কোনো সার ও কীটনাশক যা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি? যদি ভাত খেতে বসে মাথায় এসব চিন্তা খেলে যায় তাহলে কি রুচি আসে খাবারে? মাঝে মাঝে ভাবি, খাদ্যতালিকা থেকে স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি যেসব আইটেম তা একেবারেই বাদ দিয়ে দেব। কিন্তু বাদ দিতে গিয়ে দেখা যায় তাহলে খাদ্যতালিকায় প্রায় কিছুই থাকে না যা আমাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তিতে সাহায্য করবে।

শুধু কি শস্যজাতীয় খাবারে বা শাকসবজি-জাতীয় খাবারে ভেজাল? ফলমূলেও তো ঢুকে গেছে ভেজাল; নিশ্চিন্ত মনে একটা কলা খাবেন বা হাতে একটা আপেল নিয়ে চিবুবেন, সেটি হবার জো নেই। কলাকে নাকি জোর করে পাকানো হয়, আপেল বা কমলা অথবা আঙ্গুরে রাসায়নিক দিয়ে বেশিদিন তাজা রাখার বন্দোবস্ত! এসব তাজা! খাবার আমাদের তাজা শরীর-স্বাস্থ্যকে যে কী নিদারুণ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তা ভাবলেই গা হিম হয়ে যায়। আমাদের খাদ্যে যে এত ভেজাল, আমরা যে কোনো ফ্রেশ জিনিসই খেতে পারছি না; আমাদের স্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে; এটি আমাদের সকলেরই জানা। তারপরও আমরা কিন্তু নির্বিকার। কেন? আমরা জেগে ঘুমাচ্ছি কেন? নাকি, বুঝতেই পারছি না খাদ্যে ভেজালের প্রেক্ষিতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি?

আমি খুবই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আমরা সবাই জানি– সবই জানি, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করছি না। কারণ? লেজে লেজে জোড়া দিয়ে বর্ধমান যাওয়া আর কি! কম-বেশি আমরা সবাই এই ভেজালের রাজ্যে নিজেদের বর্গা দিয়ে রেখেছি। আমি আপনি আমাদের কেউ না কেউ, কোনো না কোনো আত্মীয়, বন্ধু এই ভেজালের রাজ্যে রাজা। তাই আমরা মুখ খুলি না। এই আত্মঘাতী পরিবেশের কাছে এই জন্যেই আমাদের অসহায় আত্মসমর্পণ।

আমাদের সমাজব্যবস্থার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে ওঠা এই অব্যবস্থার জগদ্দল পাথর সরানোর লোকের যে বড় অভাব। আমরা কতিপয় অসহায় জন বিচ্ছিন্নভাবে ভাবি – কেউ একজন ডাক দিক, সমাজের এই কুপমণ্ডুকতাকে, এই জরাজীর্ণ ঘুনে-ধরা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলুক, তাহলে আমরা স্বস্তি পাই। কিন্তু কই মহানায়ক? কই সেই রূপকথার রাজপুত্তুর? যার জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠবে ঘুমন্ত পুরী?

প্রকৃত অর্থেই আমরা ঘুমিয়ে আছি। আমাদের মাঝে যে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে লাভা উদ্‌গীরণ করেছিল, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকের ভিত, শোষকের তৈরি অন্যায়– অসম সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বাঙালির

অপ্রতিরোধ্য অবস্থান; বিশ্ববাসীর চোখে যে সম্মানের আসন গেথে দিয়েছিল তা এখন সোনালি অতীত। আমরা কি এখন প্রতীক্ষা করছি আরেকটি ভূমিকম্পের? আর একটি ধাক্কার? আর একটি বজ্রকণ্ঠের? যদি সেদিন না আসে? এই অনন্ত অসীম মহাকালের স্রোতে নির্জীব-পরজীবী-ভেজাল খাদ্যভুক বাঙালি কি জাগবে না? নিজের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সোচ্চার হবে না তার কণ্ঠ?

ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম, 'আমাদের দেশে কবে সেই ছেলে হবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?'– আমাদের এখন সেই ছেলে দরকার, যে কথায় নয় , কাজে বিশ্বাসী। আমরা হাপিত্যেশ করে বসে আছি তার জন্য। যার পেছনে থেকে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় কাজ করে যাব আমরা। দেশের কাজ, দশের কাজ আর নিজের কাজ । রাতে শান্তিতে ঘুমোব, দিনে নির্মল হাসি-আনন্দে ভরিয়ে দেব সংসার। সমাজে আর রাষ্ট্রে নিজের নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করব নিজেরই যোগ্যতায়। চরিত্রের এই মনোবলটাই তো হারিয়ে বসেছি আজ। তাই প্রথমেই ফিরে পেতে চাই নিজের মনোবল। ফিরে পেতে চাই চারিত্রিক দৃঢ়তা, সামাজিক মূল্যবোধ।

বর্তমানে পূর্বসূরির সাথে উত্তরসূরির যে লড়াই, মানসিকতার যে পার্থক্য তা অচিরেই ঘুচে যাবে যদি আমরা জানি আমাদের লক্ষ্যটা কী? কে কিভাবে সেখানে পৌঁছাব তা নিজের সক্ষমতা এবং স্বকীয়তা; কিন্তু সাধারণ মূল্যবোধ অতিক্রম করে নয়। বরং নীতি -নৈতিকতার ধাপগুলোকে পেরিয়েই অভীষ্ট লক্ষ্যে যেতে হবে।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিলাম তখন সবে ক্ষয়িষ্ণুতার শুরু। গুরুজনেরা বলতেন উচ্ছন্নে গেছে ছাত্রসমাজ। নিজেদের মাঝে মারামারি, সিট দখল, টেন্ডারবাজি; লেখাপড়ার ফাঁকে দ্রুত ঢুকে পড়ছিল। খাঁটি ছাত্রসমাজ বলতে যা বোঝায় তা দ্রুত অপসারিত হয়ে যাচ্ছিল। আমরা অসহায়ের মতো ছিটকে পড়ছিলাম, লাইনচ্যুত হচ্ছিলাম। সমাজ-শাসক-বুদ্ধিজীবী প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। হাত বাড়িয়ে কাউকে তুলে ধরেননি তারা। সেই ক্ষয়িষ্ণুতার স্রোতস্বিনী আজ মহাসাগরের সগর্জন ঢেউ। সেই মূল্যবোধের পতন আজ অপ্রতিরোধ্য পর্বতমালা। আমাদের পরের প্রজন্ম , তারপরের এবং তারও পরের এইভাবে ক্রমাবনতির যে মিছিল তা মহামিছিলের জনসমুদ্রের রূপ নিয়েছে। আমরা ছড়িয়ে পড়েছি সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে। আমলা-রাজনীতিক, শাসক-শাসিত, ব্যবসায়ী-বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবক রূপে আমরাই প্রতিনিধিত্ব করছি এই সমাজের, এই দেশের। আমাদের চিন্তায়-চেতনায়-মননে ভেজাল, আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে বিষ। আমাদের মস্তিষ্কে বিষধর সাপ ফোঁস ফোঁস করছে, যাকে পারছে ছোবল মারছে।

এই ছোবল থেকে নিষ্পাপ শিশুদের বাঁচাতে হবে। আমরা আবার নতুন করে শুরু করতে চাই। আশায় বসতি। আশা করি পারব। আমরাই পারব। যে দেশের জনগণ ভাষার জন্য জীবন দিয়ে আজ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের আসনে বাংলাভাষার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যে দেশের জনগণ প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় অস্বাভাবিক ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে, অসীম সাহস আর মনোবল নিয়ে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর মোকাবেলায় অকুতোভয় ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা চাইলে সব পারে।

আমরা তাই আবার শুরু করতে চাই। আমাদের নিষ্পাপ শিশুদের বাসযোগ্য নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরই। পরিবার থেকে শুরু করব আমরা। পরিবারের সবার মাঝে নীতি-নৈতিকতার সুবাতাস ছড়িয়ে দেব আমরা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নতি, শিক্ষকদের ভাতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি– কোমলমতি শিশুদের মানবিক বিকাশের পথ তৈরি করে দেবে। শিক্ষকদের যাপিত জীবনে বিত্তের অভাব যেন না ঘটে তা আমাদেরই দেখতে হবে। পাড়ায়-মহল্লায় আবার তৈরি করতে হবে লাইব্রেরি, যুব সংঘ, তরুণ সংঘ। যারা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সুবাতাস বইয়ে দেবে। সৃজনশীল কাজে পুরস্কৃত করবে, বাজে কাজে করবে তিরস্কার।

পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠরা সক্রিয় হবেন, ছোটদের শাসন করার সময় কে কোন পরিবারের, কে কোন সমাজপতির তা দেখবেন না বরং নিজের উত্তরসূরি হিসেবেই শাসন করবেন; অতীতে যে রকম করা হত।

সমাজের প্রতিটি স্তরের আস্তরণ সরিয়ে আবার যখন তৈরি হবে নতুন ইমারতের সোপান তখনি তো বাজবে নবজাগরণের সুর। শুরুটা করতে হবে এইভাবে– 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে'– এই একলা চলার সংখ্যা ক্রমেই বাড়বে। কেননা আমরা এখন পর্যন্ত অন্তত নিজের ভালো চাই। এই একলারা যখন সংখ্যায় মোটামুটি উল্লেখযোগ্য হবে তখন অন্যরা এগিয়ে আসবে। আসবেই। তখন টেন্ডারবাজির জায়গায় পড়াশুনা হবে, রাজনীতি তার নিজস্ব গতিতে চলবে আর ব্যবসায়ীরা সততার সাথে ব্যবসা করবে। এই পর্যায়ে তাদের অসৎ হবার সাহস হবে না। খাদ্যে ভেজালের বিষয়টি তখন কিন্তু এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

যদি তারপরেও বন্ধ না হয়– তবে সাহসী মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে আর এগোতে পারবে না। এই স্বপ্ন তো আমি দেখি, আপনিও দেখেন, আমরা সবাই দেখি। আশা করি স্বপ্নভঙ্গ হবে না। তবে এই মুহূর্তের করণীয় হল, ভেজাল খাদ্যব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সচেতন থাকা। তাদের এই কাজে বিরত রাখতে আহবান জানানো। ভোক্তা অধিকার আইন প্রতিষ্ঠা করা। ভেজাল দ্রব্য বর্জন করা। ভেজাল-প্রদানকারীকে সামাজিকভাবে পরিত্যাগ করা।

সামাজিকভাবে একজন ভেজাল-প্রদানকারীকে চোর-ডাকাতের মতো হেয় করলে, তার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন না করলে, তাকে বিভিন্ন ধর্মীয় এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে না ডাকলে তার পরিবর্তন হতে বাধ্য। শুধু টাকা উপার্জনই মানুষের লক্ষ্য নয়। মানুষ সবসময় অন্যের কাছ থেকে সম্মান ও ভালোবাসা পেতে চায়। এই মানবিক দুর্বলতার দিকটিকেই আঘাত করতে হবে সবার আগে। তাহলেই ৮০ ভাগ সফলতা আসবে। আর বাকি ২০ ভাগ সফলতা আসবে শাসনপদ্ধতির রদবদলে। আমরা আবার মধ্যাহ্নভোজে বা নৈশভোজে খাবারের সুঘ্রাণের সাথে নিজেরাও আনন্দ-চিত্তে ভূরিভোজ করার স্বাদ পাব।

[লেখক: প্রবন্ধ/ নিবন্ধকার, আইনজ্ঞ। ব্যাংকার।]

খাদ্যে ভেজাল

আ শ রা ফু ল আ ল ম

ভেজালের সত্যিকার উৎপত্তি কবে এবং কোথায় তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে এ-কথা সত্যি যে, আদিম সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝে ভেজাল এবং মিথ্যার সুস্পষ্ট আসন ছিল। গ্রিক এবং রোমান ব্যবসায়ীরা ভেজালের রাজ্যে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখালেও বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগেই ভেজাল ব্যবসা একটা পূর্ণ ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে। সম্রাট হিয়েরো স্বর্ণমুকুটে খাদের পরিমাণ আর্কিমিডিস খ্রিস্টের জন্মের দু'শ বছর আগেই অঙ্ক কষে নির্ণয় করেছিলেন। অর্থাৎ এর দ্বারা প্রমাণ হয় ভেজাল তখনও ছিল।

ইংল্যান্ডে এবং ব্যাপকভাবে বলতে গেলে ইউরোপ দ্বাদশ শতাব্দীর সমকালীন সময়ে পাউরুটি, মদ এবং মশলাজাতীয় পদার্থ প্রস্তুতকারকদের মাঝে ভেজাল দেয়ার আধিক্য দেখা দেয়। অবশ্য সে সময়কার সমাজে ভেজাল দেয়ার প্রবণতাকে একটা সাংঘাতিক দোষনীয় কিছু বলে ধরা হত না, কারণ নৈতিকতার মান সে সময়ে এমনিতেই অনেক নিচুতে বিরাজ করছিল এবং মিথ্যা ওজন, মিথ্যা মাপ এবং প্রবঞ্চনার সকল পথই ব্যবসার অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হত। কোনো ক্রেতা বিক্রেতাকে বিশ্বাস

করতেন না এবং সমাজে এমন কোনো স্তর ছিল না যেখানে একজন অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন প্রতিবেশী তার অন্যান্য প্রতিবেশীদের হাতে লুণ্ঠিত হবার ভয়ে ভীত হতেন না। এমনি একটা নৈরাজ্যের ভিতরে থেকেও আমরা দেখছি ইউরোপে ভেজালের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের দৃঢ় প্রত্যয়। ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের প্রোভোস্ট রুটিতে ভেজাল ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেন এবং তখন থেকেই ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ ভেজালের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে একজন সাজাপ্রাপ্ত রুটি প্রস্তুতকারকের শাস্তির নমুনা– তাকে খালি পায়ে, খালি মাথায়, গলায় মোটা তার দিয়ে ঝোলানো একটি রুটি এবং ডান হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে জেলখানা থেকে নটরডাম, কোর্ট, গির্জা এবং উপাসনালয় ঘুরে 'ক্ষতির জন্য মাপ চাই' বলে ক্ষমা ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়েছে। সমসাময়িক আর-একটি ঘটনার তিনজন রুটি প্রস্তুতকারককে অর্ধনগ্ন অবস্থায় প্যারিসের রাজপথে লাঠিপেটা করা হয়। ইংল্যান্ডেও কাছাকাছি এমনি ধরনের আইনই প্রযোজ্য ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে উদাহরণগুলো সবই পাঁচশ' বছর আগের ইউরোপীয় ঘটনা। তখনকার দিনে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল ভোঁতা এবং সামাজিক ন্যায়নীতি ও আইন প্রয়োগের পথ ছিল অত্যন্ত রুক্ষ এবং সাদামাটা, এর ফলে ভেজাল মিশ্রণকারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর সাজা প্রদানের নীতি প্রচলিত হয়।

এটা সহজেই অনুধাবনযোগ্য যে, যেখানে ভেজালের জন্য এত নিগ্রহমূলক আইন প্রচলিত, সেখানে ভেজাল উদ্‌ঘাটন করবার জন্য উযুপক্ত উপায় উদ্ভাবন বাঞ্ছনীয় ছিল। প্রথম দিকে এ এলাকার কাজসমূহ খাদ্যের চাইতে ওষুধের ভেজাল মাপার জন্য ব্যয়িত হয়েছে। নেপলসের জনৈক ডাক্তার কিছু কিছু ওষুধের গুণের সঙ্গে সুগন্ধির একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করেন। এর পরেই অবশ্য বারটোলেটাস দুধের মাঝে ল্যাকটোজের পরিমাণ বের করে তার মাধ্যমে ভেজাল বের করবার সূত্র আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে রবার্ট বয়েল, লিউয়েনহুক, ফ্রেডরিক এ্যাকমে প্রমুখ খাদ্যে ভেজালের উপস্থিতি নির্ণয়ে বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দীর্ঘদিন ধরে ভেজালের বিপত্তি এবং স্বাস্থ্যের ওপর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি ইংল্যান্ডে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে এবং আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে 'সোসাইটি অব পাবলিক এ্যানালিস্ট' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্মলাভ হয়। এই আন্দোলন প্রথমাবস্থায় গুটিকয়েক খাদ্য বিশ্লেষক (Food analyst)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অল্পসল্প অগ্রসর লাভ করে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জনসাধারণের আন্তরিকতায় এ আন্দোলন ব্যাপকতর হয়ে উঠে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ক্যানন স্ট্রিট হোটেলের বৈঠকে প্রথম বারের মতো ভেজালের সংজ্ঞা দেয়া হয়।

অবশ্য সকল সংজ্ঞারই একটা সীমারেখা থাকে। ভেজালের সংজ্ঞারও কিছু সীমা আছে। যেমন গরুর দুধ–সব গরুর দুধ সমমানের নয়। তবে এরও একটা সীমা আছে। অর্থাৎ ভালো দুধের সংজ্ঞানুসারে এতে ৯% ঘনবস্তু (Total solid) এবং ৩% দুগ্ধজাত চর্বি (Butter fat) থাকতে হবে। দুধের মান এর নিচে নেমে গেলে স্বভাবতই সন্দেহ করা যেতে পারে যে দুধে পানি দেয়া হয়েছে অথবা মাখন তুলে নেয়া হয়েছে।

তেমনিভাবে ভালো মাখনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এতে ৮০% দুগ্ধজাত চর্বি থাকতে হবে বা সিরকার বেলায় বলা হয়েছে যে, কমপক্ষে ৩% এ্যাসেটিক থাকতে হবে।

উপমা বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, নিম্ন বা নিকৃষ্টমানের দ্রব্যকে অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের বলে চালানোর ব্যবসায়ী প্রচেষ্টা অনাদিকালের। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছি পুরনো ভোঁতা ফন্দি যেমন চালের মাঝে কাঁকর বা ময়দার মাঝে চুনের পরিবর্তে আরও তীক্ষ্ণ এবং নতুনতর ফন্দিফিকিরের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল দেয়ার প্রবণতা। এর ফলে আমরা দেখেছি পরিচিত এবং প্রকৃতিজাত খাদ্যদ্রব্য অনেক সময় রাসায়নিক সংযোজনার দ্বারা পরিবর্তন সাধন করতে। যেমন মধুর মাঝে চিনির রস মেশানো, গুঁড়ো হলুদ বা মরিচে কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে দেয়া, ময়দায় চালের গুঁড়ো মেশানো বা কোনো কোনো তৈরি খাদ্যের ব্যাপারে এমন কিছু দৈর্ঘ্য-প্রস্থে লম্বিত কথা বলা যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। অনেক সময় এই মিশ্রণের ফলে স্বাস্থ্যের হয়তো খুব একটা ক্ষতি না-ও করতে পারে, কিন্তু সাধারণ নৈতিকতার দিক থেকে এই মিশ্রণ বা অতিকথন অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়ে উঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভেজাল মিশ্রণ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে স্বাস্থ্যের জন্য। যেমন আলকাতরা থেকে পৃথক করা স্যাকারিন অনেক সময় চিনির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। স্যাকারিন যদিও চিনি থেকে প্রায় ৫০০ গুণ মিষ্টি, কিন্তু দৈনিক ৩০০ মিলিগ্রামের বেশি গ্রহণ করলে হজমের গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ডায়বেটিক রোগীর জন্য উপকারী হলেও সাধারণভাবে খাদ্যে স্যাকারিন ব্যবহার উচিত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক মিষ্টান্ন উৎপাদনকারীর পক্ষে স্যাকারিন ব্যবহার না করা কষ্টকর এবং কম লাভজনক বিবেচিত হতে পারে। বাজারে প্রচলিত কিছু কিছু পানীয় বিশেষ করে 'সফটড্রিঙ্ক'সমূহ তৈরির ব্যাপারে অতিকথন বা মিথ্যাবচন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। 'লেমনেড'-এ লেমনের নামগন্ধ নেই বা 'অরেঞ্জ স্কোয়াশ' বা 'ড্রিঙ্ক'-এ সত্যিকার অর্থে কমলালেবু সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই জাতীয় প্রায় সকল পানীয়ই ফলের সুগন্ধিময় তেল এবং সিরাপের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়– অথচ অনেকেই এই ধারণা নিয়ে এ সব পানীয় পান করেন যেন তারা ফলের রস জাতীয় কিছু খাচ্ছেন।

মাঝে মাঝে ভেজালের নিষ্ঠুরতা এমন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু প্রাণহানির কারণ ঘটেছে। গুঁড়োমরিচকে অধিকতর লাল দেখানোর জন্য একবার লাল সিসা (Red Lead) মিশ্রণের ফলে ৩১৪ জন লোক একই সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এর মাঝে বেশ কিছু সংখ্যকের প্রাণহানিও ঘটে।

আজকের দিনে পরিচিত যে সমস্ত ভেজাল দেয়ার পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোর মাঝে অতিকথন, প্রবঞ্চন এবং মিথ্যার আসন অতি সুস্পষ্টভাবে থাকলেও আমরা যাকে বলি স্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর– সে রকম ভেজাল অনেকাংশে কমে এসেছে, বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহে। পশ্চিমি দেশসমূহে আইনের আওতায় থেকে খাদ্যসামগ্রীর স্বভাব এবং রূপরেখা অদলবদলের চেষ্টায় ত্রুটি নেই যেমন আইন চায় দুধে ৩% দুধজাত চর্বি থাকতে হবে; কিন্তু সাধারণত গরুর দুধে মাখনের পরিমাণ ৩.৬; সুতরাং একটি ডেইরি

ফার্ম অনায়াসেই ৩%-এর বেশি মাখনটুকু দুধ থেকে তুলে নিতে পারে এবং একই সঙ্গে দেশের খাদ্য আইনের শাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আমরা জানতে পেরেছি বাংলাদেশে যে দু'একটি ডেইরি ফার্ম টিমটিম করে ব্যবসা করছেন তারাও এই আইনের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছেন।

বিশেষজ্ঞরা যারা দীর্ঘদিন ধরে ভেজালের রীতিনীতি লক্ষ করে এসেছেন তাঁরা সকলেই একমত যে উন্নত দেশসমূহে পুরনো পদ্ধতিতে ভেজাল দেয়ার রীতি কমে এসেছে এবং তার বদলে আইনের আওতায় থেকে অতিকথন বা একটি তৈরি খাদ্যের যে গুণ নেই তাকে তার চাইতে বেশি বলে চালাবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই সব কারণে প্রত্যেক দেশের সরকারের উচিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিল্পে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য বা খাদ্যের উপাদানসমূহের গুণাগুণ নিরূপণ করা, অতিকথন বা বচন থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা।

এই প্রবন্ধে এতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে ভেজাল সম্বন্ধে আলোকপাত করা হচ্ছিল। আমাদের দেশে এই উপদ্রবের সীমা-পরিসীমা কী? স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদান– শ্বেতসার (Carbohydrate), আমিষ (Protein) এবং চর্বি (Fat)-এ ভেজালের রূপরেখার মাঝেই আলোচনা সীমিত রাখব।

কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসারের উৎস হিসেবে এতদিন চালই ছিল আমাদের একমাত্র সহায়, এখন অবশ্য গমও যোগ হয়েছে। চালে ভেজাল দেয়ার পুরনো রীতি কাঁকর বা বালি মেশানো। এই রীতি এখনও অল্পস্বল্প প্রচলিত আছে। তবে এর ফলে স্বাস্থ্যহানি হবার ভয় নেই, যদিও খাবার সময় দাঁতের নিচে কাঁকর পড়া অত্যন্ত বিরক্তিকর অনুভূতি। গমের বেলাতেও একই কথা। বালি-মেশানো আটা স্বাদ বা তৃপ্তির অসুবিধা করতে পারে তবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করতে পারে এমন পদার্থের উপস্থিতি খুব কমই চিহ্নিত হয়েছে। চিনির মধ্যে ইউরিয়া ভেজাল দেয়ার একটা সন্দেহ কেউ কেউ করেছিলেন কিন্তু তা প্রমাণিত জানা যায়নি। এর পরে আসে প্রোটিন বা আমিষে ভেজালের কথা। সৌভাগ্যবশত আমাদের দেশে টিনজাত খাদ্যদ্রব্য অপ্রচলিত বলে এবং রান্না করা প্যাকেট লাঞ্চ প্রায় নেই বলেই হয়তো আমিষ খাদ্যে ভেজালের উপদ্রব থেকে আমরা অনেকটা মুক্ত। কারণ কাঁচা মাছ-মাংস বা ডিমে ভেজাল দেয়া অসম্ভব। তবে মাঝে মাঝে গরুর মাংস বলে মহিসের মাংস বা খাসির মাংসের বদলে সমজাতীয় ছাগী-ভেড়া বা অনেক সময় অসুস্থ পশুর মাংস বাজারে বিক্রি করার অভিযোগ শোনা যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এই ধরনের অভিযোগের অনেক সত্যতা আছে। আরেকটা মিশ্রণের কথা ইদানিং শহরের রেস্তোঁরাগুলোতে শোনা যাচ্ছে, তা হচ্ছে, মাংসের গন্ধ হিসেবে সোডিয়াম গ্লুটামেটের ব্যবহার। অবশ্য সোডিয়াম গ্লুটামেটের ব্যবহার উন্নত দেশ সমূহেও করা হয়ে থাকে, কিন্তু এর জন্য নির্ধারিত সীমা আছে। অত্যধিক সোডিয়াম গ্লুটামেটের ব্যবহারে 'চাইনিজ ফুড সিনড্রম' নামে একটি মাথাব্যথার অসুখ চিহ্নিত হয়ে আছে।

সব শেষে আসে ফ্যাট বা তেল-জাতীয় খাদ্য উপাদানের কথা। এ কথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমাদের দেশে তেল বা ঘিয়ে ভেজাল এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে আছে। ১৯৬০-৬১ সালের দিকে যখন সয়াবিন তেল এদেশের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেনি সে সময় এলাইলআইসোথায়োসায়ানট (ALTC)-এর মাধ্যমে সয়াবিন তেলে সরষের তেলের গন্ধ ঢুকিয়ে তাকে সরষের তেল বলেন। 'সোসাইটি অব পাবলিক এ্যানালিস্ট'-এর মাধ্যমে জনসাধারণের ঐকান্তিকতার বিকাশ ঘটেছে ততদিন পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মতো দেশেও ভেজালের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং এ-কথাটা অনয়াসে বলা চলে যে দু'হাজার বছর আগেও ভেজাল ছিল এবং সম্ভবত দু'হাজার বছর পরেও ভেজাল থাকবে যদি জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই উপদ্রব নিরসনে অগ্রণী হতে ব্যর্থ হন।

[লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

খাদ্যে ভেজাল ও এর ক্ষতিকর প্রভাব

হো মা য় রা আ হ মে দ

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের প্রথমটি হচ্ছে খাদ্য। খাদ্য ও খাদ্য-উপাদান স্বাস্থ্যসম্মত না হলে আমাদের জীবন ও জীবিকার মানের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে। সুষম ও পুষ্টিসম্মত খাদ্য গ্রহণের জন্য খাবার ক্রয়ক্ষমতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রয়োজন মানসম্পন্ন খাবারের সহজ লভ্যতা। তবে এ দু'টো বিষয়ের পাশাপাশি খাদ্যমান সম্পর্কিত স্বাস্থ্য-সচেতনতার ব্যাপারটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যসচেতনতা অনেক ক্ষেত্রে পুষ্টিকর ও দুষণমুক্ত খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করে না। আর এর কারণ হল খাদ্যসামগ্রীর পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফালোভী বিপণন নীতি।

গৃহে উৎপাদিত (Home Grown) খাদ্য ব্যতীত অন্য যেসব খাদ্য আমরা বাজার থেকে কিনে থাকি, তাদের মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি হল খাদ্য শস্য বা দানাদার খাদ্য, যেমন : চাল, গম, ডাল ইত্যাদি। দ্বিতীয় ধরন হল পচনশীল, তথা তাজা ও টাটকা খাদ্য, যেমন : শাক-সবজি, ফল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস ইত্যাদি। তৃতীয় ভাগটি হল তৈরি বা প্রায় তৈরি খাদ্য (Processed or Semi-processed food) যেমন : বিভিন্ন তৈরি নাশতা, মিষ্টি, দই, পিৎজা এবং অন্যান্য খাদ্য। এছাড়া আমরা মসলা, তেল এবং অন্যান্য উপাদান আমাদের খাদ্য তৈরির জন্য ব্যবহার করে থাকি। যা বিশেষত দক্ষিণ এশীয় রান্না ও খাদ্যাভ্যাসের জন্য অপরিহার্য। বর্তমানে এর সবকটি খাদ্য উপাদানের মধ্যেই নানারকম ভেজাল মেশানো হয়ে থাকে।

চাল সাদা ও ঝকঝকে করার জন্য এর মধ্যে মোম মেশানো হয়ে থাকে। ডালে মেশানো হয় পাথর-এর গুঁড়া। শাকসবজি, ফলফলাদি এবং উদ্ভিজ্জ খাবার তাজা দেখানোর জন্য ফরমালিন এবং কার্বাইড মেশানো হয়। আর আমদানিকৃত শাকসব্জি ও ফলে থাকে সংরক্ষণকারী রাসায়নিক (Preservatives)। মাছ-মাংসে ফরমালিন মেশানোর বিষয়টিও এখন সবারই জানা। তৈরি খাবার আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যদিও ফুড-কালার (FOOD COLOUR) ব্যবহার করা হয়, অনেক খাদ্যপ্রস্তুতকারকই এর মাঝে কাপড়ের রং (FABRIC DYE) ব্যবহার করে থাকে। আর গুঁড়োমসলায় ইটের গুঁড়ো, ধুলোবালি এবং অন্যান্য ভেজাল মেশানো হয়। এই সবগুলো ভেজালই আমাদের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে।

খাদ্য-উপাদানের মাঝে আমরা যা গ্রহণ করি তার মধ্যে রাসায়নিক বর্জ্য উপাদান, ধাতব ও প্রাকৃতিক বিষাক্ত পদার্থ এবং কীটনাশক থাকে। শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি ও দূষণমুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা আসলে অসম্ভব, কেননা যে বাতাসে আমরা প্রশ্বাস গ্রহণ করি এবং যে পানি আমরা পান করি তাতেই অনেক রোগজীবাণু মিশে থাকে। আর এ সবই আমাদের খাবারের প্লেটে এসে হাজির হয়। তবে আমরা যা করতে পারি, তা হল এসব দূষণ কমিয়ে সহনীয় মাত্রায় আনবার চেষ্টা করা। কিন্তু এ চেষ্টাটিই ভোক্তা হিসেবে আমরা করতে ব্যর্থ হই। প্রথমত সচেতনতার অভাবে এবং দ্বিতীয়ত উৎপাদনকারী, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের পণ্য আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ভেজাল মেশানোর কারণে, যা কিনা সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে পুরোপুরি জানা কখনোই সম্ভব নয়।

খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফলমূল শাকসব্জিতে কীটনাশকের উপস্থিতি যদি সামান্য পরিমাণে মেশানো হয়, সেখানে ৮৩ শতাংশ কীটনাশকের উপস্থিতি ভালোভাবে ধোয়ার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। অন্যদিকে খুব বেশি মাত্রায় কীটনাশক মেশানো হলে সেই মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ কীটনাশকের ব্যবহার খাদ্যমান যেমন বিনষ্ট করে, তেমনি ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, রক্তনালীর সংকোচন, মেদবৃদ্ধি এবং প্রজননক্ষমতা হ্রাস করে। অনেক সময় দ্রুত ফসল পাকা, ফলের আকার ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি এবং শাকসব্জি বেশি তাজা ও টাটকা দেখানোর উদ্দেশ্যে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে কীটনাশক ও অন্যান্য

দ্রুত বর্ধক রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। ফলে আপাত দৃষ্টিতে টাটকা দেখে স্বাস্থ্যসম্মত ভেবে আমরা যে খাবার কিনি, তাতে আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতিই হয় বেশি।

আবার শাকসব্জি ও ফলমূল অত্যন্ত পচনশীল খাদ্য বলে এদের উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিপণনে যে সময় লাগে তাতে অনেক খাদ্য নষ্ট হয়। ফলে খুচরা বাজারে তা যখন ক্রেতার হাতে পৌঁছায়, তখন তা আর যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও তাজা থাকে না বলে বিক্রেতারা তাতে নানা জৈব ও অজৈব পদার্থ ব্যবহার করেন– যার মাঝে অপরিশোধিত পানি, কাপড়ের রং থেকে শুরু করে কার্বাইড, ফর্মালিন এসব পর্যন্ত থাকে। যাদের কোনোটিই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নয়। অপ-সচেতন ভাবে মেশানো এসব দূষিত রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদার্থের বাইরেও খাদ্যদ্রব্যে বেশ কিছু জৈব দূষণকারী পদার্থ বা অরগানিক কনট্যামিন্যান্টস (ORGANIC CONTAMINANTS) মেশানো হয়ে থাকে। এসবের মধ্যে রয়েছে চুল, মল-মূত্র, কীটপতঙ্গের দেহের অংশবিশেষ, ডিম, লার্ভা ইত্যাদি। যদিও এসব আনুবীক্ষণিক পদার্থ সহজে দূর করা সম্ভব নয়, কিন্তু এরা তুলনামূলকভাবে রাসায়নিক বর্জ্যের চাইতে কম ক্ষতি করে থাকে। তবে এ ক্ষতি দূর করার জন্যে খাবার রান্নার আগে ভালোভাবে ধোওয়া, বেশি তাপে সেদ্ধ করা, রান্না করা খাবার খুব বেশি বাসি না খাওয়া ইত্যাদি সুষম খাদ্য গ্রহণের নিয়মগুলো মেনে চলাটাই যথেষ্ট। এছাড়া খাবারের সাথে মেশানো সংরক্ষণকারী ভক্ষণযোগ্য রাসায়নিক যৌগও (EDIBLE FOOD PRESERVATIVES) বেশি মাত্রায় খেলে স্বাস্থ্যের অপকার হতে পারে। এসব প্রিজারভেটিভের মধ্যে রয়েছে নাইট্রেট ও নাইট্রাইট, সালফাইট, বেনজয়িক এসিড ও সোডিয়াম বেনজয়েট ইত্যাদি। নাইট্রেট ও নাইট্রাইটের বিভিন্ন যৌগ মূলত :মাংস সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো অ্যাজমা, মাথা ঘোরানো, মাথা ব্যথা, বমি এবং অ্যালার্জি ইত্যাদি তৈরি করে। শাকসবজি ও ফলমূল তাজা দেখাবার জন্য ব্যবহৃত সালফার ডাই-অক্সাইডও পেটের পীড়া, বমি, অমনোযোগ, আলসার, রক্তদূষণ থেকে শুরু করে ক্যান্সারের কারণ ঘটাতে পারে। সবচেয়ে আশংকাজনক ব্যাপার হল, আধাসিদ্ধ এবং সুসিদ্ধ দু'অবস্থায়ই এসব যৌগ মসলা, পানি ও শাকসবজির সাথে উত্তাপে বিক্রিয়া করে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উচ্চতর সালফারের যৌগে পরিণত হয়, যা ভিটামিন ও মিনারেলসহ অন্যান্য খাদ্যমান তো নষ্ট করেই, উপরন্তু নানা ধরনের শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় বাধা প্রদান করে। বিভিন্ন ফলের রস, কোমল পানীয় এবং এনার্জি ড্রিংকে চিনি এবং স্যাকারিন ও রাসায়নিক স্বাদ ও বর্ণ উপাদান (ARTIFICIAL CHEMICAL FLAVOUR) ব্যতীত অন্য কিছুই তেমন থাকে না। চটকদার বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে এসবের একটি বিশাল ভোক্তাশ্রেণী গড়ে উঠেছে, যাদের মধ্যে শিশু ও তরুণ প্রজন্মই অধিক। স্কুল কলেজ বা কোচিং সেন্টারের সামনে পাওয়া যাবার কারণে অনেক শিশুর-মা-বাবারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারেন না তাদের এসব গ্রহণ থেকে বিরত করতে।

আর তরুণ প্রজন্মের ক্ষেত্রে তো এ ধরণের তদারকির প্রশ্নই ওঠে না। দাঁত, মাড়ি ও মুখগহ্বরের রোগ ব্যতীত যে মারাত্মক ক্ষতি এসব পানীয়'র কারণে হয়ে থাকে তা হল তরুণ প্রজন্মের, বিশেষত ছেলেদের প্রজননক্ষমতার মারাত্মক হ্রাস ঘটে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে এ সব কারণে তরুণদের অস্থিরতা ও ক্ষুধামন্দা বৃদ্ধি পায়– এদের মধ্যে দেখা দেয় নেশা ও অপরাধপ্রবণতা। স্বাভাবিক মাত্রায় এসব পানীয়ে ব্যবহৃত রাসায়নিকই যদি এ রকম ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, সেখানে আমাদের দেশে যেখানে কোনো আদর্শ মান নির্ধারণ ও তদারকি করা হয় না, সেখানে এগুলো কী পরিমাণ স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে, তা তো সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যে ভেজালের মতো একটি বিষয়– যা আমরা প্রায় নিরুপায় হয়েই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ বলে ধরে নিয়েছি, তার প্রভাব প্রত্যক্ষ হলেও অনেক ক্ষেত্রে ধীর বলে এই বিষক্রিয়ার (SLOW POISONING) মাত্রা কেবল শারীরিক ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; নগরজীবনের যান্ত্রিকতা, ব্যস্ততা এবং সাধারণ ভোক্তাদের বিচ্ছিন্নায়ন হেতু মতামতের বা সিদ্ধান্ত প্রদানের অক্ষমতা (LACK OF VOICE OF AVERAGE CONSUMERS DUE TO ABSENSE OF ANY CONSUMERS' GUILD) এ ক্ষতির মাত্রা দিনে দিনে বাড়িয়ে দিয়ে চলেছে। ব্যবসায়ীরা এসব ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানেন না তা নয়, কিন্তু যে বিষয়টি সম্পর্কে তারা সচেতন নন তা হল তারা যখন ভোক্তা হিসেবে নিজেদের উৎপাদিত বা বিপণনকৃত পণ্য ব্যতীত অন্যদের পণ্য ব্যবহার করেন, তখন তাঁরাও সমানভাবে এ সব ক্ষতির সম্মুখীন হন। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য যদি মুনাফার আধিক্য ও খাদ্যমান নিশ্চিত করার অর্থে সর্বোচ্চ উপযোগিতা প্রাপ্তি (UTILITY MAXIMIZATION) হয়ে থাকে, তবে তাদের আসলে একে অন্যের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়ানো অপরিহার্য নয়। কারণ দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে তাতে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা মানুষ হিসেবে খাদ্য গ্রহণের মৌলিক প্রয়োজনটি পূরণের জন্য চাহিদা ও যোগানের ব্যবস্থায় সততা প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির সূত্রানুযায়ী প্যারেটো অপটিমালিটি (PARETO OPTIMALITY) বা সকলের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য উপযোগিতা নিশ্চিত করে। সার্বিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে সুষ্ঠু সচেতনতা এবং পারস্পরিক আস্থাবোধের তাই কোনো বিকল্প নেই।

[লেখক : গবেষক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি আই ডি এস)।]

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ দণ্ডনীয় অপরাধ

শে খ আ খ তা র উ ল ই স লা ম

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে কয়টি আবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান অপরিহার্য, খাদ্যদ্রব্য তার মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান উপাদান। খাদ্য ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। পশু-পাখি এমনকি মাটি ও জলের নিচে বসবাসকারী প্রাণীকুলও খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, জীবনধারণের জন্য খাদ্য, জীবনের জন্য খাদ্য। সূতরাং খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং জীবন হরণেরও হাতিয়ার। সাম্প্রতিক কালে খাদ্যদ্রব্যে বিশেষ করে কাঁচা মাছ-তরকারি-ফল-মূল সবুজ ও সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের রসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক বিষময় ও ক্ষতিকর। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিকদ্রব্যের মিশ্রণের ফলে মানবদেহে জটিল-সংক্রামক নানাধরনের রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় অপরিহার্য উপাদান আজ মানুষের মরণ যন্ত্রণার উপাদানে পরিণত হয়েছে। মানুষ আজ বেঁচে থাকার জন্য বিষ খেয়ে হজম করার মতো এক দুঃসময়ে পতিত হয়েছে। আর এই দুঃসময়ের স্রষ্টা কিন্তু মানুষ নিজেই। অতিরিক্ত লোভ-লালসা আর মুনাফার লোভে মানুষ নিজেই আজ নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলছে। একে অন্যের খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল আর বিষ মিশিয়ে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের মরণ ডেকে আনছে। অথচ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আল্ আমিন নিয়ামত আর রহমতের অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার রহমত, বরকত আর নিয়ামতরূপে আমাদেরকে দান করেছেন। পবিত্র কোরান শরিফের সূরা ৩৬-এর ৩৩ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন– "নির্জীব জমিন ওদের জন্য একটি নিদর্শন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে জন্মাই শস্য যা ওরা খায়।" পুনশ্চ সূরা ৭৮-এর ১৪-১৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন– "মেঘমালা হতে আমি প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাই; তা দিয়ে আমি উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ।" আর এই যে মহান আল্লাহর সৃষ্ট ফল, মূল, শস্য ও উদ্ভিদ যা খেয়ে মানুষ ও প্রাণীকুল জীবন ধারণ করে থাকে, মানুষ সেটাকেই আজ বিষময় করে তুলছে, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও রাসায়নিকদ্রব্য মিশ্রণ করে।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ আজ তাই আমাদের একটি প্রধান জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছুকাল থেকেই সমাজবিজ্ঞানীরা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আসছেন। সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইন প্রণয়ন করে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ। ১৯৫৯ সালে মানুষের খাবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ওপর প্রথম আইন করে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির ৬৮ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নির্দেশ জারি করেন যে– "কোনো খাদ্যবস্তু ভেজাল বলিয়া গণ্য হইবে যদি– (ক) কোনো বস্তু ইহার সহিত মিশ্রিত করা হয় এবং একত্রে প্যাকেটজাত করা হয় যাহাতে ইহার গুণাবলি বা ক্ষমতা হ্রাস পায় বা কমিয়া যায় বা ক্ষতিকর ভাবে নষ্ট হয়, অথবা (খ) কোনো বস্তু সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে ইহাতে প্রতিস্থাপিত হয়, অথবা (গ) যে কোনো স্বাভাবিক উপাদান সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে কমানো হয় যাহাতে তাহা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়, অথবা (ঘ) উক্ত বস্তু এমন ভাবে মিশ্রিত, রঞ্জনমিশ্রিত, গুঁড়াকৃত, আবরিত করা হয়, যাহাতে উহার ক্ষতিকর বা নিম্নমান গোপন থাকে, অথবা (ঙ) এই অধ্যাদেশ বর্তমানে কার্যকর অন্য আইন দ্বারা তাহা নির্ধারিত মানসম্পন্ন না হয়, অথবা (চ) ইহাতে অন্যের সাথে এমনভাবে এই পরিমাণে মিশানো হয় বা দ্রবীভূত করা হয় যাহাতে ক্রেতা বা ভোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এইরূপ অনুপাতে এটিকে মিশানো হয় বা এর সাথে অন্য বস্তু মিশানো হয় যাহাতে বিশুদ্ধ, স্বাভাবিক, উন্মুক্ত অবস্থায় এবং সুষ্ঠু অবস্থায় এর যে খাদ্যমান বা পুষ্টিগুণ ছিল তাহা হ্রাস করিয়া ফেলে, অথবা (ছ) ইহাতে কোনো বিষাক্ত অথবা ক্ষতিকারক উপাদান উপস্থিত থাকে যাহার ফলে তাহা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়, অথবা (জ) ইহাতে যে প্রকৃতি, বস্তু বা বা মান থাকা উচিত তাহা না থাকিলে অথবা প্রস্তুতকারক বা বিক্রেতা কর্তৃক ইহাকে যাহা বলিয়া দাবি করা হয় তাহা না হইলে।" ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধিতেও এ ধরনের অপরাধের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছিল যা বর্তমানে বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতেও প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২৪ ও ২৫ ধারায় এ ধরনের অপরাধের ধরন ও প্রকৃতির উল্লেখ রয়েছে। দণ্ডবিধির ২৬৮ ধারা থেকে ২৭৮ ধারা পর্যন্ত এ ধরনের অপরাধের শাস্তি ও দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। যা ফৌজদারী কার্যবিধি আওতায় বিচারযোগ্য।

অপরাধের ধরন ও প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে, শাস্তি বিধানের মাত্রা পরিবর্তন ও বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা মানুষের দীর্ঘদিনের একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ প্রণয়ন করে এবং জেল-জরিমানাসহ শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করেও যখন ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি তখন ১৯৮৫ সালে বি.এস.টি.আই অধ্যাদেশ জারি করে তা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পণ্যের মান নির্ণয়ের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন। ভেজাল নিরোধে বিধিবিধান আর কঠিন কঠোর শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি

করেও যখন ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি তখন সর্বশেষ ভোক্তাসাধারণের অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি ছাড়াও দেওয়ানি প্রতিকার-এর বিধানও প্রবর্তিত করা হয়। অর্থাৎ এই আইনের আওতায় কোনো ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে পাঁচগুণ পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করে উপযুক্ত আদালতে দেওয়ানি মামলা ও দায়ের করা যাবে। আইনের আওতা ও পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি ভেজাল বিরোধী অভিযানে নামনো হয় বিশেষ বাহিনীসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, পরিচালনা শুরু করা হয় মোবাইল কোর্ট। প্রণয়ন করা হয় নতুন করে "মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯"। নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও কঠিন কঠোর শাস্তির বিধান সত্ত্বেও থেমে নেই খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ। মানুষের জীবনসংহারী নতুন নতুন রাসায়নিকদ্রব্য আর ভেজালমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যে বাজার আজ সয়লাব।

মানুষের অতিরিক্ত লোভ-লালসা আর মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের এক অন্ধ, উদগ্র-প্রতিযোগিতা থেকেই এ ধরনের অপরাধের জন্ম। মানুষের আদিমতম 'অপরাধ' বা 'পাপ'–'লোভ' থেকেই জন্ম। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আদিমানব আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করে প্রথমে বেহেস্তে রেখেছিলেন। মৃত্যুহীন-অনন্ত যৌবনের অধিকারী আদি মানব-মানবীকে অপরূপ সে স্থানের সকল ফলফলাদি খাওয়ার অনুমতি দিলেও, একটি বৃক্ষের ফল তাদের খেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ধূর্ত শয়তান তাদের প্ররোচনা দেয় যে ঐ বৃক্ষের ফল খেলে তারা বেহেস্তে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে এই কারণে আল্লা ঐ বৃক্ষের ফল খেতে বাধা নিষেধ আরোপ করেছেন। শয়তানের প্ররোচনায় বিবি হাওয়ার কোমল নারীহৃদয়ে বেহেস্তে চিরস্থায়ী হওয়ার লোভ সঞ্চার হয়। তিনি আদমকে প্ররোচিত করেন। আল্লাহর বাধানিষেধ অমান্য করে একদিন উভয়ে ভক্ষণ করেন নিষিদ্ধ সে ফল। সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের লজ্জাস্থান উন্মোচিত হয়ে যায়। এক অসহনীয় দুঃসহ পরিবেশে উভয়ে হতবাক হয়ে পড়েন। আর এভাবেই অতিরিক্ত লোভের কারণেই জন্ম হয় মানুষ কর্তৃক বিধিনিষেধ অমান্য করার আদিমতম অপরাধ বোধ বা পাপ। কেবলমাত্র লোভ থেকেই যার জন্ম। শাস্তিস্বরূপ বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা নিক্ষিপ্ত হন পৃথিবী নামক এক ক্ষুদ্র গ্রহে, মৃত্যুই যার শেষ ঠিকানা। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের এই বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে মানুষের প্রথম যে পাপ বা অপরাধ তা লোভ থেকেই সৃষ্ট। আর সেই থেকেই চিরন্তন এক শাশ্বত বাণী যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালান্তরে আমাদের মাঝে ছড়িয়ে আছে– 'লোভে পাপ–পাপে মৃত্যু'।

আদিপিতা আদম ও হাওয়া লোভের বশবর্তী হয়ে যে পাপের জন্ম দিয়ে গেছেন যুগ যুগ ধরে তারই ধারাবাহিকতা আমরা আজও বহন করে চলেছি। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, অর্থ-বিত্ত আর প্রাচুর্যের অন্ধ মোহ এবং সম্পদের উদগ্র প্রতিযোগিতা যতদিন পৃথিবীতে থাকবে অপরাধও ততদিন পৃথিবীতে থাকবে। আইনের সঠিক আইনসম্মত ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ ব্যতীত খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণের অপরাধ কিছুতেই প্রতিরোধ সম্ভব নয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আর মনমানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ কোনো দিনই সম্ভব হবে না। আইনের সঠিক ও বাস্তব প্রয়োগের পাশাপাশি আমাদের সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহর নিয়ামত আর সৃষ্টির বরকতময় খাদ্যদ্রব্যে যারা ভেজাল দেয় তারা মানুষের শত্রু– অল্লাহর শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে মানবতা প্রতিষ্ঠা করে মানবতাবিরোধী অপরাধ থেকে মানুষকে জাগ্রত করে গড়ে তুলতে হবে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে।

[লেখক: এ্যাডভোকেট, সুপ্রিমকোর্ট। প্রবন্ধকার ও নিবন্ধকার এবং রাজনীতিক।]

খাদ্য ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিকিৎসা আইন

শা হ্ মো হা ম্ম দ কে রা ম ত আ লী/ কা জী জা হা ঙ্গী র হো সে ন

দৈনন্দিন আমরা যে সকল খাবার খাই তা কি নিরাপদ? স্বাস্থ্যসম্মত? না কি ভেজাল মিশ্রিত? আমাদের সকলেরই এ প্রশ্ন। তবে এসব প্রশ্নের উত্তর কোথায়? বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মানুষ পেটের পীড়ায় (Diarrhoeal Diseases) আক্রান্ত হয়, তার মধ্যে প্রায় ৩ মিলিয়ন মারা যায় যাদের বয়স ৫ বৎসরের কম। অথচ খাবার আগে হাত পরিষ্কার করলে এবং ফলমূল-শাকসবজি ধুয়ে খেলে এসব রোগের হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। খাদ্যনিরাপত্তার মূল বৈশিষ্ট্য যদি: 'পর্যাপ্ত খাদ্য চাহিবামাত্র পাওয়া যাবে'– এই হয় তাহলে সেখানে উকি দেবে অনেক প্রশ্ন। যেমন, প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ আছে কিনা? খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত কিনা? খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত আছে কিনা? ভেজাল (এক খাদ্যের সংগে অন্য খাদ্য/পদার্থ মেশানো) মুক্ত খাদ্য কিনা? সুতরাং খাদ্যনিরাপত্তার মূল কথাই হল: চাহিবামাত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাস্থ্যসম্মত (ভেজাল ও জীবাণুমুক্ত) খাবার গ্রহণ করা। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্যউৎপাদনও পূর্বের চেয়ে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই নিরাপদ খাবার আজ জাতির কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিপোক্রেটিস বলেছেন, 'তোমার খাদ্যই

তোমার ঔষধ'। অথচ আজকাল প্রায়ই শোনা যায় অমুক খাদ্য খেয়ে অমুক অসুখে ভুগছি। বর্তমানে বাজারে বিজ্ঞাপননির্ভর চাকচিক্যময় প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং সাধারণ ভোক্তাদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পছন্দ করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। চটকদার বিজ্ঞাপন দারুণভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। জনস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরির রির্পোট মতে, আমাদের দৈনন্দিন খাবারের প্রায় ৫০ ভাগই কোনো না কোনো ভাবে দূষিত (Contaminated)। খাদ্যদূষণের প্রধান কারণ রোগ-জীবাণু আক্রান্ত খাদ্য, ভেজালমিশ্রিত খাদ্য এবং রাসায়নিক দ্রব্যের (সার কীটনাশক) অতি মাত্রায় ব্যবহার। পশ্চিমা ধাঁচের খাদ্যদ্রব্য দেখতে সুন্দর ও মুখরোচক কারণ এ-সকল খাদ্যে অতিমাত্রায় চিনি, চর্বি ও খনিজ লবণ থাকে। আর এসব কারণেই শরীরে দেখা দেয় বিষ-ব্যথা ও অসুস্থতা। পূর্বে মানুষ জৈব উপায়ে তৈরি করা তাজা-টাটকা খাবার খেয়ে খুবই ভালো ছিল। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, মেদবহুলতা, পেটের পীড়ায় নিত্যদিন ভুগতেন না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষকগণ ফসল, শাক-সবজি, ফল-মূল উৎপাদনে যে সমস্ত বালাইনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেন বিশ্বস্বাস্থ্য কিংবা এফএও কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত কিনা তা অধিকাংশ কৃষক এবং কৃষিবিদদের জানা নেই। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায় যে, অধিকাংশ বালাইনাশক রাসায়নিক দ্রব্য বিশ্বস্বাস্থ্য কিংবা এফএও কর্তৃক সুপারিশকৃত নয়। সহজপ্রাপ্যতা, সস্তা এবং ধারণাগত সঠিক জ্ঞানের অভাব এসব বালাইনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম কারণ। বর্তমানে, শিশু-কিশোর এবং ক্ষেত্র বিশেষে গৃহিণীরা ফাস্টফুড এবং কোমল পানীয় খুব পছন্দ করেন। কিন্তু এসকল খাবার দীর্ঘদিন খেলে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। জনস্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা যায়, ঝাল, মুড়ি-চিড়া, পুরি, সিঙ্গারা, চানাচুর ইত্যাদি যারা বারেবারে খায় তাদের প্রায় ৪০ ভাগ প্রায়শ পেটের পীড়ায় (পাতলা পায়খানা, বমি, আমাশয়, বুক-জ্বালা) এবং জন্ডিসে আক্রান্ত হয়; ক্ষুদা-মন্দা ও প্রস্রাবজনিত কষ্টে ভোগেন এবং ডায়াবেটিস-এর ঝুঁকিতে পড়েন। বিজ্ঞান গবেষণাগারের তথ্যমতে, চানাচুর, চিপস, নুডুলস, সাদা-পাউরুটি, কেক, গুড় ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়; মাছে ফরমালিন মেশানো হয়, ভোজ্য তেলে ভেজাল মিশানো হয়। সম্প্রতি বাজারে বাহারি বিজ্ঞাপন সম্বলিত স্যাফেলা ভোজ্য তেল পাওয়া যায়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ তেলের মধ্যে আছে স্যাফেলা ফুলের তেল এবং চালের কুড়ার তেলের মিশ্রণ যা পিওর ফুড এ্যাক্ট -এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উক্ত এ্যাক্ট-এ বলা হয়েছে, 'একটি তেলের সংগে অন্য একটি তেল মেশানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ'। ব্যবসায়ীগণ উক্ত এ্যাক্টের তোয়াক্কা না করে চটকদার বিজ্ঞাপন, কথার ফুলঝুড়ি আর স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ বিজ্ঞাপন প্রচার করে প্রতিনিয়ত সাধারণ ভোক্তাগণকে প্রতারিত করছেন। উল্লেখ্য, ভোজ্যতেলই বাংলাদেশে প্রায় ৬০ ভাগ খাদ্যশক্তির চাহিদা পূরণ করে থাকে। হৃদরোগ, ক্যান্সার ও স্ট্রোক বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে এসব রোগের মূল কারণ ভেজালমিশ্রিত ভোজ্যতেল এবং খাদ্যদ্রব্য। আর দেরি নয়, এখনই সময় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ফুড-

সেফটি অথোরিটি গঠন করার। যেমন আমেরিকায় শক্তিশালী ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন স্থাপন করে জনস্বাস্থ্যে উন্নতির সোপান রচনা করে সুন্দর স্বাস্থ্য উপহার দিয়েছে, তেমনি বাংলাদেশে শক্তিশালী ফুড-সেফটি অথোরিটি গঠন করে দেশের আপামর জনগোষ্ঠিকে ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য-দ্রব্য থেকে নিরাপদ রেখে সুন্দর স্বাস্থ্য গঠনে সহায়তা করা।

[লেখক: শাহ্ মোহাম্মদ কেরামত আলী, অধ্যাপক,পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (অবসরপ্রাপ্ত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, স্বাস্থ্যশিক্ষা বিভাগ, নিপসাম, মহাখালী, ঢাকা।]

খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া এবং আইন প্রয়োগে প্রশাসনের ব্যর্থতা

ম ন জি ল মো র সে দ

মানুষের জীবনধারণের অন্যতম প্রধান উপাদান খাদ্য। এ খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং ভেজাল খাদ্যের প্রসারে মানুষের জীবনধারণ এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। এক সময় বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যচাহিদা বৃদ্ধির কারণে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সে ভাবমূর্তি আজ আর নেই। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন-এর কারণে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের বিভিন্ন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত খাদ্য সরবরাহ এখন কমে যাওয়ায় তার প্রভাব আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর পড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য যেমন– মাছ, মাংস, সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি সকল খাদ্যেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এক ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার, অপর দিকে সরবরাহকালীন কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ভেজাল মিশ্রণের কারণে আমরা খাদ্যের স্বাভাবিক

গুণাগুণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল ৩২ অনুসারে বেঁচে থাকার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য যে সু-স্বাস্থ্য প্রয়োজন তা বিভিন্ন ভেজাল খাদ্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক কথায় পরোক্ষভাবে খাদ্যে ভেজালের কারণে সংবিধান-স্বীকৃত জীবনের স্বাভাবিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। খাদ্যের গুণাগুণ ও বিশুদ্ধতা রক্ষায় প্রচলিত আইন The Pure Food Ordinance 1959-এর ৩ ধারা অনুসারে যে কোনো খাদ্যে যদি বিষাক্ত জাতীয় কোনো উপাদান থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এরকম খাদ্যকে ভেজাল খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একই আইনে খাদ্যের সংজ্ঞায় মাছ, মাংস, সবজি, পানি, তৈল, ঔষধ এবং অন্যান্য উপাদানকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজন। আইনের বিধান অনুসারে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য সরকারের ওপর কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সেখানে National Food Safety Adversary Council The Pure Food Ordinance-এর ২৮ (১) ধারায় নাগরিকদের বিভিন্ন এলাকায় পাবলিক এনালাইস্ট-এর মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার অধিকার দেয়া আছে কিন্তু এ ধরনের পাবলিক এনালাইস্ট নিয়োগের মাধ্যমে জনগণের সে অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। উক্ত আইনের ৪১ (এ) ধারায় খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী অপরাধীদের বিভিন্ন শাস্তি প্রদানের জন্য Food Court স্থাপনের বিধান রয়েছে। কিন্তু সরকার এ ধরনের কোর্ট স্থাপন না করায় অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের অধিক মুনাফা লাভের লক্ষ্যে খাদ্যে ভেজাল অব্যাহত রাখতে সাহস পাচ্ছে। আইনের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা এবং জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি রোধ করার লক্ষ্যে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা চ্যালেঞ্জ করে 'হিউম্যান রাইটস্ এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ' জনস্বার্থে ২০০৯ সালে আইনের বিধান কার্যকরী করার জন্য হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। শুনানি শেষে বিচারপতি এ, বি, এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি মো. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর আদালত প্রত্যেকটি জেলায় ও মহানগরীতে পাবলিক এনালাইস্ট অব ফুড নিয়োগ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং প্রতিটি জেলায় ও মহানগরীতে দুই বৎসরের মধ্যে Food Court স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল ১৮ (১) অনুসারে জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর যদিও খাদ্যে ভেজালের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে কিন্তু সেই স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য প্রশাসন তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না। সংবিধানের আর্টিকেল ২১ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল পাবলিক ডিউটি পালন করা এবং আইন ও সংবিধান মেনে চলা। আইন ও সংবিধানে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবনের অধিকার রক্ষা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সরকারের ওপর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকলেও তা পালনে প্রশাসন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা অনেক সময় ব্যর্থ

হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে খাদ্যে ভেজালের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলছে এবং নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার অধিকার বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

খাদ্য মানুষের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ব্যতীত বেঁচে থাকা কল্পনা করা যায় না এবং অসম্ভব। সে খাদ্যকে নিয়ে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীদের বেআইনি কর্মকাণ্ড আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করছে। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক আম, আপেল, কলা, পেঁপে ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল যেমন, কারবাইড এবং ফরমালিন ব্যবহার করে ফলগুলো পাকানো হয়। এ-জাতীয় কেমিক্যাল ব্যবহারের কারণে আমাদের স্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে শিশুরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ধরনের একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিন দিন অসাধু ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন তৎপরতার কারণে হাজার হাজার মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং সাধারণ গরিব মানুষের অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা ব্যয়বার বহনে অক্ষমতার কারণে তারা জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আইনে বিভিন্ন নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বিভিন্ন ব্যর্থতায় এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের অসৎ উদ্দেশ্যে ফল, সবজি, মাছ ইত্যাদিতে কেমিক্যাল-জাতীয় উপাদান ব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধের প্রয়োজনে এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা চেয়ে জনস্বার্থে 'হিউম্যান রাইস্ এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ' ২০১০ সালে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। উক্ত রিট মামলায় বিচারপতি এ, এইচ, এম শামসুদ্দিন চৌধুরী এবং বিচারপতি মো. দেলোয়ার হোসেন-এর আদালত নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন;–

১) একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করে কেমিক্যাল মিশ্রণ বন্ধে সুপারিশ প্রণয়ন করে আদালতে রিপোর্ট দাখিল ২) এনবিআর-এর চেয়ারম্যানকে দেশের সকল আমদানি পয়েন্টে কেমিক্যাল-মিশ্রিত ফল আমদানি বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ ৩) রাজশাহীর আম বাগানগুলোতে পুলিশ মোতায়েনের মাধ্যমে আমে কেমিক্যাল মিশ্রণ বন্ধে রাজশাহীর ডিআইজিকে ব্যবস্থা গ্রহণ-এর নির্দেশ ৪) বিএসটিআই এবং র‍্যাবের ডিজিকে ফলের আড়তগুলোতে সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর নির্দেশ, যাতে ফল পাকানোর জন্য কেমিক্যাল মিশ্রণ করতে না পারে ৫) এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করার নির্দেশ দেন। ১৯৭৪ সনে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (সি) ধারায় খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান করা হয়েছে যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । এ ধরনের আইনের বিধান থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত খাদ্যে ভেজালের কারণে কোনো অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে তথ্য জানা যায় না– শুধুমাত্র খাদ্যেই নয় ঔষধ ভেজালকারী ও বিক্রয়কারীদের বিরুদ্ধেও এ ধরনের অপরাধের শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ড কিন্তু কোনো প্রয়োগ দেখা যায় না। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে খাদ্যে ভেজালকারীদের ব্যবসার জন্য অন্যতম ভালো স্থান

বাংলাদেশ। কিন্তু এ ধরনের অপরাধীদের প্রতিরোধ করে মানুষের জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে জীবনের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও প্রশাসন ও সরকারের নির্লিপ্ততার কারণে আইনের কোনো সুফল জনসাধারণ পাচ্ছে না। ইদানিংকালে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে, যে সকল ভয়াবহ চিত্র মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে তাতে দেখা যায় অসাধু ব্যবসায়ীরা অর্থের লোভে বিভিন্ন কুখাদ্য খাদ্য হিসেবে বাজারে প্রচলন করে জনগণকে তা গ্রহণের জন্য বাধ্য করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মারাত্মক স্বাস্থ্যের ঝুঁকিতে পড়বে যা হয়তো কোনোভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এখনই খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সংবিধান Pure Food Court Ordinance এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন সকল বিষয় বিবেচনা করে কঠোর শাস্তির পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে।

[লেখক: এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ]

সা ক্ষা ৎ কা র

আমাদের স্বপ্ন ভেজাল ও বিষমুক্ত খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যের বাংলাদেশ

মো. রো ক ন - উ দ - দৌ লা

[মো.রোকন-উদ-দৌলা: ম্যাজিস্ট্রেট (উপসচিব), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। সরকারের দায়িত্ব-প্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশে খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া সংক্রান্ত অপরাধ দমনে তাঁর রয়েছে বিশেষ সুনাম। ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের আওতায় এ-পর্যন্ত অসংখ্য অপরাধীকে আটক ও বিচারের সম্মুখীন করে শাস্তি প্রদানের

ব্যবস্থা করেছেন। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত একটি দেশের জনগণ নানাভাবে বঞ্চিত; এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও একইভাবে অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ। কাজেই নানা জটিল প্রতিকূল পরিস্থিকে মোকাবেলা করেই একজন রোকন-উদ-দৌলাকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। শুধু মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে সাধারণ জনগণের ভোগান্তি লাঘবের তাড়না তাঁকে করে তুলেছে বহু প্রশাসনিক কর্মকর্তার মধ্যে বিশেষ ও অনন্য। প্রচলিত আইনি, রাজনৈতিক অস্থিরতা আর অপ্রতুল ব্যবস্থাপনার ভেতর দিয়েই প্রমাণ করেছেন দেশের মানুষের স্বার্থে কাজ করার সদিচ্ছা থাকলে দস্যুপনাকে পরাহত করা অসম্ভব নয়। কর্মের মাধ্যমে দেশের সচেতন মহলের হৃদয়ে তাঁর স্থানও তিনি করে নিয়েছেন বেশ পাকাপোক্তভাবে।]

হালখাতা

বিএসটিআই আইনের বাইরেও অনেক খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হচ্ছে। খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যের ভেজালবিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা সম্পর্কে বলবেন কি?

রোকন-উদ-দৌলা

২০০৫ সালে আমি ঢাকা আসার পরে ভেজালবিরোধী অভিযান শুরু করলাম। বিএসটিআই-এর আওতায় প্রথম দিকে আমাদের অভিযানগুলো শুরু হয়েছে এবং বিএসটিআই-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর দেখলাম বিএসটিআই আইনের বাইরেও অনেক ধরনের খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল করা হচ্ছে। যেমন বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্যে টেক্সটাইল কালার, লেদার কালার মেশানো হচ্ছে। সোডিয়াম সাইক্লামেট খাওয়ানো হচ্ছে। মাছের মধ্যে ফরমালিন দেয়া হচ্ছে। এগুলো জানার পরে আমি চিন্তা করলাম যে, এই জিনিসগুলোতে বাধা দেয়া উচিত। এই নিয়ে আমার একটা ভয় ছিল যে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। আমি চিন্তা করলাম, আমি যদি এগুলো ধরাধরি করি তাহলে আমাদের দেশে প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্য বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে আমি ভেজাল ধরবো নাকি এড়িয়ে যাব? আমি ম্যাজিস্ট্রেট, না ধরলে কারো কিছু করার নেই। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম আজকে আমি এড়িয়ে গেলাম, কিন্তু এই ভেজালের কারণে আমাদের দেশে ভেজালের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অজ্ঞাতনামা রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এখন যদি আমি এটা এড়িয়ে যাই ভবিষ্যতে তো এর পরিণাম আরো ভয়াবহ হবে। তখনতো একটা বিস্ফোরণ হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ভেজালের বিরুদ্ধে আমি বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেব না। আমার চাকরি থাক আর চলে যাক– আমি আপোসহীনভাবে কাজ করে যাব। তাই দৃঢ় মনে ব্যাপকভাবে ভেজালবিরোধী অভিযান শুরু করলাম। এক্ষেত্রে মিডিয়ার অবদান বেশি। সমস্ত মিডিয়াগুলো এগিয়ে আসল। তৎকালীন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলো এগিয়ে আসল। তারা যথেষ্ট সহযোগিতা করলেন। সাপ্তাহিক,

মাসিক, বিভিন্ন ম্যাগাজিনগুলো যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে তাদের পত্রিকায় ভেজালবিরোধী অভিযানের খবরগুলো প্রকাশ করলেন এবং জনসাধারণের মাঝে একটা ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হল। একদিকে জনগণের সমর্থন এবং আরেকদিকে সরকারেরও যথেষ্ট সহযোগিতা পেলাম। এই কাজটা আমি শুরু করেছিলাম নিজ সিদ্ধান্তে। কিন্তু এর পিছনে সরকার, মিডিয়া, জনগণসহ সবারই আন্তরিক সহযোগিতা আছে।

হালখাতা

প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন করি আমাদের দেশে নারী-চোরাচালানের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার এবং কারেন্ট জালে ইলিশের জাটকা নিধনও হয়েই চলছে । আপনার চাকরি জীবনে এসব ক্ষেত্রে কোনো অভিযান পরিচালনা করেছিলেন কি?

রোকন-উদ-দৌলা

আমি যেখানে চাকরি করেছি সেখানেই দেশের মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছি। আমি যশোরে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম নয় বছর। সেখানে দেখলাম যে, আমাদের দেশের মেয়েদেরকে চোরাচালানের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা হয়। আমি এসব চোরাচালানি কঠোরহস্তে দমন করার চেষ্টা করেছি এবং কোটি কোটি টাকার চোরাচালানির মাল আটক করে সরকারের খাতে জমা দিয়েছি। আমি যখন চাঁদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম সেখানেও আমি লক্ষ করলাম ছোট ছোট ইলিশের জাটকা– যেগুলো কারেন্ট জাল দিয়ে নির্বিঘ্নে ধ্বংস করা হচ্ছে। অথচ এই মাছগুলো আমাদের দেশের সম্পদ। আর এই মাছগুলো আমি বা আপনি ধরব না, আমাদের জেলেরাই ধরবে যখন বড় হবে। আর এটার বিরুদ্ধে আমি মারাত্মক একটি অভিযান পরিচালনা করি এবং হাজার হাজার কারেন্ট জাল আমি ধরে পুড়িয়ে ফেলি। আপনারা লক্ষ করেছেন যে, এ বছরই জাটকা পতিরোধ করা হয়েছে। আমাদের পুলিশ, প্রশাসন অর্থাৎ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাটকা প্রতিরোধে সক্ষম হয়। এটা কিন্তু চাঁদপুরে মূলত আমিই প্রথম কার্যক্রম শুরু করি। সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখি। অন্যরাও করেছে সীমিত আকারে। কিন্তু আমি করেছিলাম ব্যাপক আকারে। আর এ নিয়ে চাঁদপুরের বিভিন্ন স্থানীয় দৈনিকসহ জাতীয় দৈনিকেও ফলাও করে প্রচার করা হয়। যেমন- চাঁদপুর কণ্ঠ, চাঁদপুর দর্পণসহ বিভিন্ন পত্রিকায় ফলাও করে আমার জাটকা অভিযানের বিষয় ছাপা হয়। তাছাড়া যশোরে যে চোরাচালানির বিরুদ্ধে অভিযান ছিল তা যেমন- দৈনিক পূরবী, দৈনিক দেশ হিতৈষী, স্ফুলিঙ্গ, কল্যাণ, দৈনিক লোকসমাজ, দৈনিক রানার প্রভৃতি পত্রিকাতে ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হয়।

হালখাতা

খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট আইন কি যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

রোকন-উদ-দৌলা

মোবাইল কোর্ট আইন-এর অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই আইনের প্রয়োগ করে একটি সমাজকে কখনোই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ নিয়ে একটি সচেতনতার গ্রুপ সৃষ্টি করা দরকার। জনমনের কাছ থেকে একটি প্রতিরোধমূলক সচেতনতা আসা উচিত। তবে আমি একটি কথা বলব জনগণ যদি সরাসরি এ ধরনের ভেজালগুলো প্রতিরোধ করতে যায় তাহলে কিন্তু আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে। কিন্তু এটা সরাসরি না করে আমরা যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আছি আমাদের মাধ্যমে করলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না। সমাজে ভালো সুফল পাওয়া যাবে।

হালখাতা

আপনি কি মনে করেন আপনার কর্মজীবনে এপর্যন্ত নিজেকে দলীয় প্রভাব মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন ?

রোকন-উদ-দৌলা

একশত ভাগ। এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ দিতে পারি। আমি যশোরে নয় বছর চাকরি করেছি। আপনার যদি যশোরে কারো সাথে পরিচয় থাকে তাহলে বলবেন– ম্যাজিস্ট্রেট রোকন-উদ-দৌলা কেমন ছিল– ওখানে শুধু ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেই দায়িত্ব পালন করিনি। আমি সহকারি কমিশনার ভূমি, তিনটি উপজেলার দায়িত্ব পালন করেছি। যশোরে হাউজিং এস্টেট-এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলাম। ঐসব শাখাগুলোতে খুব কম লোকই আছে যারা সততা ধরে রাখতে পারেন। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, কেউ একটি পয়সাও আমাকে ঘুষ দিতে পারেনি। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দুর্নীতির প্রশ্নই আসে না। ম্যাজিস্ট্রেসির বাইরে আমি কথাগুলো বলছি। তারপর নির্বাহী অফিসার ছিলাম খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়িতে। আপনারা জানেন, একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হাতে কোটি কোটি টাকার কাজকর্ম হয়। সে ক্ষেত্রে আমি কোটি কোটি টাকার কাজকর্ম করেছি। কিন্তু কেউ একটি পয়সার পারসেন্টেজ দিয়েছে এই কথা কেউ বলতে পারবে না। আর ঢাকা শহরে যে ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছি– কারো এরকম ধৃষ্টতা দেখাবার ক্ষমতা হয়নি। যদি কেউ এমন ধৃষ্টতা দেখায় সে সোজাসুজি কারাগারে চলে যাবে।

হালখাতা

আপনি ভেজাল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে লড়ছেন, এ যাবৎ উল্লেখ করার মতো কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা যা আপনার কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে ?

রোকন-উদ-দৌলা

হ্যাঁ, আমরা যখন ২০০৫ সালের ৩ এপ্রিল ভেজালবিরোধী অভিযান শুরু করেছিলাম প্রথম দিনেই আমরা বাধাগ্রস্ত হয়েছি। সেদিন মীরহাজিরবাগে দু'টি নকল ইলেকট্রিক ফ্যানের কারখানায় অভিযান চালাই। তখন কয়েকজন পুলিশ নিয়ে একটি নকল কারখানায় ঢুকি। আর কিছু পুলিশকে অন্য একটি নকল কারখানায় পাঠাই। আমি প্রথম অভিযান শেষ করে যখন দ্বিতীয় নকল কারখানায় গেলাম, তখন ঐখানকার পুলিশ বলল, স্যার ঐ যে মোটা লম্বা দেহধারী লোকটাকে দেখছেন সে আমাদেরকে বলে– আমরা তার এলাকায় ঢুকেছি তার পারমিশন নিয়েছি কিনা। তাই বলা যায়, প্রথম দিনেই আমরা বাধাগ্রস্ত হয়েছি। মাত্র অভিযান শুরু করছি। আমিও ভদ্রলোককে বললাম, আপনার সাথে তো এখানে মারামারি করার জন্য আমরা আসি নাই। আপনি যদি বাধা দেন আমরা ফিরে চলে যাব। কিন্তু কোর্টে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা পাঠাব আমি। তখন কিন্তু লোকাল ওসি সাহেব আপনাকে গ্রেফতার করে কোর্টে পাঠিয়ে দেবে। তখন ভদ্রলোক বলল, না না স্যার, আমি তো আপনাকে বাধা দিচ্ছি না। আপনি আপনার কাজ করেন। এ আর এরকম বাধা পেয়েই আমরা কাজ শুরু করি। এরপরেও বলব যে বড় ধরনের বাধাগ্রস্ত হয়েছি, সেটা বলা যাবে না। কিছু কিছু ছোটখাট বাধার সম্মুখীন হয়েছি। যেমন আমাদের কিছু ইনফরমেশন ছিল যে, মৌলভিবাজারে কিছু মেয়াদউত্তীর্ণ গুঁড়ো দুধ আছে। তাই আমরা মেয়াদউত্তীর্ণ গুঁড়ো দুধগুলো ধরতে গেলাম। তারা আমাদেরকে তাদের গোডাউনে ঢুকতে দিল না। তারা বলে স্যার, আমরা ঢুকতে দেব না; আপনারা হঠাৎ করে এসেছেন। তখন আমার সাথে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে বলল– স্যার, তারা যখন আমাদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাদের পিটিয়ে চামড়া তুলে ফেলব। আমি বললাম, পিটাপিটির দরকার নেই। কারণ মৌলভিবাজারের মতো ব্যবসায়ীদের সাথে ঝগড়া হলে আমাদের তো আর মোবাইল কোর্ট হবে না। আর এ জন্য বললাম, আপনাদেরকে আমরা গ্রেফতারও করছি না– কিছুই করছি না। আপনারা আমার কোর্টে হাজির হবেন। পরে তারা যখন হাজির হল তাদেরকে আমরা প্রথম দিন ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছিলাম। এর পর মিটফোর্ডে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। ঢাকা শহরে এরকম ছোটখাটো বিস্কুটের ফ্যাক্টরি বা বেকারিতে এক ধরনের নামবিহীন, লেবেলবিহীন বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল ফ্লেভার খাওয়ানো হচ্ছে। আমি তাদেরকে বললাম, কোনোরকম নামবিহীন লেবেলবিহীন কেমিক্যাল ফ্লেভার খাওয়ানো যাবে না। প্রত্যেকটির সাথে লেবেল থাকতে হবে এবং এই জিনিসগুলো কী কী কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলো উল্লেখ থাকতে হবে। প্রস্তুতের তারিখ থাকতে হবে, উৎপাদনের তারিখ থাকতে হবে এবং উৎপাদনকারীর ঠিকানা থাকতে হবে। এসব তথ্য ছাড়া তোমরা

এগুলো বিক্রি করতে পার না। বললাম, তোমরা এগুলো কোথা থেকে আন? তারা সবাই বলল, স্যার, এগুলো আমরা মিটফোর্ড থেকে আনি। তাই চিন্তা করলাম ঢাকা শহরে শুধু হোটেল, বেকারি বা বিস্কুটের কারখানায় অভিযান করে লাভ হবে না। আমাকে মিটফোর্ডে অভিযান চালাতে হবে। কিন্তু মিটফোর্ডে আমি অভিযান করব কিভাবে ? মিটফোর্ডে গেলে ওরা বলবে, স্যার, আমরা তো এগুলো মানুষকে খাওয়ানোর জন্য বিক্রি করি না। কেমিক্যাল-জাতীয় জিনিস ব্যবহারের জন্য বিক্রি করি। তখন একটি পত্রিকা পড়তে পড়তে একটি গাইডলাইন পেলাম। যেমন একজন পাঠক লিখেছেন, মিটফোর্ডে ব্যবসায়ীরা কেমিক্যাল বিক্রি করছে– কোন কেমিক্যাল কী পরিমাণ আমদানি করছে, কোথায় কার কাছে বিক্রি করছে– সেই সূত্রে যদি তাদের রেজিস্টার চেক করা হয় তাহলে কিন্তু জিনিসটা ধরা পড়ে যাবে। তখন আমি মিটফোর্ডে গেলাম। আমার সাথে পুলিশ, বিডিআর, বিএসটিআই-এর কেমিস্ট ছিল, ঢাকা সিটি করপোরেশনের ইন্সপেক্টর ছিল। তারপর ওখানে গিয়ে নামবিহীন, মেয়াদবিহীন কেমিক্যালগুলো পেলাম এবং ধরে বললাম, আপনারা তো নামবিহীন, মেয়াদবিহীন কেমিক্যাল মানুষকে খাওয়াতে পারেন না। তখন আমি মিটফোর্ডের পাঁচ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করলাম। গ্রেফতার করার পর ঐ সময় তাদের নির্বাচন ছিল। তারা নির্বাচনের স্বার্থেই হোক অথবা যে কোনো কারণেই হোক হাজার হাজার মিটফোর্ডের ব্যবসায়ী আমাদেরকে প্রায় এক রকম অবরুদ্ধ করে ফেলল। তখন তারা আমাকে বলল, না স্যার, আপনি আমাদেরকে আসামি করে কোর্টে নিতে পারবেন না। তখন আমি চিন্তা করলাম এখন যদি আমরা মিটফোর্ডের মতো জায়গায় ব্যবসায়ীদের সাথে মারামারি করি তাহলে আমাদের মোবাইল কোর্ট এখানেই বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। তখন আমি বাধ্য হয়ে ৫ জন আসামিকে ছেড়ে দিলাম। আর বললাম, আপনারা পাঁচটার মধ্যে আমার কোর্টে হাজির হবেন। তারা পাঁচজন আমার কোর্টে হাজির হয়েছিল এবং আমি তাদেরকে জরিমানা করে দিয়েছিলাম। তাহলে আপনি কি বলবেন ভেজালবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য মোবাইল কোর্টকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা যথেষ্ট? ১০ হাজার ২০ হাজার টাকা দিয়েই পার পেয়ে আবার তারা ভেজাল মেশানো বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ আবার অপকর্ম করছে।

হালখাতা

ভেজাল খাদ্য বা ওষুধ উৎপাদন ও বিপণন প্রতিরোধ বা এ সংশ্লিষ্ট দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য প্রচলিত আইনি কাঠামো সম্পর্কে বলবেন কি ?

রোকন-উদ-দৌলা

এ বিষয়ে আমাদের পর্যাপ্ত আইন-কানুন আছে। এ সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরনো আইন হচ্ছে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি। দণ্ডবিধির ২৭২ ও ২৭৩ ধারায় এ ধরনের অপরাধের জন্য ছয় মাস কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে।

ভেজালের ভয়াবহতা বা ব্যাপ্তি বিবেচনায় নিলে তখনকার প্রেক্ষাপটে এটা শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট ছিল। এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় আইনটি হচ্ছে ১৯৫৯ সালের বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ। এই আইনেও শাস্তি ছিল তুলনামূলক খুবই কম। বর্তমানে ভেজালের যে ভয়াবহতা সে তুলনায় এই আইনটিও পর্যাপ্ত নয়। পরে ২০০৫ সালে আইনটিতে ব্যাপক সংশোধন করা হয়। বর্তমানে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন বা বিক্রি করার জন্য প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা এক বছরের কারাদণ্ড এবং দ্বিতীয়বার অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা জরিমানা বা দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডর বিধান করা হয়েছে। সংশোধিত আইনে ফরমালিন, ডিডিটি কেমিক্যাল, কার্বাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি উপাদান খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালের বিএসটিআই অর্ডিন্যান্সের আওতায়ও পড়ে ৪৫ রকমের খাদ্যদ্রব্য। ২০০৩ সালে এই আইনটিও সংশোধন করে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ২০০৫ সালে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য আইনে সংশোধনী আনার আগে পর্যন্ত আমরা সবচেয়ে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারতাম বিএসটিআই সংশোধিত অর্ডিন্যান্সটি। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনেও ভেজাল খাদ্য সংক্রান্ত কিছু ধারা আছে। যেগুলো কেবল ভয়াবহ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় কারো সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

হালখাতা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের জন্য এখন জোর দাবি উঠেছে। আপনি কি মনে করেন এই আইন প্রণীত হলে তা খাদ্যে ভেজালের ভয়াবহতা প্রতিরোধে সহায়ক হবে ?

রোকন-উদ-দৌলা

নিশ্চয়ই। কিন্তু এই আইনের সুফল যেন খুব সহজলভ্য হয় সেদিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। আমি যতদূর জানি এই আইনের অধীনে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে যার প্রধান হবেন একজন জেলা জজ বা দায়রা জজ। আমি মনে করি, এ ধরনের আইনের সুফল বা প্রতিকার যদি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে হয়, তাহলে জেলা জজের মতো উঁচু পর্যায়ে না গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব দিতে হবে। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে সহজে পৌছতে পারবে। দ্বিতীয়ত, নিরপরাধ উৎপাদনকারীরা যেন এ আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হন তা-ও খেয়াল রাখতে হবে।

হালখাতা

আরও কী কী ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিচার করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

রোকন-উদ-দৌলা

খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধের পাশাপাশি বাজারে টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক তার, সিমেন্ট ও রডেও রকমারি ভেজাল দেওয়া হচ্ছে। একটা বাড়িতে অনুসন্ধান করে দেখেছি, সেখানে বরিক পাউডারের সঙ্গে চক মেশানো হচ্ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের ভেজালকারীদের শাস্তির জন্যও ভ্রাম্যমাণ আদালত দরকার।

হালখাতা

পরিবেশ দূষণ রোধে ?

রোকন-উদ-দৌলা

হ্যাঁ। পরিবেশ দূষণের মাত্রা আমাদের দেশে খুব ভয়াবহ। পরিবেশ অধিদপ্তর আমাকে দিয়ে বেশ কিছুদিন অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি এটা পর্যাপ্ত নয়।

হালখাতা

ভেজাল খাদ্যের এ সকল সমস্যা এত ব্যাপক আকার ধারণই-বা করল কী করে ? আপানার কি মনে হয় না যে, বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষেরও এখানে অবহেলা রয়েছে ?

রোকন-উদ-দৌলা

অবশ্য এর সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত। কোনো একজন ঘি প্রস্তুতকারী যদি কোনো খাঁটি ঘি প্রদর্শন করে লাইসেন্স পাওয়ার পর ভেজাল দিতে শুরু করে তাহলে বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের কিছুই করার থাকে না। তবে আমি মনে করি, বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের উচিত নিয়মিত এসব জিনিস পরিদর্শন করা। তবে বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ বা সিটি করপোরেশন, খাদ্য অধিদপ্তর বা ওষুধ প্রশাসনের প্রত্যেকেরই উচিত ওই বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

হালখাতা

ভেজালবিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়নে আপনি নিজেকে কতটুকু সফল মনে করেন এবং এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো স্মরণীয় বা দুঃখজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন কি?

রোকন-উদ-দৌলা

আমি এই বিষয়টাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই। যেমন বাংলাদেশে এখন ভেজালের যে ভয়াবহতা এটার সাথে যদি তুলনা করি, তাহলে বলব, সাগরের মধ্যে আমরা কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি মাত্র; এটা হল প্রথম দিক। আর এটার উল্টো দিক হল আমরা সবটুকু আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন

করেছি। একটি কথা আবারও না-বলে পারছি না যে, দশ বছর মোবাইল কোর্ট করলে কিছুই হত না; মাত্র মিডিয়ার কারণে আজকে ২ বছরে আমরা অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। আমি আপনাকে উদাহরণ দিতে পারি। আগে যেসব প্যাকেটজাত, কৌটাজাত খাদ্যদ্রব্য, টিনজাত খাদ্যদ্রব্য মার্কেটিং করা হত, বিদেশে যেগুলো রপ্তানি করে সেগুলোতে মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ দেওয়া হত। কিন্তু আমাদের দেশে সেগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ দেওয়া হত না। কিন্তু এখানে ইনশাল্লাহ আমরা শতকরা একশত ভাগ সফল হয়েছি। তারপর প্রতিটি রঙিন বিস্কুট বলেন, আইসক্রিম বলেন, কেক বলেন, চকলেট বলেন, লজেন্স বলেন, সবগুলোতে টেক্সটাইল কালার, বা কাপড়ের রং দেওয়া হত। লেদার কালার পর্যন্ত দেওয়া হত। আমরা একশ' ভাগ বন্ধ করছি বলব না তবে অনেকাংশ কমে গেছে। প্রতিটি মিষ্টির কারখানায় সোডিয়াম সাইক্লামেট ব্যবহার করা হত। সেটা একশ' ভাগ বন্ধ হয়েছে বলব না, অনেক মিষ্টির কারখানা সোডিয়াম সাইক্লামেট-এর পরিবর্তে চিনি ব্যবহার করা হচ্ছে। হোটেলগুলোর বিভিন্ন খাদ্য উপাদানে রং ব্যবহার করা হত। মুরগির মাংসের মধ্যে রং দিয়ে লাল করে রাখত। মরিচের মেধ্য রং দেয়া হত–এগুলো বন্ধ হয়েছে। আমরা যেগুলোতে অভিযান করেছি সেগুলো বর্তমানে অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছে। আর যেগুলোতে যায়নি সেগুলোতে অনেক অভাব রয়েছে এটা আমি বুঝতে পারি। কাজেই আমি বলব একদিকে যদিও ভেজালের অনেক ভয়াবহতা রয়েছে; অন্যদিকে মিডিয়ার বদৌলতে এ ক্ষেত্রে অনেক সাফল্যও অর্জিত হয়েছে।

হালখাতা

বাংলাদেশের বাস্তবতায় ইতোমধ্যে একজন সফল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আপনার যোগ্যতাকে ব্যাপকভাবে প্রমাণ করেছেন। সরকারি তরফ থেকে এর কোনো মূল্যায়ন আপনি পেয়েছেন কি ?

রোকন-উদ-দৌলা

হ্যাঁ, সরকারিভাবে আমি অনেক মূল্যায়ন পেয়েছি। সরকারিভাবে আমি তুরস্কে সফর করার সুযোগ পেয়েছিলাম ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারাতে ও ভ্রমণ করেছি। আঙ্কারা বণিক সমিতির মধ্যাহ্ন ভোজের এবং ইস্তাম্বুলের গভর্নরের নৈশভোজে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। এছাড়া সরকারি সহযোগিতার কারণেই ফল বা মাছের ফরমালিন পরীক্ষা করা অনেক সহজ হয়েছে। কেননা ফরমালিন আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য পূর্বে কোনো কিটবক্স বা ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি আমাদের ছিল না। সরকারিভাবে আমাকে বিদেশ থেকে কিটবক্স এনে দেয়া হয়েছে। পূর্বে কোনো গাড়িও ছিল না; আমি রিকশা নিয়ে ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াতাম। সরকারিভাবে আমি গাড়ির সহযোগিতাও পেয়েয়েছি। ঢাকা শহরের প্রতি আর্মির অফিসার, র‍্যাব কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পুলিশ, বিএসটিআই, ডিসিসি আমাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

বিশেষ করে মাছের ফরমালিন নিয়ে আমি খুবই উদগ্রীব ছিলাম। এটা বন্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে। তাই এ বিষয়টিতে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আমরা সফল হয়েছি। ফরমালিন প্রমাণিত হওয়ার পরে ১৭০ মণ মাছ আমরা মাটির নিচে পুঁতে ফেললাম। এর পরে ঢাকা শহরে একশ' ভাগ মাছে ফরমালিন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

হালখাতা

ভেজালবিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে একেবারেই কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন–

রোকন-উদ-দৌলা

১৪ জুন ২০০৫ তারিখে কাওরানবাজারে ৬ টা আমের আড়তে কেমিক্যাল কার্বাইড উদ্ধারের পর ১৬ জুন ২০০৫ তারিখে পুলিশের পাশাপাশি বিডিআরসহ অভিযান পরিচালনা করি, মিরপুর শাহ আলী মার্কেট, বটতলা আমের আড়তে। এদিন বিএসটিআই'র অফিসাররাও আমাদের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১১টা আমের আড়ত থেকে কেমিক্যাল কার্বাইডসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করে দণ্ডবিধির ২৭২ ধারায় একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। দ্বিতীয়বার ১৮ জুন ২০০৫ তারিখে কাওরানবাজারের অভিযান পরিচালনা করি। ১৯টি আড়তে কেমিক্যাল কার্বাইডসহ ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮ জনকে ১ মাস করে কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মোবাইল কোর্টের নিয়ম বা ট্রাডিশন হচ্ছে জরিমানা করা, কারাদণ্ড হচ্ছে ব্যতিক্রম। কিন্তু ভেজাল বন্ধের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কারাদণ্ড দেয়া শুরু করি। যেমন আমে কার্বাইডের ব্যবহার : আমের ঝুড়িতে আমের মাঝখানে ভেতরে এক টুকরো কার্বাইড অথবা কার্বাইড গুঁড়ো করে ছিটিয়ে দেয়া হয়। কার্বাইডের তেজস্ক্রিয়তায় আম আগুনের মতো গরম হয়ে যায় এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আম হলুদ বর্ণ ধারণ করে ও পেকে যায়।

কলা পাকানো কাজে কেমিক্যাল ব্যবহার

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে দেখা যায়, কলা তিনভাবে কৃত্রিম উপায়ে পাকানো হয়। প্রথমত, ড্রামভর্তি কেমিক্যাল মিশ্রিত পানির মধ্যে কলার ছড়াকে চুবিয়ে তোলার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। দ্বিতীয়ত, একটা আবদ্ধ চুল্লী-জাতীয় ঘরে কেরোসিনের স্টোভ জ্বালিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন আগুন নিভে যায়। কেরোসিন স্বয়ং নিজেই গ্যাসে পরিণত হয়। সে ক্ষতিকর গ্যাসের ফলে ২৪ ঘণ্টায় কলা হলুদ রংয়ের হয়ে যায়। তৃতীয়ত, একটা গামলায় তুষের মধ্যে আগুন জ্বালানো হয়, উক্ত তুষ চুলার ভেতর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, তুষের গ্যাসে কলা কৃত্রিমভাবে পেকে যায়। ফলে বর্তমানে ঢাকা শহরের কলায় না আছে কোনো ঘ্রাণ, না

আছে কোনো স্বাদ, না আছে কোনো গাছপাকা কলার মতো কোনো স্বাভাবিকতা। ২৭ জুন ২০০৫ তারিখে পল্লবী কালসি বাজারে কলার আড়তে অভিযান করে প্রায় প্রতিটি আড়তে ড্রামভর্তি কেমিক্যাল মিশ্রিত রঙিন পানি পাওয়া যায়। তবে দুইজনকে হাতেনাতে আটক করা হয় এবং কেমিক্যাল ঢেলে ফেলে দেয়া হয়। এছাড়া কাওরানবাজারে কেরোসিনের গ্যাস দিয়ে কলা পাকানোর জন্য একজনকে ১৯ জুলাই ২০০৫ তারিখে, কলায় কেমিক্যাল ব্যবহারের জন্য ১ জনকে ১৪ জুন ২০০৫ তারিখে আটক করে জেল জরিমানা করা যায়।

হোটেল রেস্টুরেন্ট, ফাস্টফুড, ডাইনিং হল ও ক্যান্টিনে অভিযান

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন ভেজালের আসল জায়গা বা প্রকৃত উৎসস্থলে আঘাত না করে বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটা হোটেলে দু-একটা মোবাইল কোর্ট করলে কোনো দিন ভেজাল বন্ধ হবে না। তবে সেই সাথে এটাও সত্য যে, বর্তমানে মানুষের কর্মব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেছে। দৈনিক আচার-নীতি ও জীবনযাত্রা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। অনেক মানুষ নিজের ঘরে রান্না করার বা খাওয়ার সময় পান না, বাইরের খাবারের ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় হোটেল-রেস্টুরেন্ট, ফাস্টফুড দোকানগুলোকে অবশ্যই আমাদের নিয়মের মধ্যে আনতে হবে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা কিছু কিছু জায়গায় অভিযান করি। যেমন মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেট এলাকায় চারটা ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট, মতিঝিল এলাকায় একটি থ্রি স্টার হোটেল, মোহাম্মদপুর-মিরপুর এলাকায় চারটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, গুলশানে একটা অভিজাত রেস্টুরেন্ট ও ফাস্টফুডের দোকান, নাজিমউদ্দিন রোডে ৬ টি রেস্টুরেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন, মহসিন হলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন, পিজি হাসপাতালের দুইটা ক্যান্টিনে, বেইলি রোডস্থ একটি বিখ্যাত বিরানি ঘরে অতঃপর জগন্নাথ হলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসের ডাইনিং হলে, গুলশানের একটি তার্কিজ রেস্টুরেন্টে, ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসে, ডেমরা এলাকার স্বামীবাগ, গেন্ডারিয়া, যাত্রাবাড়ি তিনটি হোটেলে অভিযান, চকবাজারে ১৬ টি খাবার দোকানে ও ফুটপাতে, সদরঘাটে ৬ টি লঞ্চের খাবার রুম, সিদ্দিকবাজারের ৪ টি হোটেলে অভিযান পরিচালনা করা হয়। থ্রি স্টার হোটেলগুলোতে দেখা যায় তাদের নিজস্ব প্রস্তুতকৃত ব্রেড ও বিস্কুটের গুণগত মান পরীক্ষা করাননি এবং বিএসটিআই-এর লাইসেন্স নেই। একটা থ্রি স্টার হোটেলের কিচেন রুমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখা যায়। সাধারণ চাইনিজ ও হোটেল, রেস্টুরেন্টগুলোর কিচেন মোটেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পচাবাসি খাবারের পাশাপাশি পোড়া তেল, রং ব্যবহার, কেমিক্যাল, গোলাপজল খাবারে প্রয়োগ, কিচেনে আবর্জনার স্তূপ, একই ফ্রিজে রান্না খাবার, কাঁচা মাছ মাংস, বাটা কাঁচা মসলা, বাসি ভাত, একই সাথে পুডিং ও দই-জাতীয় মিষ্টান্ন খাবার রাখা হয়– যা কিছুতেই বিধিসম্মত নয়। সবকিছু একসাথে ফ্রিজে রাখলে এক ধরনের বিষক্রিয়া হয়।

বিস্কুট ফ্যাক্টরি ও বেকারিতে অভিযান

বিভিন্ন বেকারিতে অভিযান করে দেখতে পাই, প্রায় প্রতিটি বেকারিতে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষতিকর রং, নামবিহীন, লেবেলবিহীন বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া বাই কার্বনেট, সোডিয়াম বাই কার্বনেট, সোডিয়াম সাইক্লামেট, পচা ডিম, ভেজাল ঘি ও তেল, ফ্লেভার, সুগন্ধি কেমিক্যাল ইত্যাদি। অধিকন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অধিকাংশ লাইসেন্স-বিহীন। দেবীদাস রোডে একটি বেকারিতে পাওয়া যায় মবিলের মতো পোড়া তেল। একজন কর্মচারী স্বীকার করেন যে, তেলের সাথে মবিল মেশানো হয়, এতে নাকি চানাচুর শক্ত হয়, ঝরঝরে থাকে। আমি বেকারির কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করি– নামবিহীন, লেবেলবিহীন কেমিক্যালের নাম কী? নাম তারা বলতে পারে না। কোথা হতে আনে জিজ্ঞাসা করলে বলে মিটফোর্ড হতে। পরে মিটফোর্ডে যখন একই রকম কেমিক্যাল আমি ধরি, তখন ব্যবসায়ীরা বলেন যে, ঐ কেমিক্যাল গোলাপজল ও আগরবাতি বানানোর জন্য বিক্রয় করে। অথচ সেই কেমিক্যাল বেকারিতে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো কারখানায় শ্রমিকদের ঘাম ঝরে বিস্কুটের খামিতে পড়তে দেখা যায়।

আইসক্রিম

নারিন্দা এলাকায় তিনটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে অভিযান করে আমি দেখতে পেলাম কোনো রকমের বিশুদ্ধ করা ছাড়া ওয়াসার পানি দ্বারা সরাসরি নোংরা পরিবেশে আইসক্রিম বানানো হচ্ছে। টেক্সটাইল মিলের ডাইং রং দ্বারা রঙিন আইসক্রিম প্রস্তুত করা হচ্ছে। দুধের পরিবর্তে ময়দা ও ফ্লেভার ব্যবহার করা হচ্ছে। চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে সোডিয়াম সাইক্লামেট। একজস ম্যানেজার ও একজন মালিককে এক মাস করে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করি। পলাতক মালিকদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করি। ব্যবহৃত নোংরা পোস্টার জাতীয় কাগজ দ্বারা আইসক্রিমের ওপরে আবরণ দেওয়া হয়েছে। কোনোটিরই বিএসটিআই-এর লাইসেন্স ছিল না। এছাড়া ঈগলু, পোলার, স্যাভয় এবং কিছু কিছু আইসক্রিমে মেয়াদ-উত্তীর্ণের তারিখ না থাকায় এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়।

মিষ্টির কারখানা

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে একটি প্রসিদ্ধ মিষ্টির কারখানায় অভিযান করে যে নোংরা পরিবেশ দেখতে পাই তা অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। সেখানে পচা বাসি কিমা, দুর্গন্ধযুক্ত বাটার, আর পাওয়া যায় টেক্সটাইল মিলের ডাইং রং। একটা টিনের কৌটায় লেখা ছিল use for only textile. কর্মচারীরা স্বীকার করেন যে সেই রঙ তারা লালচে দই প্রস্তুতে, লাল মিষ্টি ও কেক প্রস্তুতে ব্যবহার করে। সেখানে ৫ জনকে ১ মাস করে কারাদণ্ড সহ মালিকের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রুজু করা হয়।

লক্ষ্মীবাজারের একটি মিষ্টির কারখানায় অভিযান করে একই চিত্র পাওয়া যায়। সেই সাথে পাওয়া যায় এক গামলা পচা মিষ্টি, যার একটির অর্ধেক মালিক খেতে পারেননি। মালিককে দেয়া হয় এক মাস কারাদণ্ড ।

ডিমের আড়তে কেমিক্যাল

কারো কারো কাছে শোনা যাচ্ছিল সাদা ডিমকে লাল করার জন্য কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে। মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে একটা ডিম আড়তে পাওয়া যায় এক বালতি কেমিক্যাল। দোকানদার স্বীকার করেন যে প্রতি ডিমেই আট আনা বেশি লাভ হয় বলে সাদা ডিম ঐ কেমিক্যালে চুবিয়ে লাল করা হয়। মালিকসহ ২ জনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শুক্রবাদ মোহাম্মদপুরে অভিযান করে আটক করা হয় প্রচুর পচা ও নষ্ট ডিম। যা কোনো কোনো বেকারিতে সরবরাহ করা হয়।

চকলেটের কারখানায় রং ও কেমিক্যাল

নাজিমউদ্দিন রোড ও নবাবের দেউরিতে অভিযান করে উদ্ধার করা হয় কয়েক প্রকারের ডাইং রং ও ক্ষতিকর কেমিক্যাল। তবে রং ও কেমিক্যাল উদ্ধার করা হয় স্টোর রুম হতে। উৎপাদনের সময় মোবাইল কোর্টের ভয়ে কোনো রং ব্যবহার করা হচ্ছিল না। সাদা চকলেট প্রস্তুত করা হচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন যে পূর্বে রং ব্যবহার করতেন কিন্তু মোবাইল কোর্টের পর রং ব্যবহার করা তার বন্ধ করে দিয়েছেন।

সেমাই'র কারখানায় নোংরা পরিবেশ

হাজারিবাগের একটি সেমাই'র কারখানায় অভিযান করে দেখা যায় অত্যন্ত নোংরা পরিবেশ। অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন ঘরে মাকড়সার অসংখ্য জাল। সেমাই'র মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে ঝাড়ু, নোংরা ও ঘামযুক্ত শার্ট, ঘাম শুকানোর জন্য রেখে দেয়া হয়েছে সেমাই'র উপর। অন্য দিকে উন্মুক্ত জায়গায় সেমাই শুকানো হচ্ছিল। সেখানে সেমাইর মধ্যে অসংখ্য মাছি ভনভন করছিল। নয়াবাজারে গিয়ে দেখতে পাই গাড়ির গ্যারেজের ভেতরে নোংরা পরিবেশে একটি নামীদামী ব্রান্ডের লাচ্ছা সেমাই প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ওয়াসার পানি হচ্ছে মিনারেল ওয়াটার ও বিশুদ্ধ ড্রিংকিং ওয়াটার

বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে দেখা যায় ওয়াসার পানিকে মিনারেল ওয়াটার বিশুদ্ধ পানি হিসেবে বোতলজাত ও পরিপ্যাক করা হচ্ছে কোনো রকমের শোধন ছাড়াই।

ক্ষতিকর শুটকি

কাওরানবাজারে ৪৭ টি শুটকির আড়ৎ ও দোকানে অভিযান পরিচালনা করে ক্ষতিকর ডিডিটি পাউডারযুক্ত শুটকি দেখা যায় এবং বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশে ৪৭ জনকে শাস্তি দেয়া হয় ।

বিএসটিআই-এর লাইসেন্সবিহীন পণ্য

সরিষার তেল, নারিকেল তেল, অনুমোদনবিহীন মধু ও ঘি, বিদেশি কসমেটিক, দুধ, স্যাম্পু, চকোলেট, টুথপেস্ট, সাবান, জুস, নুডুলস, তেল, সস, বিস্কুট, লজেন্স, মৌলভিবাজারে বিদেশি গুঁড়োদুধ, মিরপুরে বিদেশি চিনি, কাওরানবাজারে অনুমোদনবিহীন পামওয়েল, ভেজিটেবল ওয়েল ইত্যাদি বিএসটিআই-এর গুণগত মান পরীক্ষিত না হওয়ায় ও লাইসেন্স না থাকায় শাস্তি দেয়া হয় ।

ঘি-এর কারখানায় কোনো দুধ নেই

রমাকান্ত নন্দী লেন পাটুয়াটুলী এলাকায় ১৭টি ঘি-এর কারখানায় অভিযান করে কোন দুধ পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছে whey powder (যা দুধের ফেনা হতে প্রস্তুত করা হয় এবং যাতে দুধের কোনো গুণাগুণ নেই)। বনস্পতি (ডালডা), কেমিক্যাল, রঙদানা ইত্যাদি যার সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয় কথিত ঘি। জানা যায়, আলু ও কেমিক্যাল দিয়েও ঘি বানানো হয়।

ভেজাল গুঁড়োদুধ

মৌলভীবাজারে পাওয়া যায় বিএসটিআই-এর অনুমোদনবিহীন বহু গুঁড়োদুধ। গোডাউনে সংরক্ষিত ছিল ছেঁড়া ও জমাট বাধা দুধের বস্তা।

মাছে দুধে ফরমালিন

মাছ ও খোলা তরল দুধে ফরমালিন ব্যবহারের অভিযোগ আছে। মহাখালী বাজারে গিয়ে দেখলাম বেশ কিছু বিবর্ণ বড় রুই-কাতলা মাছ বরফ ছাড়া রাখা হয়েছে। আমি ঐ সব মাছের কান বের করে বিক্রেতাদেরকে বললাম, পচা মাছ তারা ফরমালিন দিয়ে এভাবে ফেলে রেখেছে। কেমিস্ট ও কেমিক্যাল যন্ত্রপাতির অভাবে ফরমালিন দেয়া মাছ-দুধ ধরতে না পারায় সব সময় আমার বিবেককে দংশন করছে।

চাল ও মুড়িতে ইউরিয়া সার ব্যবহার

এই বিষয়ে প্রচুর অভিযোগ আছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, ধান তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবার জন্য এবং চালকে ধবধবে সাদা করার জন্য ধানের চাতালে ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়। বিষয়টি ঢাকার বাইরে হওয়ায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়নি।

অনুমোদনবিহীন ভেজাল ঔষধ ও স্যালাইন

ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদনবিহীন ভেজাল ঔষধ ও স্যালাইনের বিষয়ে আমি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করি। টিকাটুলি, ওয়ারি, টিপু সুলতান রোড, গ্রীন রোড, বংশাল, দেবীদাস রোড, লালবাগ, আর কে মিশন রোড ও ডেমরা এলাকায় বেশ কিছু অনুমোদনবিহীন ঔষধ ও স্যালাইন আটক করা হয় এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মহিষ, গরু, ভেড়া, ছাগল প্রতারণা

ঢাকা শহরে প্রতিদিন শত শত মহিষ জবাই করা হলেও কোথাও মহিষের মাংস পাওয়া যেত না। মহিষের মাংসকে গরুর মাংস বলে এবং ভেড়ার মাংসকে খাসির মাংস বলে বেশি দামে বিক্রি করার প্রতারণা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সেই প্রতারণা উন্মোচিত হয় ভেজালবিরোধী অভিযানে কাপ্তানবাজারে কসাইখানায় অভিযান করে পাওয়া যায় ৯০টি মহিষ আর মাত্র ১২টি গরু। অথচ জবাইয়ের পর প্রতিটা মহিষের মাংস গরুর মাংস বলে সিল মারা হচ্ছিল, যা ভেজাল না হলেও প্রতারণার সামিল।

অন্যান্য

সাধনা ঔষধালয়কে পচা ও নোংরা পরিবেশের জন্য জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া প্রচুর কসমেটিক নকল হবার অভিযোগ আছে। গুলশান এলাকায় বেশ কিছু অনুমোদনবিহীন কসমেটিক পাওয়া যায়। তাঁতীবাজারে নকল কসমেটিক কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়। নকল কসমেটিক উদ্ধার করা হয় এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে। এছাড়া বোরিক পাউডারের সাথে চক পাউডার মেশানোর প্রমাণ পাওয়া যায়।

হালখাতা

শত ব্যস্ততার মধ্যেও 'হালখাতা'-কে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

রোকন-উদ-দৌলা

'হালখাতা' পত্রিকাকেও ধন্যবাদ খাদ্যে ও পণ্যে ভেজাল নিয়ে একটি বিশেষ ও সাহসী সংখ্যা করার জন্য।